নিত্যদিনের ডাক্তারী

অধ্যাপক ডা. খাজা নাজিম উদ্দীন

বাঙ্গালা গবেষণা

নিত্যদিনের ডাক্তারী

অধ্যাপক ডা. খাজা নাজিম উদ্দীন

Everyday Doctor

By Prof. Dr. Khaza Nazim Uddin

৪র্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রথম বাঙ্গালা গবেষণা প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২১, পুনঃমুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব ২০২৫ © অধ্যাপক ডা. খাজা নাজিম উদ্দীন

বাঙ্গালা গবেষণা প্রকাশনার ২২২তম গ্রন্থ

প্রকাশক

আনোয়ারা শিরীন

১৩৭ জাহানারা গার্ডেন গ্রীন রোড ঢাকা ১২১৫

ফোন ৮৮০২-৪৮১২১৪৬৬, ৮৮০১৭১৬১২৭০১০, ৮৮০১৭৫৫৫১৮৭৯১

ইমেইল: bangalagobeshona2016@gmail.com

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

চিকিৎসা রোগী চিকিৎসক সম্পর্ক অব্যক্ত অনবদ্য জাগতিক

মুদ্রণ : আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং

২৭ কাঁটাবন, নীলক্ষেত, নিউ মার্কেট, ঢাকা ১২০৫

এই গ্রন্থের কোনো অংশ লেখক স্বত্বাধিকারী-প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না। আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকর্ডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

ISBN : ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৪১৮-৬-৬

মূল্য: ৩৫০ টাকা, বিদেশে ১৭.৫০ ইউএস ডলার

উদ্ধৃতি সুপারিশ :

অধ্যাপক ডা. খাজা নাজিম উদ্দীন, (২০২৫), নিত্যদিনের ডাক্তারী

ঢাকা : বাঙ্গালা গবেষণা

পরিবেশক

বাঙ্গালা গবেষণা

১৩৭ জাহানারা গার্ডেন গ্রিনরোড ঢাকা ১২১৫

ফোন: ৮৮০২-৪৮১২১৪৬৬, ৮৮০১৭১৬১২৭০১০, ৮৮০১৭৫৫৫১৮৭৯১

+

উৎসর্গ

আলহাজ্ব আবুল কাশেম হেলথ্ এডুকেশন
ও
স্পোর্টস ফাউন্ডেশন

মুখবন্ধ

ইচ্ছা ছিল মেডিসিন টেক্সট বই লেখার, সেটা হবার নয়। গ্রামে যাই প্রথম জীবন থেকেই। খুব কাছ থেকে দেখেছি গ্রামীণ সংস্কার, চিকিৎসার অনীহা, চিকিৎসার প্রতি অনাস্থা আর অপারগতা। খুব সাধারণ জিনিসের সহজ সমাধানে অনেকের অজ্ঞতা, অস্পৃহা।

বাচ্চা এবং মহিলাদের রোগ, প্রাকৃতিক নিয়মাবলিকে পালন করার অজ্ঞতা অনেক বেশি; এই দুইটা জিনিসের সমাধানের চেষ্টায় আছি। ঔষধ সবকিছুর সমাধান নয়, এ বার্তাটা সবার কাছে দিতে পারলে ভাল লাগবে।

দেশে-বিদেশে বহুদিন জিপি (তৃণমূলের ডাক্তার) ছিলাম- অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর এটা একটা সনির্বন্ধ প্রয়াস। প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার অনেক উপলব্ধি এবং জ্ঞানকোষ শেয়ার করেছি; যেখানে আমিও বিভিন্ন সময় লিখেছি, বলেছি। সে হিসেবে বইটি একটি সংকলন।

সবার উপলব্ধি ও জ্ঞান সমৃদ্ধ বইটি পাঠকের কাজে লাগবে বলে বিশ্বাস করি। এ বইটি ডাক্তারী প্র্যাক্টিস করার জন্য নিশ্চিত ভাবেই নয়; নিত্য দিনের শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সহজ ধারণা দেয়াই লেখকের উদ্দেশ্য।

অধ্যাপক ডা. খাজা নাজিম উদ্দীন
knuddin61@gmail.com
www.aqf-bd.com

সূচীপত্র

১ম অধ্যায়

প্রাথমিক চিকিৎসা

জ্বর হলে কি করবেন ১১
মাথা ব্যথা ১১
মাথা ঘোরা ১২
খিঁচুনি ১২
গিরায় ব্যথা ১২
সাপের কামড় ১২
চুলকানি (itching/প্রুরাইটাস) ১৩
পানিতে ডুবলে ১৪
ডায়াবেটিস ১৪
উচ্চ রক্তচাপ ১৪
কুকুরে কামড়ালে ১৫
বড়শী বিঁধলে ১৫
পেটের ব্যথা ১৫
গ্যাস/গ্যাস্ট্রিক ১৫
পায়খানার সমস্যা ১৫
জন্ডিস ১৬
বুকে ব্যথ ১৬
বুক জ্বালা-পোড়া ১৬
বুক জ্বালা-পোড়ার কারণ ১৭
বুক জ্বালা-পোড়ার ঘরোয়া চিকিৎসা ১৭
বমি ১৮
বিনা ঔষধে বমি বমি ভাব থেকে পরিত্রাণের উপায় ১৮
বমি বমি ভাব হওয়ার কারণ ১৯
বমি বমি ভাবের সাথে অন্য লক্ষণ: সম্ভাব্য কারণ ১৯
অন্যান্য যেসব কারণে বমি বমি ভাব হয় ১৯
বমি বমি ভাব দূর করতে যা করতে পারেন ২০
কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন ২০
বিশেষভাবে লক্ষণীয় ২০
জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে যেতে হবে কখন ২০
শ্বাসকষ্ট ২১
কাশি ২১
নাক দিয়ে রক্ত পড়া (এপিস্টালিক্সস) ২১
চোখ উঠা (Conjunctivitis) ২১
কান ২১
বিষ পান/ট্যাবলেট খাওয়া (পয়জন) ২২

২য় অধ্যায়

সাধারণ চিকিৎসা

ব্যায়াম- ১: সঠিক ব্যায়াম/ সঠিক হাঁটা ২৭
ব্যায়াম- ২: মাথাব্যথা ও ব্যায়াম ২৮
ব্যায়াম- ৩: ভারী ব্যায়াম ২৯
ব্যায়াম- ৪: ঘাড়ের ব্যায়াম ৩০
ব্যায়াম- ৫: ব্যায়াম স্থান/কাল ৩১
ব্যায়াম- ৬: ব্যায়ামের জন্য সময়? ৩২
ব্যায়াম- ৭: ভারসাম্য ঠিক রাখার ব্যায়াম? ৩২
ব্যায়াম- ৮: ক্লান্তি ও ব্যায়াম ৩৩
ব্যায়াম- ৯: শীতে ব্যায়াম ৩৫
আচমকা পায়ে টান (ক্রাম্প)? ৩৫
রক্তের চর্বি কমানোর উপায়? ৩৬
মাথা ঘোরা (ভার্টিগো) ৩৭
শীতের সবজি কেন খাবেন ৩৮
শীতকালীন খাবার ৩৮
শীতের ফলমূলের গুণ ৩৯
শীতের ব্যাধি: সতর্কতা ৪০
শীতে ডিপ্রেশন ৪১
গ্রীষ্মে পানীয় ৪১
গ্রীষ্মকালীন ফল ৪২
গরমে অসুস্থতা ৪৩
গ্রিন টি ৪৪
ক্লান্তি অবসাদ ৪৪
ইজতেমায় স্বাস্থ্য বিধি ৪৫
হঠাৎ মুখ বেঁকে গেলে ৪৬
জ্বর ৪৬
মাছ-মাংস-ডিম ছাড়া প্রোটিন ৪৭
ঘাড় ব্যথা ৪৮
রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেশি? ৪৯
ব্যাডমিন্টন ৫৪
মাঝ বয়সের মন ৫৫
ওষুধ দরকার / অদরকার ৫৬
ক্যালসিয়াম ৫৬
ভাইরাসে অ্যান্টিবায়োটিক নয়? ৫৭
কিভাবে হাঁটবেন ট্রেড মিলে না বাইরে? ৫৮
মশাবাহিত রোগ ৫৮
মশারিতে রোগ প্রতিরোধ ৫৯
ধূমপান ছাড়ার উপায় ৬০
বারংবার হাতে পানি লাগা? ৬০
শুকনো ফলে পুষ্টি ৬১
সবজির গুণ ঠিক রেখে রান্না ৬১
কর্মব্যস্ততা ও সুস্থতা ৬২
স্বাস্থ্য সম্মত খাবার ৬৩
চিকন পাতলা মানেই অসুখ নয় ৬৪
সুস্থতার পাঁচ তরিকা ৬৪
স্বস্তিতে নিজের কাজ ৬৫
ভ্যারিকোস ভেইন (পায়ের শিরা ফুলে যাওয়া) ৬৬
মানসিক চাপ এড়ানোর উপায় ৬৭
রক্তের চর্বি মাত্রা কমাতে হবে ৬৭
রোজাদার রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঔষধ ৬৮

যখন অনেক ওষুধ খেতে হয়/
পলি ফার্মেসী ৬৯
ভিটামিন ৭০
গলা শুকানো মানে ডায়াবেটিস নয় ৭১
কিডনি রোগ প্রতিরোধের উপায় ৭২
বাড়তি লবণ খারাপ ৭৩
ম্যাসাজে কি ওজন কমে? ৭৪
চল্লিশের কোঠায় বয়স ৭৫
মাথাব্যথা, নাক বন্ধ, জ্বর জ্বর ৭৬
ফল ও ভিটামিন সি ৭৭
ভিটামিন ডি ৭৭
ডেঙ্গু, না চিকুনগুনিয়া? ৭৮
ঘাম যখন বেশি ৭৯
মাথার যন্ত্রণা/মাথাব্যথা ৮০
নাক ডাকা বা স্নোরিং ৮১
বুক জ্বলা ৮২
মশা তাড়াতে গিয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ৮২
রোজাদার ডায়াবেটিক রোগীর জন্য
দুটি আদর্শ খাদ্যতালিকা ৮৩
ভাইরাস জ্বর ৮৪
ব্যথানাশক ৮৫
জ্বর গিরা ব্যথা ৮৬

৩য় অধ্যায়

বিশেষ চিকিৎসা

রোজার সতর্কতা ৮৯
রোজা ৯১
হেপাটাইটিসের টিকা ৯২
দাঁত ফেলতে সাবধানতা? ৯২
নাকের হাড় বাঁকা (DNS) ৯৩
শুষ্ক চোখ ৯৪
ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়া পথ্য ৯৪
ক্যান্সার ৯৫
ক্যান্সার চিকিৎসা ৯৭
ব্যথা বেদনা ৯৭
ত্বক, নখ, চুল ১১০
শীতকালীন সমস্যা ১১৩
ঘামাচি ১১৩
মাথার চুল পড়া ১১৫
চুল পড়া ১১৫
করণীয় ১১৬
পায়ের তলায় কড়া ১১৭
চিকুনগুনিয়ায় ত্বকের সমস্যা ১১৮
ব্রণ ১১৯
ব্রণের চিকিৎসা ১১৯
সুস্থ ত্বকের জন্য ব্যায়াম? ১২০
শিশু কিশোর ১২১
নবজাতকের জন্ডিস ১২৭
খাদ্য নালি ১২৮
শ্বাসনালি, ফুসফুস ১৩০
মা, মেয়ে, মহিলা ১৩৭
HPVvaccine ১৪১
মেনোপজ ১৪৬
Dyspareunia (ডাইস্প্যারিউনিয়া)
মানে হলো সহবাসের সময় বা পরে
যৌনাঙ্গে ব্যথা ১৪৮
মা ও করোনা/মাতৃত্ব ও ডেঙ্গু/
মাতৃত্ব ও চিকুনগুনিয়া: ১৪৯

কোভিড ১৯ (সার্চ করোনা- ২)

ডেঙ্গু-ডেন, চিকুনগুনিয়া-চিক ১৫০

কালো ফাঙ্গাস এক
নতুন আতংক!! ১৫২

ডায়াবেটিস ১৫৪

স্টিয়াটসিস **(NAFLD)** **১৬৪**

হাই কোলেস্টেরল/
ডিসলিপিডেমিয়া ১৬৬

রক্তচাপ/উচ্চ রক্তচাপ ১৬৭

হার্ট এ্যাটাক ও হৃদরোগ ১৬৯

হৃদরোগ ও রক্তচাপ ১৭০

স্ট্রোক ১৭৩

কিডনি রোগ-পা ফোলা, ইডিমা ১৭৫

বয়স্কদের রোগ ১৭৬

বয়স্কদের ভ্যাক্সিন ১৮২

প্রেগনেন্সী/গর্ভাবস্থা ১৮৫

হেপাটাইটিস বি পজিটিভ
মায়ের বেবী ১৮৬

মানসিক রোগ ১৮৭

১ম অধ্যায়

প্রাথমিক চিকিৎসা

প্রাথমিক চিকিৎসা

জ্বর হলে কী করবেন

- প্রথম চারদিন: প্যারাসিটামল দিয়ে জ্বর কমাতে হবে। ৬ ঘন্টা পর পর ৫০০ মিগ্রা একটা করে ট্যাবলেট দিতে হবে। ১০২ এর নীচে না নামলে আরো একটা দিতে হবে। পানি পান করলে জ্বর যাবে। জ্বর ১০০ তে থাকলেই চলবে। ৯৯ করার দরকার নাই।
- পানি প্রচুর (+৩ লিটার) পান করতে হবে। বিশ্রাম নিতে হবে। খাওয়া দাওয়া ঠিকরাখার চেষ্টা করতে হবে; জুস ইত্যাদিতে ক্যালরি পাওয়া যাবে।
- ৪ দিনের বেশি হলে, অন্য উপসর্গ থাকলে ডাক্তার দেখাতে হবে।
- ভাইরাল ফিভার ৭ দিনের বেশি থাকেনা।

মাথা ব্যথা

- অন্য উপসর্গ যেমন জ্বর, গা ম্যাজম্যাজ, কাশি থাকলে প্যারাসিটামল, এ্যান্টিহিস্টামিন।
- মাইগ্রেন: এক পেশে ব্যথা, বমি বমি ভাব, দৃষ্টিভ্রম হলে অথবা ব্যথার পূর্বাভাস (aura) সেটা ক্লাসিকাল মাইগ্রেন। মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কাজকর্ম বন্ধ করে থাকে, ঘর অন্ধ করে। মাইগ্রেন মেয়েদের রোগ (৫৬-১৫ বছর)। প্যারাসিটামলের সাথে অন্য ঔষধ লাগে। মাইগ্রেন একটানা থাকে না; ৩ /২ দিন থাকে, মাসে ৩ /২ বার হয়।
- টেনশন হেডেক: একই রকম একটানা কয়েকদিন, অনেকদিন থাকে। দিনের সূর্য গড়ায় ব্যথা বাড়ে; প্যারাসিটামলে যায় না।
- বেকায়দা শুয়ে বা বসে থাকা, তাকিয়ে থাকার ব্যথা প্যারাসিটামলে যায়।

মাথা ঘোরা

- ব্যালান্সের অসুবিধা হলে মাথা ঘুরে শোয়া থেকে উঠলে, শুতে গেলে, বিছানায় এপাশ ওপাশ করলে ঘুরে; পজিশনাল ভার্টিগো। এটা খারাপ কিছুনা (বিনাইন)। নাক বন্ধ থাকলে হয়, বংশে হয়, বারংবার হয়। সিনারাজিন জাতীয় ঔষধে তিনচার দিনে সারে।
- মাথাঘোরা সাথে অন্য উপসর্গ থাকলে সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার পড়ে।

খিঁচুনি

- বয়স্ক : জ্ঞান হারালে, পরে গেলে, জিহ্বা কাটলে সন্দেহ করতে হবে।
- বাচ্চা : ক্ষণিকের জন্য স্থবির হয়ে আবার ঠিক হয়ে যায়,মাঝে মাঝে হয়।
- সতর্কতা- একা আগুনের কাছে, পানিতে, ব্যস্ত রাস্তায় যাবে না।

গিরায় ব্যথা

- গিরায় ব্যথা: গাউট: বয়স্ক মহিলা, পুরুষদের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে গিরা ফুললে সেটা গাউটি আর্থ্রাইটিস।

  অনেক গিরা (পা, হাত; ছোট, বড়) ফুললে, ব্যথাবেশি এবং বেশিদিন থাকলে সকালে দেড় ঘন্টার বেশি জ্যাম থাকলে ইনফ্লামেটরী আর্থ্রাইটিস। এসব ব্যথা সর্বাধিক ডোজে এনএসআইড ও অন্যান্য ঔষধ লাগবে।

  গিরা ফোলা নাই কিন্তু ব্যথা বয়সের অসুখ, প্যারাসিটামলে কমে। এডজাস্ট করে চলতে শিখতে হবে।

  নখের কোণা ফোলা (কেনি উঠা) ও ব্যথা থাকলে প্যারেনকিয়া, ফাংগাল ইনফেকশন; ডায়াবেটিস পরীক্ষা করতে হবে।

সাপের কামড়

- সাপে কামড় দিলে : কামড়ের জায়গাকে রেস্টে রাখতে হব। রশি, ফিতা নয় Splint লাগাতে হবে (দুপাশে পাত লাগিয়ে ফিতা দিয়ে পেঁচাতে হবে) দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে এ্যান্টিভেনম দেবার ব্যবস্থাই আসল চিকিৎসা।

চুলকানি (itching/প্রুরাইটাস)

- চুলকানি একটি লক্ষণ, এটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে (ত্বকের শুষ্কতা, অ্যালার্জি, একজিমা, সংক্রমণ, লিভার/কিডনি রোগ, ডায়াবেটিস, মানসিক চাপ ইত্যাদি)। চাকা হলে allergy (urticaria), দানা থাকলে ঘামাচি, ইনফেকশন-ডেঙ্গু, হাম ইত্যাদি। এগুলো না থাকলে ডায়াবেটিস-কিডনি -লিভারের অসুখ, ত্বকের শুষ্কতা। সহজ করে এভাবে ভাবা যেতে পারে।
- প্রতিকার (Management)
  - ত্বক আর্দ্র রাখা।
  - ময়েশ্চারাইজার/লোশন (fragrance-free) ব্যবহার করুন, বিশেষ করে গোসলের পরে।
  - নারকেল তেল/অ্যালোভেরা জেলও ব্যবহার করা যায়।
  - ঠান্ডা সেঁক বা ঠান্ডা পানি দিয়ে ধোয়া।
  - আক্রান্ত স্থান ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলুন বা ভেজা কাপড়ের ঠান্ডা সেঁক দিন।
  - মৃদু সাবান ও ক্লিনজার
  - অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বা সুগন্ধি সাবান এড়িয়ে চলুন।
  - ওষুধ
  - অ্যান্টিহিস্টামিন ট্যাবলেট (যেমন সেট্রিজিন, লোরাটাডিন) অ্যালার্জি থেকে চুলকানিতে উপকারী।
  - চুলকানি ও প্রদাহ বেশি হলে ডাক্তার পরামর্শে স্টেরয়েড/ক্যালামাইন লোশন বা মেডিকেটেড ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে।
  - চুলকানো এড়ানো।
  - চুলকালে ত্বক ক্ষত হয়ে সংক্রমণ হতে পারে। নখ ছোট রাখুন।
  - কারণভিত্তিক চিকিৎসা।
  - ফাঙ্গাল সংক্রমণ হলে অ্যান্টিফাঙ্গাল।
  - একজিমা হলে কর্টিকোস্টেরয়েড।
  - কিডনি/লিভারের রোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা দরকার।

- প্রতিরোধ (Prevention)
    - ত্বক হাইড্রেশন বজায় রাখা - পর্যাপ্ত পানি পান ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার।
    - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা - প্রতিদিন স্নান, পরিষ্কার কাপড় পরা।
    - মৃদু ও নরম পোশাক - সুতির কাপড় পরুন, উল/সিনথেটিক কাপড় এড়িয়ে চলুন।
    - ডাস্ট/অ্যালার্জেন এড়ানো - ধুলা, পোষা প্রাণীর লোম, তীব্র সুগন্ধি/কেমিক্যাল এড়িয়ে চলুন।
    - সুষম খাদ্য - ভিটামিন A, E সমৃদ্ধ ফলমূল, সবজি, বাদাম ত্বককে স্বাস্থ্যবান রাখে।
    - স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট - ধ্যান, পর্যাপ্ত ঘুম চুলকানি কমাতে সহায়ক।

- ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজনীয়তা
    - হঠাৎ তীব্র চুলকানি, লালচে র‍্যাশ, ফোস্কা বা ফোলা দেখা দিলে
    - দীর্ঘদিনের চুলকানি (২ সপ্তাহের বেশি)
    - সারা শরীরে বা চোখ/মুখ/গোপন অঙ্গে চুলকানি
    - জ্বর, ওজন কমা, জন্ডিস বা কিডনি রোগের সঙ্গে চুলকানি

পানিতে ডুবলে

- পানিতে ডুবলে: ফুসফুসে পানি গেলে বিপদ, শ্বাসকষ্ট হলে, কাশি থাকলে ডাক্তার দেখাতে হবে। পেটের পানি ফুসফুসে না গেলে ভয় নেই।

ডায়াবেটিস

- ডায়াবেটিস: নাস্তার আগে রক্তের গ্লুকোজ ৬ মিমোলের বেশি ও খাওয়ার পরে ৮ মিমোলের বেশি হলে সেটা অস্বাভাবিক। খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাত্রা বদলাতে হবে, ব্যায়ামের অভ্যাস করতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ

- উচ্চ রক্তচাপ: স্বাভাবিক: ৮০/১৩০। রক্তচাপ ৯০/১৪০ এর বেশি হলে চিকিৎসা নিতে হবে। অস্বাভাবিক রক্তচাপ / রক্তে গ্লুকোজ হলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।

কুকুরে কামড়ালে

- ক্ষতস্থান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। ক্ষতস্থানে এন্টিসেপটিক (স্যাভলন, ডেটল, আয়োডিন) দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। টিটেনাস টক্সয়েড দিতে হবে। পাগলা কুকুর হলে ভ্যাক্সিন লাগবে।
- বিড়ালের আঁচড় লাগলে ভ্যাক্সিন লাগবে।

বড়শী বিঁধলে

- বড়শী বিঁধলে বরশী কেটে উল্টা দিক দিয়ে বের করতে হবে। এন্টিসেপটিক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। টিটেনাস টক্সয়েড দিতে হবে।

পেটের ব্যথা

- বাচ্চাদের কৃমি, কন্যাদের প্রস্রাবে ইনফেকশন হলে ব্যথা হয়। সবারই পানীয় বা খাদ্যদ্রব্য থেকে হয়। ব্যথায় গড়াগড়ি করলে পিত্তের রাস্তা /প্রস্রাবের রাস্তায় পাথর হতে পারে। ২দিনের বেশি মারাত্মক ব্যথা না গেলে হাসপাতাল যেতে হবে।

গ্যাস/গ্যাস্ট্রিক

- আমরা সবকিছুতেই গ্যাস্টিক হয়েছে বলি; গ্যাস বলে আমরা ওমিপ্রাজল, রাবিপাজল জাতীয় ওষুধ খাই; এ ঔষধগুলো কিডনীর ক্ষতি করে, হাড় নরম করে, এ্যানিমিয়া হয়। বিদেশে পেসক্রিপশন ছাড়া এ সমস্ ঔষধ পাওয়া যায় না। আমাদের মসলাযুক্ত খাবারে গ্যাস হতেই পারে। ডমপেরিডন, এন্টাসিড খেলেই চলবে।

পায়খানার সমস্যা

- **পাতলা পায়খানা:** খাওয়ার স্যালাইন, ডায়াবেটিকদের জন্য রাইস স্যালাইন, অন্যদের ওর স্যালাইন খেতে হবে; দিনে কমপক্ষে একটা সাথে ডাবের পানি। জ্বর থাকলে বারে বেশি (১০ বা বেশি) হলে এন্টিবায়োটিক (এজিথ্রমাইসিন) খাওয়া ভাল। ব্যথা, বমির ঔষধ, গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ দরকার নাই। পায়খানার সাথে মিশে রক্ত গেলে অসমাপ্ত, অতৃপ্তির মোশন হলে এন্টিবায়োটিক, বারে কম হলে মেট্রনিডাজল। খাদ্যদ্রব্য, পানীয় থেকেই এগুলো হয়। খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে। দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার বাদ দিতে হবে, অন্য সবকিছ খাওয়া যাবে।

- **কালো পায়খানা :** খারাপ জিনিস; কালো মানে আলকাতরার মত কালো। পানি ঢেলে দিলে লাল হবে। খাদ্যনালির উপরের দিকে রক্তক্ষরণ হলে এটা হয়।
- **লাল রক্ত মেশান পায়খানা :** মানে dysentery;

  Fissure : রক্ত যদি পায়খানার গায়ে লেগে থাকে, পায়খানার সময় ব্যথা করে তবে fissure অর্থাৎ ফেটে গেছে।

  Piles : রক্ত পায়খানা শেষ করলে ফোঁটাফোঁটা রক্ত পড়ে, ব্যথা নাই তাহলে পাইলস। বিশেষ লাইট দিয়ে পায়খানার নালী দেখলে (প্রোক্টসকোপী করলে) এটা নিশ্চিত হওয়া যায়।
- **মিউকাস/ক্রনিক আমাশয় :** এটা টেনশনের ডায়রিয়া/আইবিএস। দুধ ও সালাদ বাদ দিতে হবে। কিছু কিছু ঔষধে সাময়িক কাজ হয়।

জন্ডিস

- **পূর্বাভাস :** বমি বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, উপরের পেটে ব্যথা/অস্বস্তি। জন্ডিস/ হলুদ হয়ে গেলে স্পষ্ট দেখা যায়।

  চিকিৎসা : সম্পূর্ণ বিশ্রাম। ক্যারম, কম্পিউটার গেম খেলা যাবে, কিন্তু ক্রিকেট ফুটবল বা অতিশ্রমের কিছু নয়। খাওয়া -স্বাভাবিক, পোলাও কোরমা সব খাওয়া যাবে। রক্ত পরীক্ষা করে লিভারের কতটুক ক্ষত হলো, কোন ভাইরাস জানতে হবে। তিন থেকে ছয় সপ্তাহে সেরে যাবে।

বুকে ব্যথা

- **বুকে ব্যথা :** মধ্য জায়গায় উপরের দিকে হলে হার্টের হতে পারে। সেক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হবে, গা ঘামবে; মনে হবে মৃত্যু নিকটবর্তী। মধ্যবয়সীদের বেশি হয়, মেয়েদের মেনোপেজের আগে কম হয়, ডায়াবেটিস, কোলেস্টরল, উচ্চরক্তচাপ থাকলেও ঝুঁকি থাকে; কোন কিছু না থাকলেও ধূমপায়ীদের হয়।

বুক জ্বালা-পোড়া

- আমরা যখন খাবার খাই, খাবারের সাথে সাথে পাকস্থলীর অ্যাসিড শরীরের নিচের দিকে নামে। যদি এর উল্টো ঘটে, অর্থাৎ পাকস্থলীর অ্যাসিড নিচে না নেমে বরং ওপরে গলার দিকে উঠে আসে, তখন আমরা বুকে জ্বালাপোড়া অনুভব করি। একে অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা হার্টবার্ন বলা হয়। অনেকেই আমরা এটাকে গ্যাস্ট্রিক, গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বা অ্যাসিডিটি বলে থাকি। এমন জ্বালাপোড়া

যদি বারবার হতে থাকে, তখন এই রোগকে বলা হয় গ্যাস্ট্রো-ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (gastro-oesophageal reflux disease)।

বুক জ্বালা-পোড়ার কারণ

- নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই সময়ে সময়ে অনেকের বুক জ্বালাপোড়া করে। তবে মাঝেমধ্যে কিছু জিনিস এই জ্বালাপোড়ার সূত্রপাত ঘটায় বা তীব্রতা বাড়ায়। যেমন:
- নির্দিষ্ট কিছু খাবার ও পানীয় চর্বিযুক্ত বা মসলাদার খাবার, কফি, চকলেট, অ্যালকোহল, ইত্যাদি
- ধূমপান
- মানসিক চাপ ও উদ্বেগ
- ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হওয়া
- গর্ভাবস্থা
- হায়াটাস হার্নিয়া (hiatus hernia) নামের একটা রোগ যেখানে পাকস্থলীর কিছু অংশ বুকে উঠে আসে
- কিছু ওষুধ যেমন আইবুপ্রোফেন (ibuprofen)। আপনি যদি ডাক্তারের পরামর্শে এই ওষুধগুলি খান, তাহলে কোনভাবেই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে ওষুধগুলো বন্ধ করবেন না।

বুক জ্বালা-পোড়ার ঘরোয়া চিকিৎসা

- দৈনন্দিন জীবনে সহজ কিছু পরিবর্তন আনার মাধ্যমে আপনি অ্যাসিড রিফ্লাক্স সারিয়ে তুলতে বা কমিয়ে আনতে পারবেন। যেমন:

১. একবারে ভরপেট খেলে এই সমস্যা বেশি হয়। সারা দিনে ভাগ করে অল্প অল্প করে খাবার খাবেন।

২. যে সকল খাবার কিংবা পানীয় খেলে আপনার সমস্যা বেড়ে যায়, সেগুলো এড়িয়ে চলবেন।

৩. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ৩ থেকে ৪ ঘন্টার মধ্যে কিছু খাবেন না।

৪. বিছানায় শোবার সময় আপনার মাথা আর বুক যাতে কোমরের চেয়ে ২০-১০ সেন্টিমিটার উঁচু অবস্থানে থাকে। তাতে পাকস্থলীর অ্যাসিড গলা পর্যন্ত উঠে আসতে পারবে না। বালিশ দিয়ে মাথা উঁচু করবেন না। তোষকের নিচে বা খাটের নিচে কিছু দিয়ে খাটের একটা দিক উঁচু করে নিবেন এবং সেইদিকে মাথা দিবেন।

৫. এমন কাপড় পরবেন না যা কোমরে আঁটসাঁট হয়ে বসে থাকে।

৬. আপনার ওজন অতিরিক্ত হলে তা কমিয়ে ফেলুন।

৭. ধূমপান করবেন না।

৮. মনে প্রশান্তি আনে এমন কিছু কাজ নিয়মিত করুন।

৯. নিজে নিজে আইবুপ্রোফেন (ibuprofen) অথবা অ্যাসপিরিন (aspirin) সেবন করবেন না, কারণ এই ওষুধগুলো বদহজম আরো বাড়ায়। তবে আপনি যদি ডাক্তারের পরামর্শে এই ওষুধগুলি খান, তাহলে কোনভাবেই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে ওষুধগুলো বন্ধ করবেন না।

বমি

- নাক মুখ দিয়ে পাকস্থলীর জিনিষ অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেরিয়ে যাওয়া হল বমি।
- **বমি বমি লাগা (Nausea) :** গলার উপরে পিছনের দিকে এবং পাকস্থলীতে অস্বস্তিকর একটা অনভূতি ।ঢোক গিলতে অস্বস্তি লাগা সাথে মাথার মধ্যে হালকা হালকা লাগতে থাকে।
- **Nausea** হল পাকস্থলীর জিনিষ বের করে দেবার ইচ্ছা আর বমি হল বের করে দেওয়া।
- ২ টা অনুভূতিই মারাত্মক নয় এবং ৩/২ দিনের বেশি থাকে না।

বিনা ঔষধে বমিবমি ভাব থেকে পরিত্রানের উপায়

১. মুক্ত বাতাসে থাকুন নিশ্বাস নিতে থাকুন।

২. নিজেকে পরিস্থিতির বাইরে নেবার চেষ্টা করতে হবে -আকর্ষনীয় গানবাজনা শুনুন,সিনেমা দেখুন।

৩. ঠান্ডা পানীয়তে চুমুক দিতে থাকুন।

৪. পুদিনার চা,আদা চা ও লেবু ঘ্রান স্বস্তি দিতে পারে।

৫. এলকোহল ও সফ্‌ট ড্রিংক্স বাদ দেয়া ভালো।রোমা বা সুগন্ধি থেরাপি কাজ করে।

৬. আকুপ্রেশার চিকিৎসাপদ্ধতি উপকারী।

বমি বমি ভাব হওয়ার কারণ

- বমি বমি ভাবের সাথে অন্য কোনো উপসর্গ থাকলে সেগুলো দেখে বমি বমি ভাবের কারণ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তবে কখনো কখনো অন্য কোনো উপসর্গ ছাড়াই, শুধু বমি বমি ভাব থাকতে পারে।

বমি বমি ভাবের সাথে অন্য লক্ষণঃ সম্ভাব্য কারণ

- ডায়রিয়া ও বমি
- ফুড পয়জনিং
- মাথাব্যথা ও জ্বর
- ফ্লু বা এ জাতীয় কোনো ইনফেকশন
- খাওয়ার পর বুক জ্বালা-পোড়া করা অথবা পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেওয়া : এসিড রিফ্লাক্স (পাকস্থলীর এসিড খাদ্যনালী দিয়ে উপরে উঠা আসা), যাকে 'গ্যাসের সমস্যা' বলা হয়
- মাথাব্যথা এবং তীব্র আলো ও শব্দের প্রতি সংবেদনশীলতা
- মাইগ্রেন
- মাথা ঘুরানো
- লেবিরিন্থাইটিস বা ভার্টিগো

অন্যান্য যেসব কারণে বমি বমি ভাব হয়

- গর্ভাবস্থায় মর্নিং সিকনেস হলে বমিবমি ভাব দেখা দেয়
- মোশন সিকনেস এর কারণে চলন্ত গাড়িতে থাকা অবস্থায় বমি বমি ভাব দেখা দিতে পারে
- দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় অনেক সময় এমনটা হতে পারে
- মদ্যপান করলে বমি বমি ভাব হতে পারে
- অনেকের ঔষধ সেবনের পরে বমি ভাব দেখা দেয়
- সম্প্রতি সার্জারি হয়েছে এমন রোগীদের অনেক সময় বমি বমি ভাব বোধ হতে পারে

ঠিক কী কারণে বমি বমি ভাব হচ্ছে তা বুঝতে না পারলে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যেসব উপায় অবলম্বন করলে সাধারণত বমি বমি ভাব দূর হয় সেগুলো চেষ্টা করে দেখতে হবে। তারপরও ভালো না হলে কিংবা কয়েকদিন পরও বমি বমি ভাব না গেলে ডাক্তার দেখিয়ে নিন।

বমি বমি ভাব দূর করতে যা যা করতে পারেন–

- খোলা হাওয়া বা বিশুদ্ধ বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারেন
- অন্য দিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। যেমন: গান শোনা, বই পড়া অথবা কোনো মুভি দেখা।
- এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে তাতে কিছুক্ষণ পরপর চুমুক দিতে পারেন। অনেকের ক্ষেত্রে কোক, ফান্টা বা এ জাতীয় কোমল পানীয় পান করলে বমি বমি ভাব সেরে যায়।
- আদা বা পুদিনা/পেপারমিন্ট দিয়ে চা খেতে পারেন।
- ভালো পরিমাণে আদা আছে এমন খাবার খেতে পারেন। যেমন: বাজারে জিনজার বিস্কুট পাওয়া, আদার ফ্লেভার যুক্ত কিছু পানীয় ও পাওয়া যায়।
- একসাথে বেশি পরিমাণে খাবার খাওয়া পরিহার করা উচিত। এর পরিবর্তে ঘনঘন ও কম পরিমাণে খাবার খাওয়া যেতে পারে।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন?

- সাধারণত বমি বমি ভাব বা এজাতীয় সমস্যা কিছু সময়ের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

১. কয়েকদিন ধরে এই সমস্যা থাকলে এবং নিজে থেকে সেরে না উঠলে।

২. নিয়মিত অথবা ঘন ঘন এমন সমস্যা দেখা দিলে।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়

- যদি বমি বমি ভাবের সাথে বমিও হতে থাকে তবে সাবধান থাকতে হবে। কারণ বেশি বমি হলে শরীর থেকে পানি বেরিয়ে গিয়ে আপনি পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হতে পারেন। পানিশূন্যতা ঠেকাতে বাড়িতে খাবার স্যালাইন বানিয়ে পান করতে পারেন।ওরস্যালাইন প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়।ডায়াবেটিকদের জন্য রাইসস্যালাইনও পাওয়া যায়।বানানোর নিয়ম প্যাকেটের গায়ে লিখা আছে।

জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে যেতে হবে কখন?

- যদি হঠাৎ করে বমি বমি ভাব হয় এবং সেই সাথে।

১. এমন ভাবে বুকে ব্যথা হতে থাকে যাতে মনে হয় যে বুকে কিছু একটা চাপ দিয়ে আছে অথবা বুক ভার হয়ে আছে।

২. বুকের ব্যথাটি যদি হাতে, পিঠে, গলায়, ঘাড়ে অথবা চোয়াল পর্যন্ত ছড়াতে থাকে।

৩. দম বন্ধ হয়ে আসলে অথবা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলে।

- এসব হার্ট অ্যাটাক এর লক্ষণ হতে পারে। তাই এমন অবস্থায় দেরি না করে যতদ্রুত সম্ভব হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

শ্বাসকষ্ট

- **শ্বাসকষ্ট :** ফুসফুস, হার্ট অনেক কারণেই হয়। হাঁপানি থাকলে ইনহেলার নিলে কমবে,অন্য কিছুতে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।

কাশি

- **কাশি :** মূলতঃ ফুসফুসের অসুখের উপসর্গ, সাথে জ্বর থাকলে আরও বেশি সম্ভাবনা। কাশির সিরাপ কোন ঔষধ না,মনের শান্তির জন্য সবাই খায়।

নাকদিয়ে রক্ত পড়া (এপিস্টাক্সি)

- বড় অসুখ নয়,ঘাবড়িয়ে গেলে ঝামেলা। উচ্চ রক্তচাপ এটার কারণ নয়, টেনশনে অনেকের প্রেশার বাড়ে। প্রেশার কন্ট্রোল করলেও রক্ত ঝরা কমে না। নাকের ভিতরের রক্তনালী খুব ভাসা-ভাসা; সামান্য আঘাত (নাক খুঁটা) লাগলে অনেক রক্ত ঝরতে পারে।
- **ব্যবস্থা:** মাথা সামনে ঝুলিয়ে বসতে হবে, শোয়া নিষেধ কারণ রক্ত ফুসফুসে গেলে বিপদ। নাকের সামনের দিকে নরম অংশ দুই আংগুলের মধ্যে চেপে ধরে রাখতে হবে। নাকে,কপালে বরফ ধরতে হবে।

চোখ উঠা (Conjunctivitis)

- **চোখ উঠলে :** দিনের বেলা ড্রপ যত বেশি দেয়া যায় এবং রাতে মলম।
- চোখে কিছু ঢুকলে ডাক্তার দেখাতে হবে - কর্ণিয়ার আলসার হলে অন্ধ হতে পারে।

কান

- **কান পাকা/পর্দা ফাটা :** এগুলো বড় অসুখ নয় যদি সময় মত ব্যবস্থা নেয়া যায়।

কানপাকা সাধারণত : সর্দি কাশির পরে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোটকাল

থেকেই হয়। কানে ব্যথা হয়, পুঁজ পড়ে। বেশি হলে কানে কম শুনে। মাথা ঘুরতে পারে। কানে পানি গেলে বেশি হবে। অল্পদিনের (একিউট) হলে এন্টিবায়োটিক খেতে হবে। সারা বছর পুঁজ পড়লে সারানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

পর্দা ফাটা শুনলে ভয় লাগতে পারে। নাক, কান ও সাইনাসের ইনফেকশন থেকে এটা হয়। পর্দায় প্রেশার পড়লেও হয়। গোসল করার সময় পানি না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। গোসলের আগে কানে তেল দিয়ে, তুলায় তেল দিয়ে কানে দেবার অভ্যাস করতে হবে। পানির নীচে মাথা ডুবিয়ে গোসল নয়। পানিতে ঝাঁপ নয়। শুকনা কানে ড্রপ নয়।

- **কানে অস্বাভাবিক শব্দ (টিনেটাস):**

কানে বিরক্তিকর ঝি ঝি শব্দ, ঢোল পেটানোর ও ট্রেন চলাচলের শব্দ; ঘন্টা বাজানো বা অকারনে শোঁ শোঁ শব্দ আসলেই বিরক্তিকর। এটা জীবনসংহারী কিছু নয় ।

কারণ : বহি:কর্নে ময়লা বা খৈল থাকলে বা মধ্য কর্নে পুঁজ জমলে মানে ইনফেকশন হলে পর্দা ফাটলে বা পানি জমলে হতে পারে। কানের ভিতর চুলের মত ক্ষুদ্র কোষ থাকে। সঠিক ভাবে এগুলো কাজ না করলে মস্তিষ্ক অনিয়মিত সিগন্যাল পৌঁছায় তাই শব্দ অস্বাভাবিক শ্রুত হয়।

চিকিৎসা : কারণ অনুযায়ী। রক্তশূন্যতা, উচ্চ রক্তচাপ কানের টিউমার বা অন্য অসুখের চিকিৎসা করতে হবে। ক্ষতিকারক ঔষধ বাদ দিতে হবে। সম্পূর্ণ নিরাময় নাও হতে পারে। নিদ্রা ঠিকমত হলে মানসিক যন্ত্রণা কমাতে পারলে অনেকে ভাল থাকেন; ডাক্তার সে অনুযায়ী থেরাপি ও ঔষধ দিয়ে থাকেন।

বিষ পান/ট্যাবলেট খাওয়া (পয়জন)

বিষ খাওয়া বলতে আমরা ফসলে ছড়ানো ঔষধ (অরগানোফসফরাস) কে বুঝি। ইদানীং ট্যাবলেট খাওয়ার ঘটনাও অনেক। সাধারনত: ঘুমের ঔষধ (ডায়জিয়াম, এমিট্রিপটানিল, মরফিন) ব্যবহার হয়ে থাকে। একসাথে বিভিন্ন ধরণের ঘুমের ঔষধ (ককটেল) খেতে পারে।

চিকিৎসা: উদ্দেশ্য হবে ঔষধ যেন রক্তে না ঢুকে বা যত কম রক্তে যায়।

মুখে খেলে স্টোমাক ওয়াশ বা পাকস্থলী খালি করতে হবে। কেরোসিন, হারপিক (এসিড, ক্ষার) খেলে স্টোমাক ওয়াশ নিষেধ। ফসলে দেয়া ঔষধ কাপড়ে চুষে চামড়া দিয়ে রক্তে যায়, কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে ভাল করে ধুইয়ে দিতে হবে।

এন্টাগনিস্ট: রক্তে ঢুকে কোন জায়গায় কাজ করছে সেটা ঠেকানো উদ্দেশ্য। যেমন অরগানোফসফরাসের এন্টাগনিস্ট এট্রপিন।

এন্টিডট: বিষের প্রতিক্রিয়া বন্ধ করে। সব বিষের আলাদা আলাদা এন্টিডোট; একটা দিয়ে আরেকটা ঠেকানো যাবে না। অরগানোফসফরাসের এন্টিডট প্রালিডক্সি দিয়ে এমিট্রিপটানিলে কাজ হবে না।

বিষের আসল চিকিৎসা হাসপাতালে যাওয়া, যেখানে উপরের ব্যবস্থা পাওয়া যাবে। আজকাল যে কোন গ্রাম থেকেই জেলা বা উপজেলা হাসপাতালে যেতে ৩০-১৫ মিনিটের বেশি লাগে না, তাই এটা কঠিন নয়; দেরি নয়।

২য় অধ্যায়

সাধারণ চিকিৎসা

সঠিক ব্যায়াম / সঠিক হাঁটা

১. ফিটনেস, রক্তে শর্করা বা চর্বির মাত্রা এবং ওজন ঠিক রাখার জন্য সপ্তাহে ১৫০ মিনিট হাঁটাহাঁটি যথেষ্ট। প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ মিনিট হাঁটলে এই কোটা পূর্ণ হয়। কেউ চাইলে প্রতিদিন না হেঁটে একদিন পরপর একটু বেশি হাঁটলেও চলবে, কিন্তু এর চেয়ে (পর পর ২ দিন) বেশি বিরতি দেওয়া যাবে না।

২. হাঁটার গতি হবে মাঝারি। দৌড়ানোর মতো নয়, আবার একেবারে হেলেদুলে হাঁটাও নয়। প্রথমে পাঁচ মিনিটের হালকা গতিতে হেঁটে শরীরের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ভালো। তারপর ধীরে ধীরে গতি বাড়ান। প্রশ্রিম এমন হবে যে আপনি একসময় ঘামতে শুরু করবেন, হৃৎস্পন্দন দ্রুত হবে, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন হবে। হাঁটা শেষে পাঁচ মিনিট জিরিয়ে নিন।

৩. হাঁটার শুরুতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করে নিতে পারেন। নাক দিয়ে জোরে শ্বাস নিন, ফুসফুস বাতাস দিয়ে ভরে ফেলুন। নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় পেট খালি করে মুখ দিয়ে জোরে ছাড়ুন। এ রকম কয়েকবার করুন।

৪. হাঁটার সময় হাত দুটো সামনে-পেছনে নাড়বেন। ৯০ ডিগ্রি কোণে হাত রেখে গতির সঙ্গে সামনে-পেছনে সুইং করবেন। এতে ভারসাম্য ঠিক থাকবে।

৫. হাঁটার সময় সামনে কিছুটা ঝুঁকে হাঁটবেন। কাধ এবং কোমর যথাসম্ভব সমান্তরালে রাখার চেষ্টা করবেন।

৬. আরামদায়ক, ঠিক মাপের কেডস জুতো পরে হাঁটুন স্যান্ডেল বা খোলা জুতা পরে হাঁটবেন না।

৭. ২২০ বয়স (বছর) এর ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ, হৃদস্পন্দন হলে সঠিক হাঁটা হয়েছে ধরতে হবে। (৬৫-২২০ x ১০৫ = ৭০ শতাংশ/মি:) ৬৫ বছর বয়স্ক লোকের জন্য।

মাথাব্যথা ও ব্যায়াম

ব্যায়াম ২

মাথাব্যথা, বিশেষত মাইগ্রেন ও উদ্বেগজনিত ব্যথা বা টেনশন হেডেক কমাতে নানা ধরনের ব্যায়াম শিথিলায়ন (Relaxant) আসলেই কার্যকর। এটা বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। নিয়মিত ব্যায়াম ও হাঁটাহাঁটিতে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা তুলনামূলক কম আক্রান্ত হন মাথাব্যথায়।

সহজ কিছু উপায় : গভীর শ্বাসের ব্যায়াম: একটি নিরিবিলি ঘর বেছে নিন।

মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে আরাম করে বসুন। তারপর গভীরভাবে একবার পাঁচ পর্যন্ত গুনতে গুনতে শ্বাস নিন। তারপর আবার পাঁচ গুনতে গুনতে শ্বাস ছাড়ুন। লক্ষ্য রাখবেন, শ্বাসটা যেন আপনার পেটের ভেতর থেকে আসে। এভাবে বেশ কয়েকবার শ্বাস-প্রশ্বাসের এই ব্যায়াম বা রিদমিক ব্রিদিং এক্সারসাইজ করুন।

মাংসপেশির শিথিলায়ন : চোখ বন্ধ রেখে চিত হয়ে শুয়ে মাথাব্যথার কেন্দ্রবিন্দুটি স্থির করুন। এবার গভীরভাবে শ্বাস নিতে চেষ্টা করুন মাংসপেশিগুলোকে শিথিল করে দিতে। ঘাড়ের ওপর মাথা ধীরে ধীরে চারদিকে ঘোরান। তারপর কাঁধ উঁচু-নিচু করার ব্যায়াম করুন। মনে মনে কোন সুন্দর ভাবনা বা দৃশ্য কল্পনা করুন। তারপর শ্বাসটা ছেড়ে দিন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করুন। টানা ১০ মিনিট ধরে ব্যায়ামটি করবেন।

সংগীতের মূর্ছনা : হালকা মনোহারী কোনো সংগীতের মূর্ছনা বা মিউজিকের সঙ্গে যদি ব্যায়ামগুলো করা যায়, তা শিথিলায়নে বেশ কাজে দেয়। এ ক্ষেত্রে একট ধীরলয়ের ও মৃদু মিউজিক বেছে নিতে হবে।

যোগব্যায়াম : নানা ধরনের যোগব্যায়াম ও মেডিটেশনের সাহায্য নিতে পারেন। নিয়মিত ব্যায়াম করুন। এতে শরীর হালকা ও ঝরঝরে হবে এবং মাংসপেশিতে রক্ত চলাচল বাড়বে। ব্যায়ামে স্নায়ু থেকে এনডোরফিন নিঃসৃত হয়, যা উদ্বেগজনিত মাথাব্যথা কমাতে সহায়ক। পছন্দের যেকোনো ব্যায়াম, যেমন সাইকেল চালনা, জগিং, বাগান করা, সাঁতার, অ্যারোবিকস, নাচ ইত্যাদি অভ্যাস করুন।

ভারী ব্যায়াম

ব্যায়াম ৩

হাঁটু বা গোড়ালির ব্যথা, পায়ের যেকোনো ধরনের আঘাত কিংবা শরীরে অতিরিক্ত ওজনের কারণে সবার পক্ষে সব ধরনের ব্যায়াম করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই বলে ব্যায়াম বন্ধ রাখবেন? অবশ্যই না। কিছু কিছু ব্যায়ামে শরীরের ওজন বহন করতে হয় না। ব্যথা বা বাড়তি ওজনের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সাঁতার সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম। পানিতে পায়ের ওপর বাড়তি চাপ না ফেলেই বা কোনো ওজন বহন ছাড়াই সাঁতার কাটা যায়। পায়ে ব্যথা পেলে ব্যায়াম করার আগে চিকিৎসকের পরার্শ নিন। কখনো আঘাত লেগে হাড়ের সামান্য অংশ ভেঙে বা ফেটে গিয়ে থাকতে পারে। এ অবস্থায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পায়ের পূর্ণ বিশ্রাম লাগতে পারে। অন্যান্য আঘাতের ক্ষেত্রে বিছানার ধারের দিকটায় বসে ধীরে ধীরে পা ঘোরাতে থাকুন চক্রাকারে; এতে পায়ে চাপ লাগবে না, আবার রক্তসঞ্চালনও ঠিক থাকবে। দিনে দুই দফায় এভাবে কয়েকবার পায়ের ব্যায়াম করা যায়। সাইকেল চালাতে পারেন। বাইরে না পারলে ঘরে স্থির সাইকেলের (স্টেশনারি বাইক) ব্যবস্থা করতে পারেন। প্যাডেল করার সময় পিঠের নিচে বেশি চাপ পড়ছে বলে মনে হলে পেটের মাংসপেশি সংকোচন করতে থাকুন একট একট করে। হালকা ডামবেল তোলার ব্যায়াম মাংসপেশি সবল থাকবে এবং বসে ও শুয়ে কিছু ব্যায়াম করা সম্ভব। যেমন: সোজা হয়ে শোয়া অবস্থায় এক হাঁটুর নিচে একট উঁচু কোনো জিনিস রেখে ধীরে ধীরে পা উঠাতে থাকুন। পা ওঠানোর সময় পায়ের আঙুলগুলো টনটন করে নিজের দিকে রাখতে চেষ্টা করুন। নামানোর সময় টান টান ভাবটা আর রাখবেন না। দুই পায়ে কয়েকবার করে দুই-তিন বেলা এই অনুশীলন করা যায়। বসা অবস্থায় মাটি থেকে এক পা ধীরে ধীরে তুলুন এবং মাটির সমান্তরাল করতে চেষ্টা করুন। এবার পায়ের আঙুলগুলো নিজের দিকে টান টান করে রাখুন। আবার ধীরে ধীরে আঙুল ও পা স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন। এই ব্যায়ামও দুই-তিন বেলা করতে পারেন।

ঘাড়ের ব্যায়াম

ব্যায়াম ৪

যাদের দীর্ঘ সময় ডেস্কে বসে বা কম্পিউটারে কাজ করতে হয়, বিশেষ করে ঘাড় নিচ করে টাইপ করে যেতে হয় ঘণ্টার পর ঘন্টা, তাঁদের ঘাড়ের মাংসপেশির ওপর টান পড়ে। এ ছাড়া সারাক্ষণ সামনে ঝুঁকে কাজ করার জন্য ঘাড়ের মেরুদণ্ডের হাড়েও সমস্যা হয়। এ ছাড়া অনেকে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বা বসে বারবার ঘাড়

কোনো এক দিকে বাঁকিয়ে কথা বলেন বা তাকান-তাঁদের ঘাড়ে ব্যথা সাধারণ সমস্যা। অফিসে বসে এ ধরনের কাজের ফাঁকে মাঝেমধ্যে খুব সহজ কিছু ব্যায়াম এই ঘাড়ব্যথা থেকে রক্ষা করবে।

১. কাজের ফাঁকে সময় পেলে চেয়ারে প্রথমে পিঠ সোজা করে বসুন, চেয়ারের সমানের দিকে একটু এগিয়ে বসুন। এবার হাত দুটি পেছনে নিয়ে দুই হাতের তালু এক করার চেষ্টা করুন।

২. এ কাজ করতে গিয়ে আপনার কাঁধ ও দেহের মাঝের অংশ (বুকসহ) একটু সামনে এগিয়ে যাবে।

৩. হাত দুটি এক করতে কষ্ট হলে অন্তত যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে আঙুলগুলো ধরার চেষ্টা করবেন।

৪. এবার বড় করে শ্বাস নিন। তারপর মাথাটা ঘাড়ের ওপর পেছনে। পিঠের ওপর ফেলে দিন। এতে কাঁধ ও বুকের পেশি আরও টানটান হয়ে উঠবে।

৫. কয়েক সেকেণ্ড এই ভঙ্গিতে থেকে জোরে জোরে শ্বাস নিন। তারপর ধীরে ধীরে প্রথমে ঘাড় ওপরে তুলুন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসুন। প্রতিদিন অফিসে বসে নির্দিষ্ট বিরতিতে তিন থেকে পাঁচবার এই ব্যায়ামটি করলে ঘাড়ব্যথা ও ঘাড়ের পেশির টান কমবে।

৬. ২০ মি. পর পর ২০ সে. এর জন্য ২০ ফুট দূরে তাকিয়ে থাকুন।

ব্যায়াম স্থান/কাল

ব্যায়াম ৫

কখন হাঁটা বা ব্যায়াম করা উচিত? সকালে না বিকেলে? রাতে হাঁটা কি খারাপ? ঘুমের আগে হাঁটলে কি ঘুমের ব্যাঘাত হবে? এ রকম নানা প্রশ্ন মনে। আসলে নিজের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে আপনার জন্য যে সময়টা সবচেয়ে উপযোগী

সেই সময়টাই বেছে নিন। নিয়মিত ব্যায়াম করাটাই আসল কথা। নিরাপত্তার বিষয়টিও খেয়াল রাখুন। বাইরে না যেতে পারলে বাড়ির ছাদ হতে পারে তুলনামূলক নিরাপদ। বাইরে ব্যায়াম করার সময়- সুযোগ অনেকেই পান না। তাঁরা বাড়ির বারান্দায় ব্যায়াম করতে পারেন। লম্বা বারান্দা বা করিডোর থাকলে

সেখানেই হাঁটতে পারেন। ঘরের ভেতর বড় জায়গা না থাকলে ঘরের এক কোনা

থেকে আরেক কোণা বরাবর বেশ কয়েকবার হাঁটুন। বদ্ধঘরে বা জিমে উন্মুক্ত হাওয়া পাওয়া যায় না, তবে না বেরোতে পারলে তাও ভালো। রোদে ব্যায়াম করলে সহজেই হাঁপিয়ে উঠবেন; ত্বকেও রোদের বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তাই সকাল

১০টার আগে বা বিকেল ৪টার পর বাইরে হাঁটা উত্তম। ভরপেট খাবার পরপরই ব্যায়াম করা ঠিক নয়। ভরপেট খাবার খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর ব্যায়াম করা যায়। সকালে বা বিকেলে হালকা নাশতা করার এক ঘন্টা পর ব্যায়াম করতে পারেন। আবার ভোরে নাশতার আগেও ব্যায়াম করা যায়। ব্যায়াম শেষে ১৫-১০ মিনিট পর খাবার খেতে পারেন। ব্যায়ামের মাঝেও সামান্য পরিমাণ হালকা খাবার খাওয়া যায়, দুএক ঢোঁক পানিও খাওয়া যায়। যাদের দিনে সময় নেই, তাঁরা রাতের খাবারটা জলদি খেয়ে ২ ঘণ্টা পর একট হাঁটতে পারেন। ডায়াবেটিস

রোগীরা একেবারে খালি পেটে ভোরে হাঁটতে যাবেন না, হালকা কিছু খেয়ে নেবেন। ব্যায়ামের সময়টা যা-ই হোক, প্রতিদিন ব্যায়াম করুন। সপ্তাহে ৫ দিন আধঘণ্টা করে সময় অন্তর ব্যায়াম চালিয়ে যান। তবে পরপর দুই দিন বিরতি দেবেন না। প্রতিদিন একই সময়ে (সকালে হলে সকালে, বিকালে হলে বিকালে) হাঁটা ভাল।

ব্যায়ামের জন্য সময়?

ব্যায়াম ৬

ব্যস্ত জীবনে সময়ের বড় অভাব। সকাল থেকে রাত অবধি তো নানা কাজে ছুটছেন। এর মধ্যে ব্যায়ামের জন্য একট সময় বের করার ফুরসত কোথায়? তাই বলে নিজের জন্য খানিকটা সময় তো ব্যয় করতেই হবে। নইলে হিসাব মেলানোর সময় লাভের চেয়ে ক্ষতিটাই দেখা যাবে বেশি। সপ্তাহে সাত দিন, মানে ১০ হাজার

৮০ মিনিট। এর মাঝে মাত্র ১৫০ মিনিট সময় বের করা সত্যিকার অর্থে কি খুব কষ্টকর হওয়ার কথা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সপ্তাহে ১৫০ মিনিট মাঝারি ব্যায়াম করাই যথেষ্ট। মাঝারি ব্যায়াম মানে জোরে হাঁটা, সাইকেল চালনা, সাঁতার কাটা, অ্যারোবিকস ইত্যাদি। এই হিসাব মেলাতে প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা সময় বের করতে যদি না-ও পারেন, পাঁচ দিনে ৩০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখুন। তা-ও না পারলে তিন দিনে (মানে একদিন পরপর) ৫০ মিনিটি করে সময় বের করুন একেবারেই সম্ভব না হলে সাপ্তাহিক ছুটির দুই দিন ব্যায়াম করুন। যেভাবেই হোক, সপ্তাহে ১৫০ মিনিটের এ হিসাব মেলানোর ব্যবস্থা করুন। ভারী ব্যায়াম করতে পারলে সপ্তাহে ৭৫ মিনিটি রাখলেও চলবে। জোরে দৌড়ানো বা ব্যায়ামগারে নির্দেশিত ব্যায়াম হলো ভারী ব্যায়াম। অফিসে বা ঘরে হয়তো অনেক কাজই করা হয়, তব ব্যায়ামের জন্য আলাদা করে সময় বের করা জরুরি। অফিসের চেয়ারে বা বাড়ির কাজকর্মে যতটাই কর্মঠ হোন, সুস্থ থাকতে শরীরচর্চার বিকল্প নেই।

ভারসাম্য ঠিক রাখার ব্যায়াম?

ব্যায়াম ৭

শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা আমাদের কাছে মোটামুটি পরিচিত। বয়স্ক ব্যক্তিরা এভাবে পড়ে গিয়ে অনেক সময় মারাত্মক আঘাত পান। একটু কম বয়স থেকেই নিয়মিত ভারসাম্যের ব্যায়াম করা ভালো। এতে শারীরিক ভারসাম্য রক্ষার সামর্থ্য বাড়ে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে কিংবা যোগব্যায়ামের কয়েকটি আসন বা ভঙ্গি অনুশলীনের মাধ্যমে শরীরে ভারসম্য রাখার ক্ষমতা বাড়ানো যায়। এ রকম কয়েকটি ব্যায়াম:

- প্রথমে দুই পায়ের পাতা কাছাকাছি রেখে দাঁড়ান। এরপর ডান পা একট নিয়ে বাঁ পায়ের ঠিক সামনে আনুন। এবার একইভাবে বাঁ পায়ের পাতা উঠিয়ে ডান পায়ের ঠিক সামনে নিয়ে আসুন। এভাবে ঠিক একটি লাইন বা সরলরেখা বরাবর হাঁটতে থাকুন।
- কোমরে দুই হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান। দুই পায়ের পাতা একসঙ্গে থাকবে। ডান হাঁট ওঠাতে শুরু করুন। স্বস্তির সঙ্গে যতটা সম্ভব হাঁট ওঠান। আপনার ডান উরু মোটামুটি মেঝের সমান্তরাল হওয়ার আগ পর্যন্ত চেষ্টা করুন। তবে ব্যথা

বা অস্বস্তি অনুভব করলে বেশি দূর ওঠাবেন না। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকুন। আরও দুবার একই পদ্ধতিতে ডান হাঁটুর ব্যায়াম করুন। এরপর একইভাবে বাঁ হাঁটুর ব্যায়াম করুন তিনবার। অভ্যস্ত হয়ে গেলে প্রতি হাঁটুর জন্য তিন বারের পরিবর্তে চারবার এবং এরপর ধীরে ধীরে পাঁচবার পর্যন্ত অনুশীলন করতে পারেন।

- শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। পেটের দুপাশে হাত দিয়ে ভারসাম্য ঠিক রাখতে চেষ্টা করুন। যে পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ভারসাম্যের জন্য শরীরের সেই পাশে পশ্চাদ্দেশের মাংসপেশি শক্ত রাখুন। আরও সহজভাবে ব্যায়ামটি অনুশীলনের জন্য একটি চেয়ারের পেছন দিকটা ধরে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন।
- মাংসপেশির সবলতা ভারসাম্যের অন্যতম শর্ত। বয়স বেড়ে যাওয়ার পর অনেকে চেয়ার বা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে, নিচ জায়গা থেকে উঠতে বা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সমস্যা অনুভব করেন; তরুণ বয়স থেকেই মাংসপেশি সবল রাখার ব্যায়াম করলে এমন সমস্যা এড়ানো সম্ভব। পুশআপ আর ওজন তোলার ব্যায়াম মাংসপেশিকে সবল রাখতে সাহায্য করে। রাবার ব্যান্ডের মতো স্থিতিস্থাপক ব্যান্ডের (বড় আকরের) সাহায্যে বিভিন্ন মাংসপেশির ব্যায়াম করতে পারেন। ব্যান্ডের টান বা চাপের বিরুদ্ধে হাত ও পান টান টান করার এসব ব্যায়ামের মাধ্যমে মাংসপেশি সবল হয়ে ওঠে।

ক্লান্তি ও ব্যায়াম

ব্যায়াম ৮

কর্মব্যস্ত দিনের ক্লান্তি দূর করতে ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এতে খুব বেশি সময়ও লাগে না, ১৫-১০ মিনিটই যথেষ্ট। এসব ব্যায়ামের প্রতিটিতে ২০ সেকেন্ড মতো সময় ধরে নির্দিষ্ট মাংসপেশির স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে হবে।

১. কপাল কুঁচকে ফেলুন। এ অবস্থায় ভ্রু দুটি উঁচ করুন। এই ভঙ্গিতে কপালের মাংসপেশি সংকুচিত হয়। ২০ সেকেন্ড পর ধীরে ধীরে কপালটাকে আগের মতো স্বাভাবিক করবেন।

২. শক্তভাবে চোখ বন্ধ করে থাকুন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হোন।

৩. মুখ বন্ধ অবস্থায় জিভের সাহায্যে শক্তভাবে তালুর দিকে চাপ দিয়ে রাখুন। খুব আস্তে অবার আগের অবস্থায় আসুন।

৪. দাঁতে দাঁত চেপে রাখুন। একইভাবে ২০ সেকেন্ড পর স্বাভাবিক হোন।

৫. থুতনি ঝুঁকিয়ে বুকের কাছে আনুন, যতটা পারেন। এবার এ অবস্থায় ২০ সেকেন্ড থাকুন এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হোন।

৬. যতটা সম্ভব গভীরভাবে বুক ভরে শ্বাস নিন, তারপর একইভাবে স্বাভাবিক হোন।

৭. এক এক করে পেটের মাংসপেশি, উরুর মাংসপেশি ও বাহুর মাংসপেশি সংকোচন করে রাখুন ২০ সেকেন্ডর জন্য। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যান।

৮. সম্পূর্ণ হাতের মাংসপেশি শক্তভাবে সংকুচিত করুন এবং একই সঙ্গে হাত দুটো মুঠো অবস্থায় রাখুন। একই নিয়মে ২০ সেকেন্ড পর স্বাভাবিক হোন।

৯. পা দুটো দিয়ে মেঝেতে চাপ দিয়ে রাখুন এবং একই নিয়মে স্বাভাবিক করুন

১০. পায়ের আঙুলগুলো টান টান করে উঁচ করতে চেষ্টা করুন। একইভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। এভাবে প্রতিদিন দুবেলা ব্যায়াম করুন। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আপনি সহজেই মাংসপেশি শিথিল করতে শিখে যাবেন বলে আশা করা যায়।

১১. শ্বাসের ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। সে ক্ষেত্রে প্রথমে খুব আস্তে আস্তে বুক ভরে শ্বাস নিন। সম্পূর্ণ বুক ভরে বাতাস নেওয়ার পর অল্প সময়ের জন্য শ্বাস ধরে রাখুন। এবার শিথিলতা বা আরাম অনুভব করতে চেষ্টা করুন মনের ভেতর থেকে। এ সময় ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে থাকুন। একই পদ্ধতিতে ১০-৫ বার ব্যায়াম করুন। সারা দিনে তিন-চারবার এই ব্যায়াম করতে পারেন।

শীতে ব্যায়াম

ব্যায়াম ৯

শরীর সুস্থ রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম জরুরি। কিন্তু এই শীতে আরামের ঘুম ছেড়ে বেরোতে অনেকেরই আলসেমি হয়। তার ওপর ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ও আছে। এসব অজুহাত দেখিয়ে নিয়মিত ব্যায়াম ছাড়া উচিত নয়। তবে সাবধানতা চাই। ব্যায়ামের সুফলগুলোর কথা মনে করে শুরু করে ফেলুন ব্যায়ামের প্রথম ধাপ। বাকিটা আপনা-আপনি দারুণভাবে সারতে পারবেন। জবুথবু ভাবটা কাটানোই শীতে ব্যায়ামের প্রথম ধাপ। হুট করে ভারী ব্যায়াম করবে না। মাংসপেশি হঠাৎ টান টান করলে ব্যথা হতে পারে। বরং ধীরে ধীরে কঠিন ব্যায়ামগুলো শুরু করবেন। প্রথমে 'ওয়ার্ম আপ' অর্থাৎ, শরীর খানিকটা গরম করে নিন। এপর হালকা ধাঁচের ব্যায়ামগুলো ধীরে ধীরে শুরু করুন। যেসব ব্যায়ামে বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়, সেগুলো পরে করুন। ব্যায়াম শেষ করার বেলায়ও 'কুল ডাউন' করতে ভূলবেন না। শীতের ব্যায়ামের সময় গরম কাপড় তো পরবেন, তবে অতিরিক্ত ভারী পোশাক পরবেন না। ব্যায়াম করতে করতে গরম লাগলে শীতপোশাক সরিয়ে ফেলুন। দু-এক প্রস্থ হালকা পোশাক পরেই ব্যায়াম করা যায়। শীতে পিপাসা তেমন লাগে না বললেই চলে। তবে পানি পান করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। ব্যায়াম এবং কায়িক পরিশ্রম করলে অবশ্যই খানিক্ষণ পরপর পানি পান করার অভ্যাস বজায় রাখুন। শীতে শ্বাসকষ্ট হয়, এমন ব্যক্তির এই সময় ব্যায়াম না করা ভালো। কারণ, ব্যায়ামের ফলে হিতে বিপরীত হতে পারে। ভোরে আর সন্ধ্যায় কুয়াশা পড়ে, পথ তো পিচ্ছিল হয়ই, মাথায় ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। তাই শীতের দিনে অতি ভোরে বা সন্ধ্যার পর নয়, ব্যায়াম করুন দিনের আলোয়।

আচমকা পায়ে টান (ক্রাম্প)?

ঘুমের মধ্যে পায়ের মাংসপেশিতে হাঠৎ প্রচণ্ড টান ও ব্যথা অনুভভ করতে পারেন। এতে ব্যথায় ঘুম ভেঙ্গে যায়, পা নাড়াতে গেলেও কষ্ট হয়। এ রকম নাজুক সময়ে কী করতে পারেন?

১. যে পেশিতে ব্যথা অনুভব করছেন, সেটিতে তাৎক্ষণিকভাবে হাত দিয়ে ম্যাসাজ করুন। সম্ভব হলে একটি কাপড়ে বরফ পেঁচিয়ে নিয়ে তা দিয়ে ম্যাসাজ করুন।

২. মাংসপেশিটি টানটান করতে চেষ্টা করুন।

৩. বসা বা শোয়া অবস্থায় পা সোজা রেখে পায়ের আঙুলগুলোকে ভেতরের দিকে টেনে আনতে চেষ্টা করুন। ব্যথা খানিকটা কমে এলে কুসুম গরম পানি ঢালতে পারেন আক্রান্ত স্থানে। গরম সেঁকও দিতে পারেন। যেকোনো ব্যায়ামের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ান। একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে বা বসে কাজ করতে হলেও মাঝে মাঝে পায়ের অবস্থান পরিবর্তন করুন।

৪. প্রতিদিন প্রচুর পানি পান করুন এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন।

৫. অনেক সময় এসব ক্ষেত্রে পায়ে ব্যথা ও টান ধরে থাকা ছাড়াও পায়ের পেশিতে চাকা বেঁধে আছে বলে মনে হতে পারে।

৬. যেদিকে টান পড়ে উল্টা দিকে পা ঘুরান ও ম্যাসেজ করুন।

৭. কুইনিন ৩০০ মি. গ্রাম রাতে খেলে বারবার হবে না।

৮. রক্তে ইলেকট্রোলাইট পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম পরীক্ষা করতে পারেন।

৯. ডায়াবেটিসের জন্য রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করা ভুলে যাবেন না।

রক্তের চর্বি কমানোর উপায়?

বয়স ২০ বছরের বেশি হলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একবার রক্তের চর্বির মাত্রা পরীক্ষা করা উচিত। চর্বির মাত্রা বেশি হলে তা হৃদ্‌রোগ ও পক্ষাঘাতের ঝুঁকি বাড়ায়। জীবনাচরণ পরিবর্তন করে ও প্রয়োজনে ওষুধ সেবন করে রক্তে চর্বির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

১। **হাঁটুন:** কায়িক শ্রম ও ব্যায়াম ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বা চর্বির মাত্রা কমায়, আর উপকারী চর্বি এইচডিএলের মাত্রা বাড়ায়। নৈশভোজের পর হাঁটা হাঁটির অভ্যাস করুন। কমপক্ষে ৪৫ মিনিট হাঁটুন। যারা অফিসে সারা দিন বসে কাজ করেন, তারা প্রতি ঘণ্টায় একবার পাঁচ মিনিট হাঁটা বা চলাফেরা করুন।

২। **লাল মাংস ও চর্বি বাদ:** সম্পৃক্ত চর্বিযুক্ত খাবার, যেমন: ঘি, মাখনের তৈরি খাবার, গরু ও খাসির লাল মাংস বাদ দিন। আমিষের উৎস হিসেবে মাছ বেছে নিন। চর্বি ফেলে মাংস খাবেন।

৩। **আঁশযুক্ত খাবার:** প্রতিদিন অন্তত ২০ থেকে ৩৫ গ্রাম আঁশ খাওয়া উচিত। এই আঁশ পাবেন তাজা খোসাসহ ফলমূল, সবজি, গোটা শস্যের তৈরি খাবারে। এই আঁশ রক্তের চর্বি কমাবে।

৪। **মাছ:** মাছ ও মাছের তেল কোলেস্টেরল/ট্রাইগ্লিসারাইড কমায়। এতে থাকে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। সপ্তাহে অন্তত ২ থেকে ৩ বার মাছ খাওয়া উচিত।

৫। **ধূমপান:** ধূমপান চিরতরে ছেড়ে দিন। নিকোটিন রক্তনালির আরও ক্ষতি করে ও উপকারী চর্বি কমায়।

৬। **শর্করা:** অনিয়ন্ত্রিত শর্করা রক্তে ও যকৃতে চর্বি হিসেবে জমা হতে সহায়তা করে। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

মাথা ঘোরা (ভার্টিগো)

মাথা ঘোরার অনুভূতি হলে কারও মনে হয়, তিনি নিজেই ঘুরছেন। আবার কারও মনে হয়, চারপাশের সবকিছু বনবন করে ঘুরছে। আমাদের অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুলার অংশ শরীরের সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। এই কাজের যাবতীয় তথ্য স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। প্রতি মুহূর্তে প্রতি ভঙ্গিমায় শরীর এই ভারসম্য রক্ষা করে চলে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সামান্য গোলমালেই ভারসাম্য নষ্ট হয়। তখনই মাথা ঘোরে। এ সমস্যার সাধারণ কারণগুলো হলো:

১. উচ্চ রক্তচাপ

২. কানের সমস্যা ক) বিনাইন পজিশনাল ভার্টিগো-এতে অন্তঃকর্ণের ভেতর ক্যালসিয়াম জমে; খ) মিনিয়ার্স রোগ-অন্তঃকর্ণের অভ্যন্তরীণ তরলের চাপ পরিবর্তন হয়; গ) প্রদাহ, যেমন: ভাইরাস সংক্রমণ, ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস ইত্যাদি।

৩. মস্তিষ্কের সমস্যা: যেমন: মাথায় আঘাত বা পেট্রাস হাড়ের ক্ষতি, জোরে ঝুঁকনি, স্ট্রোক, টিউমার, মাইগ্রেন ইত্যাদি। ৪. ঘাড়ের সমস্যা; ঘাড়ে আঘাত, স্পনডাইলাইটিস ইত্যাদি।

৫. রক্তে লবণের তারতম্য, কিছ ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মাথা ঘুরলে কান, চোখ ও ঘাড় পরীক্ষা করতে হবে। মিনিয়ার্স রোগে কানের ভেতর শো শো বা দপ দপ শব্দ হয়। বিনাইন পজিশনাল ভার্টিগো হলে মাথা বা ঘাড়ের অবস্থান পাল্টালে বা কাত বদল করলে মাথা ঘোরে। রক্তচাপের পরিবর্তনের জন্য বসা থেকে উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরতে পারে।

কী করবেন?

রক্তচাপ মাপুন ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করুন। দাঁড়ানোর সময় ধীরে ধীরে অবস্থান বদলাবেন। হাঁটার সময় মাথা ঘুরে উঠলে বসে বিশ্রাম নিন। ঘাড়ের রক্তনালিতে চর্বি জমে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, তাই তেল-চর্বি কম খান। যে পাশে শুলে সমস্যা হয় পাশ না ফিরে সে পাশে জোর করে আধা মিনিট শুয়ে থাকুন। কোন অংশ দূর্বল থাকলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

শীতের সবজি কেন খাবেন

শীতকালে বাংলাদেশে সবজির ছড়াছড়ি। ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, মুলা, শিম, মটরশুঁটি ইত্যাদি অনেক রকমের সবজিতে বাজার ছেয়ে থাকে।

টমেটো: এটি ভিটামিন সি এবং ভিটামিন এ বা বিটা ক্যারোটিনের চমৎকার উৎস। লাইকোপিন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। লাইকোপিন হাড়ের সুস্থতায় সাহায্য করে। টমেটোতে আছে প্রচুর বায়োটিন, ভিটামিন বি৬, ম্যাংগানিজ, ভিটামিন ই ইত্যাদি। এই সবজি হৃদ্‌রোগ প্রতিহত করে, ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমায়, ত্বক ও চুলের সুস্থতা বজায় রাখে। বেশি তাপে টমেটোর ভিটামিন সি এবং বিটা ক্যারেটিন অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই কাঁচা বা সালাদ করে খাওয়া ভালো।

গাজর: গাজর খেলে চোখ ভালো থাকে বলে যে ব্যাখ্যা চালু আছ, তা মিথ্যা নয়। গাজরে প্রচুর বিটা ক্যারোটিন ও ভিটামিন এ আছে, যা দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে। এই সবজিতে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ফলেট, পটাশিয়াম আছে অনেক। পটাশিয়াম রক্তনালি সুস্থ রাখে, ফলেট গর্ভস্থ শিশুর জন্য ভালো। গাজরে ক্যালরির পরিমাণ খুব কম, প্রতি ১০০ গ্রামে ৪১ ক্যালরি থাকে। তাই যারা শরীরের ওজন কমাতে চান, তারা বেশি করে গাজর খেতে পারেন।

ফুলকপি: ফুলকপিতে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ভিটামিন বি২, ভিটামিন বি৬ এবং নানা খনিজ উপাদান আছে। এতে কিছুটা প্রোটিনও আছে, আছে প্রচুর পরিমাণে আঁশ। পরিপাকতন্ত্র ও রক্তসংবহনতন্ত্রের জন্য এটি খুবই উপকারী। হাড়ের সুস্থতায় ফুলকপি সাহায্য করে। তবে বেশি পরিমাণে ফুলকপি অনেক সময় হজমে সমস্যা করতে পারে, পেটে গ্যাস হতে পারে।

শিম: শিমে প্রচুর পরিমাণে আঁশ আছে, যা পরিপাকতন্ত্রের জন্য উপকারী। আছে প্রোটিন, ভিটামিন সি ও জিংক শিমের বিচিও প্রোটিনের চমৎকার উৎস। যাঁরা মাছ-মাংস কম খেতে চান, তাঁরা শিমের বিচির মাধ্যমে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

শীতকালীন খাবার

এটা পিঠা-পুলির মৌসুম, এ সময় আমাদের দেশে গুড়, খেজুরের রস প্রভৃতি পাওয়া যায়। বিয়ে, নেমন্তন্ন, সামাজিক উৎসবও শীতেই বেশি হয়ে থাকে। গরমের হাঁসফাঁস অবস্থা নেই। তেল-চর্বিযুক্ত ভাজা-পোড়া খাবার খেতে খারাপও লাগে না। শহরে আজকাল শীতে কেউ কেউ বার্বিকিউ করেন। এটা মাছ-মাংস ঝলসে খাওয়া একটা পদ্ধতি। শীতে গরম খিচুড়ি, মাংস, পোলাও ইত্যাদিও চলে প্রচুর। এসব খাবার শরীরকে গরম রাখে; খেতে ভালো লাগে বটে, কিন্তু এগুলো উচ্চ ক্যালরিসম্পন্ন-বিষয়টা মনে রাখতে হবে।

এ ছাড়া শীতের দিনে ব্যায়ামের সময়-সুযোগ বা ইচ্ছে কমে যায়। ঠাণ্ডার ভয়ে অনেকে মর্নিং ওয়াক বা সকালে হাঁটাহাঁটি ছেড়ে দেন। তাই শীতে শরীরের ওজন বেড়ে যেতে পারে। তাহলে এই সময় আমরা কী খাব? শীতে আমাদের দেশে নিমন্ত্রণ-উৎসব বেশি হয়, সপ্তাহে দু-একবার ক্যালরিবহুল খাবার খাওয়া তো হয়েই যায়। তাই বাকি ক'টা দিন কম ক্যালরিযুক্ত খাবার খেয়ে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করুন। শীতে রকমারি সবজি ওঠে বাজারে। এসব শাক-সবজির পুষ্টিমান অনেক তাই প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের সবজি মিলিয়ে সবজির স্যুপ করে খেলে শীতও কাটবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গরম স্যুপে লেব দিয়ে বা গরম লেবু-চা পান করলে শীত কাটে, ঠাণ্ডা বা সর্দি-কাশিতেও আরাম হয়। যাদের টনসিল, হাঁপানি, ঠাণ্ডার সমস্যা আছে, তাঁরা হালকা গরম-গরম পানি পান করলে স্বস্তি পাবেন। সবজি রান্না করে না খেয়ে ভাপে সেদ্ধ করে খেলে পুষ্টি যেমন বেশি পাবেন, তেমনি শরীর গরম হবে। পিঠা-পুলি খাওয়ার সময় ডায়াবেটিস ও ওজনাধিক্য রোগীরা সতর্ক থাকবেন। কেননা, চাল ও গুড় দুটোই ওজন ও শর্করা বাড়ায়।

শীতের ফলমূলের গুণ

শীতকালে আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের মতো এত বৈচিত্র্যময় ফলমূল মেলে না। তারপর শীতে বেশ কিছু উপকারী ফলমূল পাওয়া যায়।

কমলা: বিটা ক্যারোটিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে কমলায়। এটি হজমশক্তি বাড়ায়, সর্দি-কাশি সারায়, মানসিক অবসাদ দূর করে। জ্বর ও ফ্লু-এর সময় কমলা খাওয়া ভালো। কোয়ার পাতলা ত্বকে আঁশ আছে বলে কোষ্ঠকাঠিন্যও কমাবে। কমলার রসে প্রচুর ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়াম আছে। রক্তশূন্যতা ও জিভের ঘা সারাতেও কমলা উপকারী।

জলপাই: শীতে প্রচুর জলপাই ওঠে বাজারে। এতে আছে প্রচুর ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, লৌহ ও অসম্পৃক্ত চর্বি। ফলে এটি স্থূলতা কমায়, শরীরে উপকারী চর্বি বাড়ায়। বাতের ব্যথা, হাঁপানি উপশমে জলপাই কার্যকর। ফলের তেল বা অলিভ অয়েল হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী। হৃদ্‌রোগ ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধে এই ভোজ্য অলিভ অয়েল বিশেষ ভূমিকা রাখে।

আমলকী: ভিটামিন সি-তে ভরপুর আমলকী খেলে দাঁত, চুল, ত্বক ভালো থাকে। এটি খাওয়ার রুচি বাড়ায়। এ ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথাব্যথা, অম্ল, রক্তাল্পতা, বমিভাব দূর করতে সাহায্য করে। কমলার তুলনায় আমলকীতে ২০ গুণ বেশি ভিটামিন সি আছে।

বরই: হজমের জন্য এই ফল ভালো। এটি ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ। ফ্লু, হাঁপানি, কোলন ক্যানসার ও বাতের ব্যথা সারাতে বরই বেশ উপকারী।

শীতের ব্যাধি : সতর্কতা

শীতে হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, অ্যালার্জির মতো নানা রোগের প্রকোপ বাড়ে। সেই সঙ্গে পরিবেশে কিছ রোগজীবাণু বাড়ে। তাই এ সময় সংক্রমণের ঝুঁকিও বেশি। তাই সাবধান থাকতে হবে। ফ্লু - বাংলাদেশে বছরজুড়েই ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হতে পারে। কিন্তু শীতে প্রতিবারই এর প্রকোপ বেড়ে যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ সমস্যার জন্য দায়ী ইফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস পরিবেশে বাড়ে। এই ভাইরাস হাঁচি, কাশি ও বাতাসের মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরিণামে জ্বর, কাশি, সর্দি, নাক বন্ধ ইত্যাদি দেখা দেয়। ফ্লু সাধারণত এমনিতেই সেরে যায়। কিন্তু শিশু, বৃদ্ধ, অন্তঃসত্ত্বা এবং কম রোগ প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এটা জটিল রূপ নিতে পারে। তাই এমন ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা নিয়ে নিন। ফ্লু ভ্যাকসিন এখন বাংলাদেশে পাওয়া যায়। ফ্লু হলে প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খান, বিশ্রাম নিন। জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল ও সর্দি-কাশির জন্য অ্যান্টিহিস্টামিনই যথেষ্ট। ফ্লু সারানোর জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নেই।

নিউমোনিয়া: শীতের শুরু থেকেই ফুসফুসের সংক্রমণ বা নিউমোনিয়ার প্রকোপ বাড়তে থাকে। নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া এই নিউমোনিয়া সৃষ্টি করতে পারে। বেশি আক্রান্ত হয় ছোট শিশু, বয়স্ক লোকেরা। এ ছাড়া মেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, যেমন: ডায়াবেটিস, কিডনি শ্বাসতন্ত্র বা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বিশেষ ঝুঁকিতে থাকেন। প্রচণ্ড জ্বর, কাশি, দ্রুত শ্বাস, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি নিউমোনিয়ার লক্ষণ। দ্রুত চিকিৎসা না নিলে জটিলতা হতে পারে। ঝুঁকি রয়েছে এমন ব্যক্তিদের নিউমোনিয়ার টিকা দিয়ে নেয়া ভালো। শিশুদের জ্বর ও কাশির সঙ্গে বুকের পাঁজর ওঠা-নামা করলে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া জরুরি। অ্যান্টিবায়োটিকের ক্রমবর্ধমান অকার্যকারিতার জন্য নিউমোনিয়ায় মৃত্যুর হার বাড়ছে। নিউমোনিয়া দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক সঠিক মাত্রা ও মেয়াদে সেবন করতে হবে। বয়স্কদের নিউমোনিয়া ভ্যাক্সিন নিতে হবে।

ডায়রিয়া: পানিবাহিত রোগ ডায়রিয়া সারা বছরই হতে পারে। তবে রোটা ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া অনেক সময় শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। শিশুরা এতে বেশি আক্রান্ত হয়। এই রোগেও তেমন কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, কেবল পানি ও লবণশূন্যতা থেকে রক্ষা করাটাই জরুরি।

নাক-কান-গলা: শীতে বাড়তে পারে গলনালির প্রদাহ বা ফ্যারিনজাইটিস, সাইনাসের প্রদাহ এবং রাইনাটিস। ঠাণ্ডা হাওয়া, শুষ্কতা, পরিবেশের ধূলাবালি ইত্যাদি এর জন্য দায়ী। ছোটরাই বেশি আক্রান্ত হয়। সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, টনসিল ফুলে যাওয়া, মাথাব্যথা, নাক বন্ধ বা নাক দিয়ে পানি ঝরা ইত্যাদি বিরক্তিকর উপসর্গ দেখা দেয়। এই সমস্যাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাসজনিত এবং নিজে থেকেই সেরে যায়। তবে স্ট্রেপটোকক্কাল সোর থ্রোট হলে অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

নিপাহ ভাইরাস: শীত মৌসুমে কয়েক বছর ধরে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে। এই ভাইরাস বাদুড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। শীতকালে গ্রামে খেজুরের রস খাওয়ার ধুম পড়ে। বাদুড়ের লালা, মূত্র ইত্যাদি দিয়ে এই রস সংক্রমিত হয়ে মানুষে ছড়ায়। নিপাহ ভাইরাসের আক্রমণে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, এনকেফালাইটিস বা মস্তিষ্কের প্রদাহ হতে পারে। খেজুরের রস কাঁচা খাওয়া উচিত নয়।

শীতে ডিপ্রেশন

শীতকালে সবার মধ্যে কিছুটা আড়ষ্ট ভাব, উদ্যমহীনতা ও বিষণ্নতা দেখা দেয়, যা একটি স্বাভাবিক মনোদৈহিক পরিবর্তন। কিন্তু এর কারণে যদি দৈনন্দিন কাজে বিঘ্ন ঘটে, ব্যাক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে বিষয়টিকে হালকাভাবে নেয়ার সুযোগ নেই। শীতপ্রধান দেশে এই শীতকালীন বিষন্নতার প্রকোপ বেশি দেখা যায়। নারীদের এই সমস্যার ঝুঁকি পুরুষদের দ্বিগুণ। যাঁরা দিনের বেশিরভাগ সময় অপর্যাপ্ত আলোয় ঘরের ভেতর কাজ করেন, তাঁদেরও এই সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

লক্ষণগুলো হলো অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ, সকালে বিছানা থেকে উঠতে তীব্র অনীহা, শর্করা ও মিষ্টি জাতীয় খাবারের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়া, ওজন বৃদ্ধি ইত্যাদি। এ ছাড়া সব বিষয়ে অনাগ্রহ, একাকীত্ব বোধ, বন্ধু-বান্ধব ও সামাজিকতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়া বা গুটিয়ে থাকা, নেতিবাচক চিন্তা, অপরাধবোধে ভোগা ইত্যাদিও হতে পারে। শীতকালীন বিষণ্নতা রোধে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট সূর্যের আলোয় হাঁটাহাঁটি করতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করুন, নিজেকে নানা কাজে ব্যস্ত রাখুন; বন্ধ সান্নিধ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে কেউ বিষণ্নতায় আক্রান্ত হলে তাকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধও সেবন করতে হতে পারে। পাশাপাশি কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি নিতে হতে পারে। শীতকালীন বিষণ্নতার কারণে কর্মোদ্যম কমে যাওয়া, পিছিয়ে পড়া এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতাও বাড়তে পারে, তাই একে অবহেলা করা উচিত নয়।

গ্রীষ্মে পানীয়

গরমে ও রোদে বাইরে বেরোলে, এমনকি ঘরেও পরিশ্রমের কাজ করলে প্রচুর ঘাম হয়। এর ফলে শরীর পানি ও লবণ হারায়। এ রকম মৌসুমে সহজেই পানিশূন্যতা ও লবণশূন্যতা হতে পারে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের ঝুঁকি একট বেশি। তাই তাদের ক্ষেত্রে বারবার লক্ষ রাখা উচিত, তারা যথেষ্ট পানি বা তরল খাচ্ছেন কি না। এই গরমে বারবার পানি পান করার সঙ্গে পরিবারের সবাই মিলে এমন সব পানীয় গ্রহণ করতে পারেন, যা পানি ও লবণের অভাব পূরণ করে সহজেই। প্রশান্তি এনে দেয় ও শরীরের তাপমাত্রা কমায়।

লেবু-পানি: লেবুর রস ও সামান্য লবণমিশ্রিত এক গ্লাস পানি এই গরমে কেবল প্রশান্তিই দেবে না, লবণশূন্যতাও পূরণ করবে। যাদের ডায়াবেটিস নেই, তারা চিনি দিয়ে শরবত করেও খেতে পারেন। লেবুতে আছে পর্যাপ্ত পটাশিয়াম ও ভিটামিন সি, লবণে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং চিনিতে সহজ শর্করা, যা দ্রুত শক্তি জোগায়। এ ছাড়া লেবুর রস অন্ত্রে লৌহ শোষণে সাহায্য করে, খাবারে রুচি বাড়ায়।

ডাবের পানি: গরমে এই জনপ্রিয় পানীয় আমরা প্রতিদিনই পান করতে পারি। ডাবের পানিতে আছে বেশ ভালো পরিমাণে পটাশিয়াম, ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়াম। ক্যালরিও কম নয়। তাই খুব গরমে পরিশ্রান্ত অবস্থায় এটি দ্রুত চাঙা হতে সাহায্য করে। গরমে ডায়রিয়া হলে ডাবের পানি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। শরীর ঠাণ্ডাও রাখে।

কাঁচা আমের শরবত: কাঁচা আমের সঙ্গে লবণ-চিনি-পুদিনা পাতা সামান্য কাঁচা মরিচ দিয়ে ব্লেন্ড করে শরবত করে খেতে পারেন। এতে পুষ্টি ও ভিটামিন ও খনিজের সঙ্গে পানির অভাবও পূরণ হবে।

পুদিনা পাতার শরবত: লেবুর রসের সঙ্গে বা শুধু পানির সঙ্গে পুদিনা পাতা ব্লেন্ড করে এই শরবত তৈরি করতে পারেন। অথবা লেব পানি বা শরবতের মধ্যে কয়েকটা তাজা কাঁচা পুদিনা পাতা ছেড়ে দিয়ে মিশিয়ে দিতে পারেন। এই পানীয় গরমে প্রশান্তি ও আরাম দেবে। এছাড়া পুদিনা পাতায় পটাশিয়াম আছে। এটি বমি ভাব দূর করে দেহ-মন তাজা করে। গরমে পানীয় বেছে নেয়ার সময় যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেন তা হলো, অনেক বরফ মিশিয়ে বা খুব ঠাণ্ডা পানীয় পান করবেন না। স্বাভাবিক তাপমাত্রার বা ঠাণ্ডার সঙ্গে স্বাভাবিক পানি মিশিয়ে পান করুন। এতে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি কমবে। ডায়াবেটিস ও স্থূল রোগীরা চিনি মেশাবেন না। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা লবণ একট কম দেবেন। আর কিডনি রোগীদের জন্য অতিরিক্ত পটাশিয়াম ক্ষতিকর হতে পারে।

গ্রীষ্মকালীন ফল

১. গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে নানা জাতের সুমিষ্ট রসালো ফল পাওয়া যায় এসব মৌসুমি ফল যেমন উপাদেয়, তেমনি উপকারী।

আম: এটি ক্যারোটিন-সমৃদ্ধ সহজপাচ্য সুমিষ্ট ফল। আমের আকার ও ধরনের ওপর এর ক্যালরির পরিমাণ নির্ভর করে। একটা মাঝারি আকৃতির আমে ৫০ থেকে ১০০ ক্যালরি আছে। পাকা আমে ৬০ শতাংশ বেশি ক্যারোটিন থাকে। কাঁচা আমে আছে পিকটিন। আম কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়। এতে আছে প্রতি ১০০ গ্রামে ৪০০ ইউনিট ভিটামিন এ, প্রায় ১৫ গ্রাম শর্করা, ১৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি।

জাম: এই ফলে প্রচুর আয়রন আছে। রক্তশূন্যতার রোগীদের তাই জাম খেতে বলা হয়। এতে শর্করা খুব কম। আয়রন ৪.৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৬০ গ্রাম।

কাঁঠাল: এই ফল বেশ রসালো ও সুস্বাদু। তবে এটি সহজপাচ্য নয় ও পেটে গ্যাস সৃষ্টি করতে পারে। ক্যারোটিনসমৃদ্ধ এই ফল রুচি ও শক্তিবর্ধক। ১০০ গ্রাম কাঁঠালে ৪০ গ্রাম শর্করা, ২০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২১ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি ও ৯৩ ক্যালরি শক্তি আছে।

লিচু: এই ফলে জলীয় অংশ অনেক। এটা শরীরের পানির চাহিদা ও পিপাসা মেটায়। ১০০ গ্রাম লিচুতে ১৩.৬ গ্রাম। শর্করা আছে। ক্যালসিয়াম আছে ১০ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ৩১ মিলিগ্রাম।

গরমে অসুস্থতা

ধরুন রিকশায় করে ভরদুপুরে কোথাও যাচ্ছেন। ভ্যাপসা গরম, এক ফোঁটা বাতাস নেই, আর্দ্রতা অসহনীয়। আপনার রিকশাচালক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে গেলেন রাস্তায়। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে লাগল, একেবারে অচেতন। এ রকম আবহাওয়ায় অনেকক্ষণ প্রচণ্ড রোদে রিকশা চালাতে গিয়ে খুব সম্ভবত আপনার রিকশাওয়ালার হিটস্ট্রোক হয়ে থাকতে পারে। এমন মুহূর্তে আপনার কী করা উচিত? লোকজনের সহায়তায় মানুষটাকে ধরাধরি করে কাছে কোথাও একট শীতল জায়গায় নিন, গাছের নিচে বা কোনো দোকানের ভেতরে ফ্যানের বাতাসের নিচে। জামাকাপড় খুলে দিন বা ঢিলে করে দিন। ঠাণ্ডা পানিতে বা বরফে ভেজা কাপড় দিয়ে বারবার গা মুছে দিন বা শরীরে পানি স্প্রে করুন এবং শিগগির হাসপাতলে স্থানান্তর করুন। আবার ভাবুন, সারাদিন নানা কাজে রোদের মধ্যেই ঘুরেছেন।

আচমকা আপনার পেটে ও পা দুটোয় যেন টান লাগল বা কেউ খামচে ধরল। এই সমস্যার নাম হিট ক্র্যাম্প। শরীরে পানি ও লবণের অভাবে এমনটা ঘটে। এমন অবস্থায় দ্রুত গরম ও রোদ থেকে সরে যান। তুলামূলক ঠাণ্ডা জায়গায় বসে পড়ুন। প্রচুর পানি ও লবণসমৃদ্ধ তরল (যেমন: ডাবের পানি, লেবু-লবণের শরবত) পান করুন। পরিশ্রম থেকে বিরত তাকুন। খুব ধীরে মাংসপেশি নাড়াচাড়া এবং পায়ের হালকা ব্যায়াম করুন। সারা দিন রোদে গরমে ঘুরে দেখলেন সারা শরীরের উন্মুক্ত ত্বক লালচে হয়ে গেছে বা পুড়ে গেছে। লাল ফুসকড়ি বা র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। কখনো চুলকায়। ব্যাপারটার নাম হিট র‍্যাশ। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ত্বকে ঠাণ্ডা বরফ বা ভেজা কাপড় লাগান। তীব্র গরমে যে কেউ এমন আকস্মিক জটিলতায় পড়তে পারেন, বিশেষত শিশু, বৃদ্ধ, স্থুল ব্যক্তি, কারখানার শ্রমিক বা কৃষক, স্নায়ুরোগীরা বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। সুস্থতার জন্য তাঁরা প্রচুর পরিমাণে পানি ও তরল পান করবেন। ডাবের পানি ও ওরস্যালাইন বেশ কাজে দেয়। হালকা রঙের সুতি জামাকাপড় পরবেন। বাইরে বেরোলে ছাতা, সানগ্লাস বা হ্যাট ব্যবহার করুন। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে আগে শরীরটা বাতাসে জুড়িয়ে নিন, তারপর গাসল করবেন। বেশি রোদে ও গরমে বাইরে ব্যায়াম বা খেলাধুলা করবেন না। প্রচণ্ড গরমে বাসের মতো বদ্ধ পরিবেশে হাঁসফাঁস করলে নেমে পড়ুন।

গ্রিন টি

আমরা প্রতিদিন যে চা পান করি, সেটা ব্ল্যাক টি। কখনো দুধ-চিনি মিশিয়ে, কখনো বা চিনি ছাড়াই চা পান করার প্রচলন রয়েছে। তবে আমাদের দেশে গ্রিন বা সবুজ চা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। চা-গাছের সতেজ সবুজ পাতা রোদে শুকিয়ে তাওয়ায় সেঁকে গ্রিন টি প্রস্তুত করা হয়। এর রং হালকা হলদে সবুজ। এই চায়ে পলিফেনল ও ফ্ল্যাভোনেয়েড নামের দুটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে, যা চা তৈরির পরও অক্ষুণ্ন থাকে। গ্রিন টি আমাদের শরীরকে সতেজ ও উৎফুল্ল রাখতে সাহায্য করে। এটি হৃদরোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকিও কমায়। এই চা আমাদের শরীরের ওজন ও রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। চীনের একদল গবেষক দেখিয়েছেন যে সবুজ চায়ে বিদ্যমান রাসায়নিক পদার্থ মানুষের স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটায় এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়ের স্মৃতি ও তথ্য সংরক্ষণে মস্তিষ্ককে সাহায্য করে। যুক্তরাজ্যে এক গবেষণায় দেখা যায়, নিয়মিত গ্রিন টি সেবন করলে দাঁতের ক্ষয়রোগের ঝুঁকি কমে। তবে ওজন কমাতে হলে খাবারে ক্যালরির পরিমাণ কমাতে হবে অথবা ব্যায়ামের মাধ্যমে ক্যালরি ক্ষয় বাড়াতে হবে। শুধ গ্রিন টি পান করে ওজন কমানো সম্ভব নয়।

ক্লান্তি অবসাদ

প্রতিদিনের কর্মব্যস্ত জীবনে কেউ হাঁপিয়ে উঠেছেন পড়াশোনায়; ক্যারিয়ারের পাশাপাশি বাড়িতেও সময় দিতে হয়। সব মিলিয়ে একধরনের ক্লান্তি বা অবসন্নতা আসতেই পারে। কিছ অভ্যাসের চর্চা করলে এই সমস্যা এড়িয়ে প্রাণবন্ত জীবন যাপন সম্ভব।

খাদ্যাভ্যাস : সকালের নাশতায় আঁশযুক্ত খাবার এবং প্রোটিন রাখুন। সম্ভব হলে তাজা ফলমূলও। সকালের নাশতা আপনার মেটাবলিজম শুরু করতে সাহায্য করে। দুপুরে খাবারের পরিমাণ কম রাখা ভালো। তবে কোনো বেলাতেই না খেয়ে থাকবেন না। প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। রোজকার খাদ্যতালিকায় টাটকা সবজি এবং দেশীয় ফলমূল রাখুন।

কাজের রুটিন : সারা দিনের কাজগুলোকে সময় অনুযায়ী ভাগ করে নিন। কাজ ভাগ করে নিলে কাজের চাপ কম অনুভব করবেন। অফিসে কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে ছোট বিরতি নিন একট হাঁটাহাঁটি করুন, হাত-পা টান টান করুন। সহকর্মীর সঙ্গে গল্প করুন। সম্ভব হলে ৩০-২০ মিনিটের জন্য বিশ্রাম নিন। হালকা কোনো খাবার খেয়ে নিতে পারেন। প্রতিদিন ব্যায়ামের জন্য আলাদা একটা সময় রাখুন। এতে কর্মক্ষমতা ও সুস্থতা বাড়বে। কাজকে উপভোগ করুন। একেবারে হাঁপিয়ে উঠলে কিছুদিনের ছুটি নিতে চেষ্টা করুন, পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে দূরে কোথাও বা প্রকৃতির কাছাকাছি যেতে পারেন।

চিকিৎসা : ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের সমস্যা ইত্যাদি কারণেও ক্লান্তি আসে। বছরে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন। শক্তি বাড়ানোর জন্য কোনো ওষুধ সেবন করবেন না, হিতে বিপরীত হতে পারে। ক্রমাগত অবসন্নতা বাড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ইজতেমায় স্বাস্থ্য বিধি

প্রতিবছর এই জামায়েতে দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষ অংশ নেন। ধূলাবালি, অপর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পয়োনিষ্কাশন, শীতে খোলা বা হালকা আচ্ছাদিত মাঠে অবস্থান, শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে কারও কারও নানা রকমের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক বয়স্ক মানুষ ইজতেমায় অংশ নেন। তাঁদের অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি বেশি। তাই আগে থেকেই বাড়তি সচেতনতা জরুরি। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানিসহ বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই ইজতেমায় যাওয়ার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। প্রয়োজনীয় ইনসুলিন, ওষুধ, ইনহেলার সঙ্গে রাখতে ভুলবেন না। এসব নিয়মিত ওষুধ যেমন রক্তচাপের ওষুধ, ইনহেলার বা ইনসুলিন) বন্ধ করা যাবে না। ডায়াবেটিস রোগীর ইনসুলিন বা ওষুধ গ্রহণের পর নির্দিষ্ট সময়ের খাবার খাবেন, নইলে রক্তের শর্করা মাত্রা কমে যেতে পারে। এ সমস্যার নাম হাইপোগ্লাইসেমিয়া। এটা প্রতিরোধের জন্য সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার (যেমন বিস্কুট, চকলেট বা গ্লুকোজ) রাখতে পারেন। ঠাণ্ডা, ধূলোবালির কারণে এই সময়ে সর্দিজ্বর, কাশি, গলাব্যথা, সাইনোসোইটিসের সমস্যা বেশি দেখা যায়। হাঁচি-সর্দির জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন (লোরাটিডিন, ফেক্সেফেনাডিন, সেটিরিজিন), ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল সেবন করতে পারেন। প্রতিরোধের জন্য মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। যেখানে-সেখানে কফ বা থুতু ফেলবেন না। বিশুদ্ধ পানির স্বল্পতার কারণে ডায়ারিয়ার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। ডায়রিয়া হলে ওরস্যালাইনের পাশাপাশি ডাবের পানি, বিশুদ্ধ পানি ও তরল খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত ঝাল বা তেল-মসলাযুক্ত খাবার পেটে গ্যাসের সমস্যা তৈরি করে। তাই এগুলো এড়িয়ে সহজপাচ্য খাবার গ্রহণ করুন। এ সময় প্রচুর হাঁটতে হয় বলে পা সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে, এমন নরম ও টেকসই জুতা পরা ভালো।

সতর্কতা : হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় মুখে রুমাল বা কাপড় ব্যবহার করুন, টয়লেট টিস্যু বা ঢিলা ব্যবহারের পর নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন। নির্ধারিত টয়লেট ব্যবহার করুন। খাওয়ার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পরে সাবান দিয়ে হাত ধোবেন। অন্যের ব্যবহৃত চিরুনি, তোয়ালে, নেইল কাটার, কাঁচি, শেভিং কিটস প্রভৃতি ব্যবহার করবেন না। প্রয়োজনীয় ওষুধ, ওরস্যালাইন, ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম, চশমা সঙ্গে নিয়ে যাবেন। অসুস্থ হলে কাছাকাছি মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হঠাৎ মুখ বেঁকে গেলে

একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে হঠাৎ কেউ লক্ষ্য করেন তার মুখ যেন একদিকে একটু বেঁকে গেছে। মনে হয় যেন পানি বা খাবার গিলতে গিয়ে মুখের একদিকে আটকে আছে বা চিবোতে কষ্ট হচ্ছে। এমনও হতে পারে যে এখন চোখের পাতা বন্ধ হচ্ছে না সহজে। ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, এটি একটি স্নায়ুগত সমস্যা। এর নাম বেলস পলসি। আমাদের সপ্তম ক্রেনিয়াল নার্ভ বা ফেসিয়াল নার্ভে সমস্যার কারণে এটা হতে পারে। কোনো কারণে প্রদাহ হলে স্নায়ুটি ফুলে যায় ও চাপ লেগে মুখমণ্ডলের পেশি, জিভের স্বাদ বা চোখের পাতা নড়াচড়ায় সমস্যা দেখা দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ রোগের পেছনের কারণটি জানা যায় না। জ্বর, ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি-কাশি, কান পাকা, ভাইরাস সংক্রমণের জন্য প্রদাহ হতে পারে। এ ছাড়া মাথায় আঘাত, টিউমার, স্ট্রোক থেকে স্নায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ডায়াবেটিসের রোগীদের ঝুঁকি বেশি। এই রোগ একের কাছে থেকে অন্যে সংক্রমিত হয় না। হাঠৎ করেই মুখ বেঁকে যায়, খাবার, পানি, লালা গড়িয়ে পড়তে পারে। চোখের পানি শুকিয়ে যায় ও খরখর করে। অনেক সময় একদিকের কানে বেশি শোনা যায়, স্বাদ পেতে সমস্যা হয়। প্রথম ৪৮ ঘণ্টা দুর্বলতা বেশি থাকে। ৮৫ শতাংশ রোগী তিন সপ্তাহের মধ্যে সেরে যান। বেলস পলসিতে কিছ নিয়ম ও ব্যায়ামই মূল চিকিৎসা। চোখের যত্নে ড্রপ দিতে হবে, ঘুমানোর সময় মলম দিয়ে ব্যান্ডেজ করে রাখতে হবে। প্রতিবার খাওয়ার পর আঙুল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে হবে ও মাউথওয়াশ ব্যবহার করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় এন্টিভাইরাল ঔষধ দিতে হবে। পেশি ঠিক করতে ব্যায়াম করতে হবে। বাঁশিতে ফুঁ দেওয়া, চুইংগাম চিবানোর মতো ব্যায়াম কার্যকর।

জ্বর

জ্বর কোনো রোগ নয়, রোগের লক্ষণ। একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এরচেয়ে বাড়লেই তাকে জ্বর বলে। মানবদেহের তাপমাত্রা ৯৯ থেকে ১০১ ডিগ্রী ফারেনহাটের মধ্যে থাকলে সেটা অল্প জ্বর। বিভিন্ন কারণে অল্প জ্বর দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হতে পারে। যেমন: যক্ষ্মা, লসিকা, গ্রন্থির টিউমার, কালাজ্বর, এইচআইভি সংক্রমণ, থাইরয়েড যকৃৎ বা ফুসফুসের ক্যানসার হলে অল্প জ্বর বেশ কিছুদিন থাকতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে এমন জ্বর থাকলে তার বিস্তারিত ইতিহাস জানা জরুরি। চিকিৎসককে এটা জানালে কারণ নির্ণয় সহজ হবে। লক্ষ্য করুন, জ্বরটা ঠিক কখন আসে, কীভাবে আসে, কাঁপুনি হয় কি না, ঘাম দিয়ে ছাড়ে কি না, অন্য কোনো উপসর্গ আছে কি না ইত্যাদি।

(১) বিকেলে বা সন্ধ্যার দিকে অল্প জ্বর, ঘাম দিয়ে ছেড়ে যাওয়া, সঙ্গে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি, ওজন হ্রাস, অরুচি থাকলে যক্ষ্মা হয়েছে বলে সন্দেহ করা যায়।

(২) লিমফোমা হলেও দীর্ঘদিন জ্বর থাকে, ঘাম হয়, শরীরের বিভিন্ন অংশে লসিকা গ্রন্থি ফুলে যায়।

(৩) দীর্ঘদিনের জ্বরের পাশাপাশি গিরায় ব্যথা, সকালে ব্যথা বৃদ্ধি, মুখে ঘা, ত্বকে লাল দাগ এসএলই বা সন্ধিতে সমস্যার লক্ষণ। জ্বর আসছে মনে হলো থার্মোমিটারে মাপুন ও লিখে রাখুন। জ্বরের লক্ষণ ও ইতিহাস খেয়াল করুন। প্যারাসিটামল খেয়ে জ্বর দাবিয়ে রাখবেন না। কারণ নিণয় করা জরুরি, বিশেষত যদি তা দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়।

মাছ-মাংস-ডিম ছাড়া প্রোটিন

মাংস খাওয়ার পরিমাণ আজকাল অনেকেই কমিয়ে দিচ্ছেন। শরীরের ওজন কমাতে এবং ক্ষতিকর চর্বি এড়াতে গরু-খাসির মাংস বা লাল মাংস কম খাওয়াই ভালো। প্রোটিনের উৎস হিসেবে মাছ উত্তম। কিন্তু কেবল মাছ দিয়ে কি প্রতিদিনের প্রোটিনের চাহিদা মেটে? তা ছাড়া প্রতিদিন মাছ খেতে ভালো না-ও লাগতে পারে। পুষ্টিবিদেরা বলেন, প্রতিদিনের ক্যালরি চাহিদার অন্তত ২০ থেকে ৩০ শতাংশ প্রোটিন থেকে পূরণ করা উচিত। খাবারের এই উপাদান মানুষের মাংসপেশি গঠনে সাহায্য করে। শিশুদের শারীরিক বিকাশেও সাহায্য করে। মাংস-ডিম-দুধ বাদে অন্য উৎস থেকেও প্রোটিন পাওয়া যায়। এগুলো তো প্রাণিজ আমিষ। পাশাপাশি উদ্ভিজ্জ আমিষ খেতে হবে। যারা মাছ-মাংস কম খান বা নিরামিষাশী, তাদের জন্য প্রোটিনের বিকল্প উৎসগুলো রয়েছে। ডাল ও বীজ জাতীয় খাবারে প্রোটিন থাকে। আধা কাপ রান্না ছোলায় পাওয়া যাবে ৭ গ্রাম প্রোটিন, আধা কাপ মসুর ডালে ৯ গ্রাম। দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করবে। এক কাপ দুধে পাবেন প্রায় ৮ গ্রাম প্রোটিন। এক কাপ টক দইয়ে আরও বেশি, ১৩ গ্রামের মত। এক আউন্স পনিরে পাবেন ৭ গ্রাম প্রোটিন। তাই যারা মাংস কম খেতে চান তাঁরা প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় দুধ ও দুধের তৈরি খাবার রাখবেন। বাদামও প্রোটিনের উৎস হিসেবে খুব ভালো। ২০ টা আলমন্ড বা কাটবাদামে পাবেন প্রায় ৪ গ্রাম এবং একই পরিমাণ কাজুবাদাম থেকে ৬ গ্রাম প্রোটিন। এই খাবারে আরও পাবেন উপকারী চর্বি (ওমেগা ফ্যাট) এবং আঁশ। তবে বাদাম লবণ ছাড়া খাওয়া ভালো।

ঘাড় ব্যথা

যাঁরা সারা দিন টেবিলে বা কম্পিউটারে কাজ করেন, ঘাড় ও হাতব্যথা তাঁদের একটি পরিচিত সমস্যা। অফিস থেকে ফিরে ঘাড়, কাঁধ ব্যথায় অল্পবিস্তর অনেকেই ভুগেন। এর বেশির ভাগটাই কাজের সময় ভুল দেহভঙ্গির জন্য। সবারই যে ঘাড়ের মেরুদণ্ডে সমস্যা আছে তা নয়। আবার সমস্যা থাকলেও এভাবে কাজ করার কারণে সমস্যা বেড়ে যায়। তাই জেনে নিন ঘাড়ব্যথা রোধে কী করবেন? যারা ঘাড়ব্যথার সমস্যায় ভুগছেন, তাদের সেলাই করা, টিউবওয়েল চাপা, পানির পাম্প চাল করা, বালতি বা কলসি বহন করা এবং নিচু হয়ে বসে কাপড় ধোয়ার মতো কাজ এড়িয়ে চলাই ভালো। মাথায়, ঘাড়ে বা হাতে বাড়তি ওজন বহন না করাই উচিত হবে। নিচ হয়ে বঁটিতে কাটাকাটি, বাটনা করা কিংবা কুলা দিয়ে ঝাড়ার মতো কাজ সমস্যা বাড়াবে। এসব কাজ থেকে সাময়িক বিরতি নিন। পড়ার টেবিল বুকসমান উচ্চতায় হতে হবে। কম্পিউটার, টেলিভিশন, অসমান রাস্তায় চলাচল ও ঝাঁকুনি ব্যথা বাড়বে। গাড়ি বা বাসের সামনের সিট আপনার জন্য ভালো। গাড়ি, মোটারসাইকেল বা বাইসাইকেল চালানো উচিত নয় এ সময়। ঘাড়ের বেল্ট বা সারভাইক্যাল কলার পরলে আরাম পাবেন। বিশেষ করে ভ্রমণের সময় এটি গলায় পড়ুন। তবে শোয়ার সময় পরা যাবে না। ব্যথা বেশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কিছু কিছু ব্যায়াম নিয়মিত করতে পারলেও উপকার পাবেন।

(৪৭)ঐঁঢ়বৎঁৎরপবসরধ (রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া) সাধারণত তখন হয় যখন ইউরিক অ্যাসিডের উৎপাদন বেড়ে যায় অথবা শরীর থেকে নিঃসরণ কমে যায়।

রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেশি?

Hyperuricemia (রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া) সাধারণত তখন হয় যখন ইউরিক অ্যাসিডের উৎপাদন বেড়ে যায় অথবা শরীর থেকে নিঃসরণ কমে যায়।

• Hyperuricemia এর কারণসমূহ

১. ইউরিক অ্যাসিড উৎপাদন বৃদ্ধি

- পুরিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি খাওয়া (লাল মাংস, সামুদ্রিক মাছ, অর্গান মিট)
- সেল টার্নওভার বেশি হওয়া
- লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা
- ক্যান্সারের কেমোথেরাপি → Tumor lysis syndrome
- এনজাইমের সমস্যা → Lesch-Nyhan syndrome, HGPRT deficiency

২. ইউরিক অ্যাসিড নিঃসরণ কমে যাওয়া

- ক্রনিক কিডনি ডিজিজ (CKD)
- ডিউরেটিকস (Thiazide, Loop)
- লেড টক্সিসিটি (Saturnine gout)
- হাইপোথাইরয়েডিজম, হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম

৩. মিশ্র কারণ

- অ্যালকোহল (ল্যাকটিক অ্যাসিড বেড়ে ইউরিক অ্যাসিড নিঃসরণ বাধা দেয়)
- মেটাবলিক সিন্ড্রোম (স্থূলতা, HTN, Dyslipidemia, Insulin resistance)

• Hyperuricemia এর চিকিৎসা

সাধারণ ব্যবস্থাপনা

- ওজন নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম
- অ্যালকোহল, পুরিন সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলা
- পানি বেশি খাওয়া

ওষুধ

১. Acute gout attack

- NSAIDs (CKD হলে এড়িয়ে চলতে হবে)
- Colchicine
- Steroid

2. Chronic hyperuricemia (Gout prevention)

- Xanthine oxidase inhibitor → Allopurinol, Febuxostat
- Uricosuric agent → Probenecid (CKD তে কাজ করে না)
- Pegloticase (IV enzyme therapy, refractory case)

• CKD তে Hyperuricemia এর চিকিৎসা

• CKD তে বিশেষ সতর্কতা দরকার কারণ কিডনি দিয়ে ইউরিক অ্যাসিড বের হয়।

- NSAIDs এড়িয়ে চলতে হবে (কিডনি আরও খারাপ করে)।
- Allopurinol দেওয়া যায়, তবে ডোজ কিডনি ফাংশন অনুযায়ী adjust করতে হবে
- eGFR <30 → কম ডোজ (যেমন 50-100 mg/day)
- Febuxostat → CKD তে relatively safe (mainly liver দিয়ে metabolism হয়), তবে CV risk আছে।
- Colchicine acute attack এ ব্যবহার করা যায়, তবে CKD তে ডোজ কমাতে হয়।
- Dialysis এ ইউরিক অ্যাসিড অনেক কমে যায়, তাই অনেকে ওষুধ ছাড়াই নিয়ন্ত্রণে থাকে।

• সংক্ষেপে:

CKD রোগীর hyperuricemia হলে life-style পরিবর্তন, NSAIDs এড়িয়ে, low dose Allopurinol বা Febuxostat ব্যবহার করা হয়, আর acute gout attack হলে Colchicine বা Steroid ব্যবহার করা নিরাপদ।

আসলে সব hyperuricemia চিকিৎসা করতে হয় না।

- কেন সব Hyperuricemia চিকিৎসা করতে হয় না?
  - অনেক সময় রোগীর কোনো উপসর্গ থাকে না (asymptomatic hyperuricemia)।
  - শুধু রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা একটু বেশি হওয়া মানেই যে রোগী গাউট, স্টোন বা কিডনি সমস্যা পাবেন – তা নয়।
  - ওষুধেরও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে (যেমন Allopurinol hypersensitivity, Febuxostat এ হৃদরোগের ঝুঁকি)। তাই অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা ক্ষতির কারণ হতে পারে।

- কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসা দরকার হয় না?
  - Asymptomatic hyperuricemia (কোনো গাউট আক্রমণ হয়নি, স্টোন হয়নি, CKD জটিলতা নেই)
  - কেবল মাত্র ল্যাব রিপোর্টে ইউরিক অ্যাসিড বাড়তি পেলেই ওষুধ শুরু করার দরকার নেই
  - শুধু ডায়েট ও লাইফস্টাইল পরিবর্তন যথেষ্ট

- কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসা দেওয়া উচিত?
  - গাউট (Gouty arthritis) এর আক্রমণ হয়েছে
  - Tophi (ত্বকের নিচে ইউরিক অ্যাসিড জমা) পাওয়া গেছে
  - ইউরিক অ্যাসিড স্টোন হয়েছে
  - Recurrent attack
  - CKD রোগীর ইউরিক অ্যাসিড অনেক বেশি এবং জটিলতা হচ্ছে
  - কেমোথেরাপি / Tumor lysis syndrome এর সময় প্রতিরোধমূলকভাবে

- Acute attack শেষ হলে (প্রায় ২ সপ্তাহ পর)

- Urate lowering therapy (ULT) শুরু করা যায়
  - Allopurinol (ডোজ renal function অনুযায়ী)
  - Febuxostat (CKD তে relatively safe)

- ULT শুরু করার নিয়ম
    - প্রথম ৩-৬ মাস low dose Colchicine (0.5 mg/day) অথবা NSAID (low dose) দিতে হবে → এটা প্রফাইল্যাক্সিস, যাতে নতুন attack না হয়।

- Lifestyle Modification (সবসময় দরকার)
    - পানি বেশি খাওয়া
    - পুরিন সমৃদ্ধ খাবার কমানো (লাল মাংস, সামুদ্রিক মাছ, অর্গান মিট)
    - অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা
    - ওজন নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম

- সংক্ষেপে
    - Acute attack → শুধুই Pain control (NSAID, Colchicine, Steroid)
    - Attack শেষে ২ সপ্তাহ পর → Allopurinol/Febuxostat শুরু
    - ULT শুরু করলে → প্রথম ৩-৬ মাস Low dose Colchicine/NSAID প্রফাইল্যাক্সিস

- সারসংক্ষেপ
    - Asymptomatic hyperuricemia = ওষুধ নয়, শুধু lifestyle advice
    - Symptomatic hyperuricemia (Gout, Tophi, Stone, CKD complication) = ওষুধ + diet

- রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের স্বাভাবিক মাত্রা

(ল্যাবভেদে কিছুটা পার্থক্য হতে পারে)

- পুরুষ : 3.4-7.0 mg/dl
- মহিলা : 2.4-6.0 mg/dl
- শিশু: সাধারণত কম, প্রায় 2-5.5 mg/dl

- কখন চিকিৎসা দরকার?
- শুধু ইউরিক অ্যাসিড বাড়লেই চিকিৎসা নয় – লক্ষণ ও জটিলতার উপর নির্ভর করে।

১. চিকিৎসা দরকার হয় না

- Asymptomatic (শুধু ল্যাব রিপোর্টে বেড়েছে, কিন্তু গাউট, ব্যথা বা স্টোন নেই)।
- যেমন: পুরুষে 7.5 mg/dl বা মহিলায় 6.5 mg/dl হলে, কিন্তু রোগী একেবারেই সুস্থ – ওষুধ দরকার নেই, শুধু জীবনধারা পরিবর্তন (diet, পানি, ব্যায়াম)।

২. চিকিৎসা প্রয়োজন হয় যদি

- ইউরিক অ্যাসিড ≥ 9-10 mg/dl দীর্ঘসময় থাকে (যদিও উপসর্গ নেই, তবু ভবিষ্যতে ঝুঁকি বেশি)।
- গাউটের আক্রমণ হয়েছে (Acute arthritis)।
- Tophi (ত্বকের নিচে গাঁট হয়ে জমা)।
- Uric acid kidney stone হয়েছে।
- Recurrent gout attack (বারবার ব্যথা হওয়া)।
- CKD রোগী যেখানে ইউরিক অ্যাসিড খুব বেশি এবং জটিলতা বাড়াচ্ছে।
- কেমোথেরাপি / tumor lysis syndrome প্রতিরোধে।

- সারসংক্ষেপ
  - স্বাভাবিক:
  - পুরুষ: 3.4-7.0 mg/dl
  - মহিলা: 2.4-6.0 mg/dl
  - ৬.০< ,(♂) ৭.০ (♀) হলে Hyperuricemia বলা হয়।
  - > 9-10 mg/dl বা উপসর্গ থাকলে চিকিৎসা শুরু করা উচিত।

ইউরিক অ্যাসিড মাত্রা (mg/dl) অবস্থা কী করতে হবে

পুরুষ: 3.4-7.0 মহিলা: 2.4-6.0 স্বাভাবিক কোনো চিকিৎসা লাগবে না

৭-৯ (লক্ষণ নেই) Asymptomatic hyperuricemia সাধারণত ওষুধ নয়, শুধু লাইফস্টাইল পরিবর্তন (ডায়েট, পানি, ব্যায়াম, অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা)

>৯-১০ (যদিও উপসর্গ নেই) High risk hyperuricemia ভবিষ্যতে জটিলতার ঝুঁকি বেশি → বিবেচনা করে চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে

যে কোনো মাত্রা + উপসর্গ - Gout attack- Tophi- Uric acid kidney stone- Recurrent gout- CKD তে সমস্যা- Tumor lysis syndrome অবশ্যই চিকিৎসা দরকার (Allopurinol, Febuxostat, lifestyle changes)

- মূল কথা:
    - শুধু ল্যাবে ইউরিক অ্যাসিড বেড়েছে = সাধারণত চিকিৎসা নয়
    - উপসর্গ বা জটিলতা থাকলে = চিকিৎসা অবশ্যই

রক্তের ইউরিক অ্যাসিডের তিন ভাগের এক ভাগ আসে খাবার থেকে, দুই ভাগ দেহের পিউরিন নামের পদার্থ ভেঙ্গে তৈরি হয়। যদি কোনো কারণে এই ইউরিক অ্যাসিড তৈরির প্রক্রিয়ায় গোলমাল হয় বা কিডনি দিয়ে কম বের হয়, রক্তে এর মাত্রা বেড়ে যায়।

দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের ক্ষেত্রে বাড়তি ইউরিক অ্যাসিড শরীরের কোনো ক্ষতি করে না। তাই দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কখনো বাড়তি ইউরিক অ্যাসিড ক্রিষ্টাল তৈরি করে গিরায় প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। তখন ওই গিরায় তীব্র ব্যথা করে, লাল হয়ে ফুলে যায়। একে তখন গাউট বা গেঁটে বাত বলে। এটা কিডনিতে পাথরও তৈরি করতে পারে। শুরুতে গাউটে একটি মাত্র গিরা (বিশেষ করে, পায়ের বুড়ো আঙুল) আক্রান্ত হয়।

অতিরিক্ত পিউরিনযক্ত খাবার, যেমন লাল মাংস, কলিজা, লাল মদ, সামুদ্রিক মাছ কম খেতে হবে।

ওষুধ কখন : উপসর্গ না থাকলে কেবল বাড়তি ইউরিক অ্যাসিডের জন্য কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই। নারীদের ১৩ ও পুরুষদের ১১ মিলিগ্রাম/লিটারের বেশি ইউরিক অ্যাসিড থাকলে চিকিৎসা নিতে হবে। এছাড়া বছরে একাধিকবার গাউটের আক্রমণ, কিডনিতে পাথর, গিরা নষ্ট হওয়া, কিডনির অকার্যকারিতায় চিকিৎসা লাগবে। সাময়িক নয়, সাধারণত সারা জীবনই চিকিৎসা নিতে হয়।

ব্যাডমিন্টন

শীতের সময়টাতে ব্যাডমিন্টন খেলা বেশি জনপ্রিয়। শরীর ও মনের সুস্থতায় অবশ্য ব্যাডমিন্টন বেশ উপকারী। এক ঘণ্টা ব্যাডমিন্টন খেললে ৪৫০ ক্যালরি পোড়ানো সম্ভব। এই খেলা আপনার গতি বাড়াবে, শরীরটাকে ফিট রাখবে। বুদ্ধিতেও শাণ পড়বে। গড়ে উঠবে খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা। ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়ে দৌড়ঝাঁপ, ডাইভিং, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কর্কে আঘাত করার বিষয়টি আপনার পেশি ও সন্ধির দক্ষতা বাড়াবে। এ ধরনের খেলায় রক্তে খারাপ চর্বির মাত্রা কমে, ভালো চর্বির মাত্রা বাড়ে। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে। ডায়াবেটিসের রোগীরা হাঁটার বদলে ব্যাডমিন্টনও খেলতে পারেন। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমবে। সুস্থ ব্যক্তি খেলার অভ্যাস

গড়ে তুললে পরবর্তী সময়ে তাঁদের এসব দীর্ঘমেয়াদি রোগ হওয়ার ঝুঁকি কমে। এ ছাড়া এ রকম খেলায় অস্থিসন্ধিগুলো সচল ও সুস্থ থাকবে। হাত, পা, পিঠসহ শরীরের প্রায় সব জায়গার মাংসপেশির জোর বাড়বে এবং এর পাশাপাশি এসব পেশির নমনীয়তা বাড়বে। ব্যাডমিন্টন খেলার অভ্যাস সচল ও কর্মক্ষম থাকার পথে আপনাকে এগিয়ে দেবে। সচল থাকার মাধ্যমে হাড়ের ক্ষয় রোধ হবে। ব্যাডমিন্টন খেলায় আপনার দুশ্চিন্তা কমবে। প্রফুল্ল থাকতে পারবেন। সামাজিক যোগাযোগ বাড়বে। শরীরের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন যাবে প্রচুর পরিমাণে। এন্ডরফিন নিঃসরণ বাড়বে, যার ফলে শরীরের ব্যথা কম অনুভব করবেন, মানসিক চাপ কমবে এবং ঘুম ভালো হবে।

মাঝবয়সের মন

ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরপুর সংসারে ব্যস্ততা তো থাকেই। জীবনের অনেকটা সময় পেরিয়ে মধ্য বয়সের একপর্যায়ে নারীদের সেই ব্যস্ততা কমে। সন্তানেরা বড় হয়ে নিজেদের জগৎ গড়ে নেয়। স্বামীও কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অনেক সময় স্ত্রীর একা একা লাগে। পাশাপাশি চুল পাকতে শুরু করে, কপালে পড়ে বলিরেখা। মন বিক্ষিপ্ত ও মেজাজ খিটখিটে হয়ে উঠে। ঘুমের সমস্যা, শরীরে ব্যথা-বেদনা, জ্বালাপোড়া প্রভৃতি সমস্যার শুরু মধ্যবয়সেই। এটাকে মিডলাইফ ক্রাইসিস বা মাঝবয়সের সংকট বলে। ৪৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সটা নারীরা একধরনের মানসিক সংকট পার করেন। শরীর-মনে পরিবর্তনের পাশাপাশি সুস্থতা বা ফিটনেস কমতে থাকে। রোগ বালাইয়ের আক্রমণ বাড়ে। বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের সমীকরণ পাল্টায়। কাজকর্ম ও পেশাজীবন নিয়ে অনেক সময় অসন্তুষ্টি তৈরি হয়। চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মেলাতে গিয়ে দানা বাঁধে অভিমান, অনুশোচনা। এসবের নেতিবাচক প্রভাব শরীরেও পড়ে। এ সময়ই রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদির আক্রমণ বাড়তে থাকে। অনেকে মুটিয়ে যান, কারও রক্তে চর্বি বেড়ে যায়। ফলে মানসিক সংকট আরও বাড়ে। এই পরিবর্তনকে অনেকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। কোনো কোনো নারী মনে করেন, সৌন্দর্য হারিয়ে যাচ্ছে। মেনোপেজকে অনেকে স্বাভাবিভাবে নিতে পারেন না। সব মিলিয়ে মাঝ বয়সে বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার সমস্যা পুরুষের তুলনায় নারীদের প্রায় দ্বিগুণ।

কিছু পরামর্শ : নিজের শরীরের সুস্থতার দিকে নজর দিন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চেকআপ করান। প্রতিদিন হাঁটাহাঁটি বা ব্যায়ামের অভ্যাস করুন। পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ান। পুরোনো বা হারিয়ে যাওয়া কোনো শখ, যেমন গান শোনা, ছবি আঁকা অথবা সেলাই করা ইত্যাদির চর্চা আবার শুরু করুন। কেবল টেলিভিশন দেখে নয়, সময় কাটান উৎপাদনশীল কোনো কাজে।

ওষুধ দরকার / অদরকার

অসুখ হলে ওষুধ লাগে, তা ঠিক। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া ঠিক না। আমরা অনেক সময় নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করি, নয়তো বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশীর পরামর্শে, অন্য কারও ব্যবস্থাপত্র দেখে বা শুনে ওষুধ খেয়ে ফেলি। অনেকে আবার ওষুধের দোকানিকে নিজের সমস্যার কথা বলে ওষুধ কিনে খান। ডায়াবেটিস, হাঁপানি এমনিক দুরারোগ্য ক্যানসারও 'সম্পূর্ণ' সারিয়ে ফেলার নানা নামকাওয়াস্তে ওষুধ খেয়ে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নজিরও আছে অনেক। তাই ওষুধ খেতে হবে নিয়ম মেনে, সময়মতো। অনেকে কয়েকবার ওষুধ খাওয়ার পর উপসর্গ অনেকটাই কমে এলে হাঠৎ ওষুধ বন্ধ করে দেন। এটা বড় বিপদের কথা। এতে রোগটা সম্পূর্ণ সারে না, পরে জীবাণ আরও শক্তিশালী হয়ে আক্রমণ করে আর ওষুধের কার্যকারিতাও যায় কমে। অনেক সময় ওষুধের কার্যকরী ফল পেতে একট দেরি হতেই পারে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। কিছু নিয়মিত ও দীর্ঘস্থায়ী ওষুধ, যেমন; উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসের ওষুধ, হঠাৎ নিজের মর্জিমতো বন্ধ করে দেয়া বা মাত্রা কমবেশি করাও ঠিক নয়। রক্তচাপ ঠিক আছে বলেই যে ওষুধ বাদ দেয়া যাবে, তা নয়। কিডনি বিকলসহ আরও নানা জটিলতা দেখা দেয়, তখন আফসোস করা ছাড়া উপায় থাকে না। ইচ্ছেমতো ভিটামিন, আয়রন, ক্যালসিয়ামও খাবেন না। এসব ওষুধেরও নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। ওষুধ নিয়ে অনিয়ম আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে। কারণে-অকারণে ভুল মাত্রায় ভুল মেয়াদি অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া এবং মশা মারতে কামান দাগার মতো করে শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ, এসবের পরিণাম ভয়াবহ। এতে উপকারী জীবাণুও ধ্বংস হয়ে যায়, ক্ষতিকর জীবাণ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যক্ষ্মা রোগের কথাই ধরা যাক, নিয়ম মেনে এ ওষুধ ছয় মাস খাওয়ার কথা, কিন্তু দুই মাস যেতে না-যেতেই রোগী বেশ তরতাজা হয়ে উঠেন, উপসর্গ চলে যায় আর রোগীরা ওষুধ ছেড়ে দেন। পরে এই যক্ষ্মার জীবাণু এমন মারাত্মক অবাধ্য হয়ে ওঠে যে আর কোনো ওষুধেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ওষুধ কেনার সময় মেয়াদ দেখে নিন। বাড়িতে ওষুধ রাখবেন ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায়, সূর্যের আলো থেকে দূরে, অবশ্যই শিশুদের নাগালের বাইরে। ব্যবস্থাপত্র লেখা নামের বদলে অন্য ওষুধ কিনতে চাইলে লেবেল ও জেনেরিক নাম দেখে নিন, দোকানদারের ভুলও হতে পারে। বাড়িতে পুরনো ওষুধ থাকলে ফেলে দেয়াই ভালো। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জেনে রাখা ভালো। চিকিৎসককে সবকিছু জানান।

ক্যালসিয়াম

ওষুধের দোকান থেকে কিনে ক্যালসিয়াম বড়ি খান অনেকেই। একট হাত-পা ব্যথা, শরীর ম্যাজম্যাজ বা বয়স হয়েছে বলেই ক্যালসিয়াম খেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কেননা আমাদের দৈনন্দিন নানা খাবারেও পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম আছে। প্রতিদিন এ রকম খাবার থেকেই আমরা ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারি। ক্যালসিয়াম নামের

খনিজ উপাদানটি আমাদের হাড় ও দাঁত শক্ত করে, ক্ষয় রোধ করে। স্নায়ু, হৃৎস্পন্দন, মাংসপেশির কাজেও ক্যালসিয়াম দরকার হয়। এটির অভাবে হাড়ক্ষয় অষ্টিওপোরাসিস রোগ হতে পারে। তাই ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবারগুলো কী তা জেনে নেয়া উচিত। দুধ, দই, পনির, কাঁচা বাদাম, সয়াবিন, আখরোট, সামুদ্রিক মাছ, কাঁটাযুক্ত ছোট মাছ, কালো ও সবুজ কচুশাক, শজনে পাতা, পুদিনা পাতা, সরিষাশাক, কুমড়ার বীজ, সূর্যমুখীর বীজ, চিংড়ি শুঁটকি, ডুমুর ইত্যাদি হলো উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার। ১ কাপ দুধে ক্যালসিয়াম আছে ৩০০ মিলিগ্রাম, পাবদা মাছে আছে ৩১০ মিলিগ্রাম, সামুদ্রিক মাছে ৩৭২ মিলিগ্রাম, শজনে পাতায় ৪৪০ মিলিগ্রাম, ট্যাংরা মাছে ২৭০ মিলিগ্রাম। তবে অন্ত্রে ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা দেয় এমন খাবারের সঙ্গে না খাওয়াই ভালো। যেমন উচ্চমাত্রার চর্বি ও অক্সালিক অ্যাসিডযুক্ত খাবার। চকলেট, পালংশাক, কার্বোনেটযুক্ত পানীয় ইত্যাদিও ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা দেয়। কিন্তু ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে ভিটামিন এ, সি এবং ডি। ম্যাগনোসিয়ামযুক্ত খাবারও ক্যালসিয়ামের কাজে সাহায্য করে।

ভাইরাসে অ্যান্টিবায়োটিক নয়?

সাধারণত ভাইরাস সংক্রমণের কারণে নিত্যদিনের জ্বরজারি হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শ্বাসতন্ত্রের মৌসুমি সংক্রমণ থেকে শুরু করে গলাব্যথা, ডায়ারিয়া, এমনকি ডেঙ্গু জ্বর ইত্যাদি অসুখের অন্যতম কারণ হলো নানা ধরনের ভাইরাস। এমনিতে শরীরের নিজস্ব রোগপ্রতিরোধে ক্ষমতার কারণে এসব আপনা-আপনি সেরে যায়। কোনো অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। কেবল আমাদের দেশেই নয়, যক্তরাষ্ট্রেও প্রতিবছর ১০ লাখ ভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসায় অকারণে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে এ অবস্থা আরও ভয়াবহ। কেননা, এখানে কোনো ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই অ্যান্টিবায়োটিক কেনা যায়। ভাইরাস সংক্রমণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে সেরে যায়। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া-দুই ধরনের জীবাণু। এ দুটোর সংক্রমণ সারানোর পদ্ধতিও আলাদা। ভাইরাস জ্বরের চিকিৎসা মূলত লক্ষণ প্রশমন, যেমন প্যারাসিটামল, অ্যান্টিহিস্টামিন সেবন, পর্যাপ্ত বিশ্রাম,বেশি করে তরল খাবার গ্রহণ ইত্যাদি। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হয়। যদি জ্বর সাত দিনের বেশি থাকে, তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি হয়, কাশির সঙ্গে সবুজ বা হলুদ কফ বেরোয়, কফের সঙ্গে রক্ত যায় এবং শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা হয়। তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সাধারণ ভাইরাস জ্বরে অ্যান্টিবায়োটিক নয় : অ্যান্টিবায়োটিকে এই সংক্রমণ সারে না। রোগের লক্ষণ প্রশমনেও অ্যান্টিবায়োটিক কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। এর অকারণ ব্যবহার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অকারণে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে শরীরে ব্যাকটেরিয়া তৈরি হতে থাকে। একই ওষুধে পরে আর কাজ হয় না। সাধারণ ভাইরাস জ্বর হলে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। এ জ্বর এমনিতেই সেরে যাবে। বিশ্রাম নিন। প্রচুর তরল পান করুন।

কীভাবে হাঁটবেন ট্রেড মিলে না বাইরে?

আজকাল অনেকেই ঘরের ভেতরে হাঁটা-দৌড়ানোর যন্ত্র বা ট্রেডমিল কিনে ব্যায়াম করে থাকেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, ঘরে ট্রেডমিলে হাঁটা ভালো, নাকি ঘরের বাইরে? এর উত্তরটা ঠিক স্পষ্ট নয়। কেননা ক্যালরি খরচ, মাংসপেশির ব্যবহার এবং হৃৎপন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ-সবই প্রায় সমান হতে পারে। তবে সামান্য কিছু পার্থক্যও আছে: ট্রেডমিলে হাঁটলে বা দৌড়ালে কেমার বা উরুর মাংসপেশির চেয়ে বেশি কাজ করে পায়ের কোয়াড্রিসেপস মাংসপেশি। সাধারণ হাঁটা বা দৌড়ে এই পার্থক্য নেই। তাই ট্রেডমিলে হাঁটার সময় এই বিশেষ ভারসাম্য শিখে নিতে হয়, নয়তো আঘাতের ঝুঁকি থাকে। বাইরে হাঁটার সময় আমাদের বাতাসের গতির বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। পথে বা রাস্তায় বাঁক থাকে, পথ মসৃণ বা অমসৃণ ইট, পাথর এড়িয়ে যেতে হয়। এই সব কিছু মিলে গহবেষকেরা বলেন, বাইরে হাঁটলে শরীর, স্নায়ুতন্ত্র, ইন্দ্রিয় যতটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, ট্রেডমিলে তা সম্ভব নয়। বাইরে, বিশেষ করে পার্কে হাঁটলে প্রকৃতির সান্নিধ্য পাওয়া যায়, যা মনের স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম। এ ছাড়া শরীরে সূর্যের আলো লাগে, যা থেকে আমরা ভিটামিন ডি পাই। চোখের সামনে উদ্দেশ্য বা সমাপ্তি রেখা থাকে, যা মনকে উদ্বুদ্ধ করে। আধুনিক ট্রেডমিলে হৃৎস্পন্দন, দৌড়ের গতি বা ক্যালরি ক্ষয়ের হিসাব প্রুতি মুহূর্তে পাওয়া যায়। এতে আপনি লক্ষ্যে পৌঁছেছেন কি না জানতে পারেন। যারা দৌড়বিদ, তাঁরা ট্রেডমিলে চর্চা করলে নিজের গতি মাপতে পারবেন। আবহাওয়া খারাপ থাকলে বাইরের চেয়ে ট্রেডমিলই ভালো। তবে মোট কথা হলো, হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমাতে সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট ব্যায়াম বা হাঁটার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। বাইরেই হোক, কি ঘরের ভেতর থেকে এইটুক সম্পন্ন করার চেষ্টা কখনোই ছাড়া যাবে না।

মশাবাহিত রোগ

কি শীত, কি গরম-সারা বছরই নগরবাসীকে মশার কামড় খেতে হয়। শহরের এখানে-ওখানে খানাখন্দ, খোলা ম্যানহোল, পয়োনাল, অর্ধনির্মিত দালান, আবর্জনায় ভরা। এসব জায়গায় মশা বংশ বিস্তার করে চলেছে। এসব মশা থেকেই প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে চলেছে। এসব রোগে মৃত্যুর হারও কম নয়।

ম্যালেরিয়া : বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি। তাই বলে ঢাকা বা অন্যান্য শহরেও যে হয় না, তা নয়। তা ছাড়া প্রতিদিনই অনেক পর্যটক বেড়াতে বা কাজে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ইত্যাদি এলাকায় যাচ্ছেন। তাই যে কেউ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন। অনেক জ্বর, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, প্লীহা ও যকৃতের আকৃতি বৃদ্ধি ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ। কখনো কখনো ম্যালেরিয়া প্রাণনাশী হয়ে উঠতে পারে, মস্তিষ্ককে আক্রমণ করতে পারে, অস্বাভাবিক রক্তপাত, জন্ডিস ইত্যাদিও ঘটাতে পারে।

মশারিতে রোগ প্রতিরোধ

ডেঙ্গু : ডেঙ্গু মশার আক্রমণ শহরেই বেশি। জ্বর, প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও চোখব্যথা, গায়ে ফুসকড়ি বা র‍্যাশ এই রোগের লক্ষণ। এতে রক্তে অনুচক্রিকা কমে যেতে পারে এবং অস্বাভাবিক রক্তপাত হতে পারে। এমনিতে ডেঙ্গ জ্বরে মৃত্যুর আশঙ্কা তেমন নেই, তবে ডেঙ্গ শক সিনড্রোম হয়ে গেলে ব্যাপারটা জটিল রূপ নিতে পারে। এডিস মশা দিয়ে এরোগ ছড়ায়। এডিস মশা দিনে কামড়ায়। এডিস মশা জঙ্গলে নয় ঘরে বাস করে।

চিকুনগুনিয়া : এটিও এডিস মশার মাধ্যমেই ছড়ায়। এই রোগে জ্বরের পাশাপাশি হাড়ের জোড়া বা অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হয়। ব্যথা, জ্বর সেরে যাওয়ার পরও অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। দেখা গেছে যাদের HLA-B27 পজেটিভ তাদের ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

এনকেফেলাইটিস : এটিও মশাবাহিত ভাইরাস। মস্তিষ্কে প্রদাহ ঘটায়। সাধারণ ফ্লুর মতো উপসর্গ। এশিয়া মহাদেশে এই সমস্যা জাপানিজ এনকেফেলাইটিস নামে পরিচিত। এর প্রভাবে জ্বর, গলাব্যথা থেকে শুরু করে খিঁচুনি, মাংসপেশির দুর্বলতা ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে।

জিকা : বেশ কয়েকটি দেশে জিকা ভাইরাসজনিত যে সমস্যার দেখা মিলেছে, সেটাও মশাবাহিত। বাংলাদেশে ততটা না দেখা গেলেও মনে রাখতে হবে যে ভাইরাসবাহী মশা বিমানে করে আসতে পারে। গর্ভবতী মা এতে সংক্রমিত হলে গর্ভস্থ শিশু আক্রান্ত হতে পারে। জিকার রোগীদের গুলেন ব্যারী সিনড্রম বেশি হয়।

মশা থেকে সাবধান : মশার কামড় থেকে আত্মরক্ষাই সবচেয়ে বড় সমাধান। বসন্তকাল থেকে শুরু হয় মশাবাহিত অসুখ-বিসুখের প্রকোপ, বর্ষাকালে সবচেয়ে বাড়ে। মশা থেকে বাঁচাতে হালকা রঙের কাপড় পরবেন, ফুলস্লিভ হলে ভালো। বাড়িতে মশারি ব্যবহার করতে পারেন। রাতে অবশ্যই মশারি ব্যবহার করবেন। শিশুরা ঘুমালে দিনেও মশারি ব্যবহার করা দরকার। পাহাড়ি এলাকায় ঘুরতে গেলে অবশ্যই সাবধান থাকবেন, সঙ্গে ফুলহাতা জামা ও মশা তাড়ানোর ওষুধ নেবেন। বাড়িঘরের আশপাশে বদ্ধ পানি নিয়মিত সাফ করবেন। টবের নিচে, এসির নিচে জমে থাকা পানি পরিষ্কার রাখবেন। প্রয়োজনে পাড়ার সবাই মিলে নিজেদের আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখুন এবং পানি ও আবর্জনামুক্ত রাখার বিষয়ে একতাবদ্ধ হোন।

ধূমপান ছাড়ার উপায়

সিগারেটে নিকোটিনসহ ৫৬টি বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান আছে। ধূমপান করলে যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের ক্যানসার, হৃদ্‌রোগসহ নানা জটিল রোগ হতে পারে-এটা প্রায় সবাই জানে। তবে যেটা অনেকে জানে না, তা হলো নিজে ধূমপান না করেও মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়ে অসুস্থ হয়ে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী পরোক্ষ ধূমপানের কারণে প্রতিবছর ছয় লাখ মানুষের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে দেড় লাখের বেশি শিশু। পরোক্ষ ধূমপানের কারণে শিশুদের হাঁপানি, নিউমোনিয়া ইত্যাদি হতে পারে। পরোক্ষ ধূমপানের বড় শিকার নারীরা। নারীদের শারীরিক ক্ষতি পুরুষদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। ধূমপায়ী হলে আপনি নিজের তো বটেই, নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্যও কত বিপদ ডেকে আনছেন। ধূমপান ছাড়ার জন্য কিছু পরামর্শ আপনার কাজে আসতে পারে-

সদিচ্ছা : প্রয়াজন দৃঢ় প্রত্যয়। ধূমপানের খারাপ দিক ভাবুন। এভাবেই সদিচ্ছা গড়ে উঠবে। নিজের কাছে অঙ্গীকার করুন-আপনি ধূমপান ছেড়ে দেবেন এবং নিশ্চয়ই তা পারবেন।

বিকল্প : বিকল্প হিসেবে পান-জর্দা বা অন্য কোনে ক্ষতিকর জিনিস বেছে নেবেন না। চা, কফি, ফলের রস, চুইংগাম ইত্যাদির অভ্যাস করতে পারেন। অন্য কোনো উপাদেয় জিনিসের দিকে ঝুঁকে নিকোটিনের নেশা থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

ব্যস্ততা : ব্যস্ততা বাড়ালে নেশা দূর করা সহজ হবে। অধূমপায়ী বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ লাভ করার চেষ্টা করুন। বাগান করা, সিনেমা দেখা, বই পড়া, গান শোনা ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটাতে পারেন। ব্যায়াম শুরু করতে পারেন।

বারংবার হাতে পানি লাগা

আমাদের দেশে রান্নাবান্না ও বাসন ধোয়ার মতো ঘরোয়া কাজে নারীদের সাধারণ বেশ সময় দিতে হয়। তাদের প্রায়ই হাত, হাতের আঙুলের ফাঁক বা তালুতে ছত্রাকের সংক্রমণ হয়। সোজা কথায় হাজা, মজা বা পচা হাত। এতে চুলকানি হয়, ত্বকের রং কখনো লাল বা সাদা হয়ে যায়, কখনো ফুসকুড়ি হয়, আঙুলের ফাঁকাগুলো ফেটে যায় বা ঘা হয়। কারও আবার নখ হলদে হয়ে যায়। এমন সমস্যায় চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন হাত যেন বেশি ভেজা না থাকে বা পানি বেশি না লাগে। পানি, ডিটারজেন্ট, সাবান ব্যবহার বা রান্নাঘরের কাজের সময় হাত ঢেকে রাখতে কিচেন গ্লাভস ব্যবহার করুন। গোসলের সময় অতিরিক্ত পানি বা সাবান ব্যবহার করবেন না। অনেকে সংক্রমণ কমবে ভেবে ডেটল বা স্যাভলন-জাতীয় জীবাণুনাশক ব্যবহার করেন। এটা একেবারেই করা যাবে না। হাত ভেজা থাকলে ছত্রাকের সংক্রমণ বাড়ে। তাই হাত ভেজানোর পর পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে মুছে নিন। হাত ঘামলেও মুছে ফেলুন। আঙুলের ফাঁকাগুলোও শুষ্ক করে নিন। এ

কাজের অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন ভালো কাজ করে। খাওয়ার সময় ও রান্নার প্রস্তুতির সময় যথাসম্ভব চামচ ব্যবহার করতে চেষ্টা করুন। ছত্রাকের সংক্রমণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সলিউশন ব্যবহার করুন। ডায়াবেটিস থাকলে এই ঝুঁকি বাড়ে। তাই রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করুন এবং বাড়তি থাকলে নিয়ন্ত্রণ করুন।

শুকনো ফলে পুষ্টি

শুধু রান্নার পদ্ধতিতে ভুলের কারণে অনেক সময় সবজির পুষ্টিমান নষ্ট হয়ে যায়। শাক-সবজিতে আছে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। আর এসব পুষ্টি উপাদান শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমের জন্য দরকারি। কিন্তু রান্না করতে গিয়ে অজান্তেই আমরা সেগুলো নষ্ট করে ফেলি। শাক-সবজির পুষ্টিমান অটুট রেখে রান্নার জন্য শাক-সবজির বেশি কুচি কুচি করে কাটবেন না। আস্ত রাখার চেষ্টা করবেন। সম্ভব হলে খোসাসহ রান্না করুন। খোসার ভেতরের অংশ আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে আসে না বলে তাতে পুষ্টিমান বেশি থাকে। ছুরি বা বঁটি দিয়ে খোসা পুরু করে না কেটে ছিলে বা চেঁছে নিলে ভাল। এতে আঁশ পাবেন বেশি। সবজি ঢেকে রান্না করলে ভিটামিন সি অনেকখানি রক্ষা পাবে। কাটার পর শাক-সবজি পানিতে দীর্ঘ সময় ভিজিয়ে রাখলে গুণাগুণ অনেকটাই চলে যায়। তাই কেটে বেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রান্না করে নিন। ভিটামিন সি তাপে সংবেদনশীল। তাই বেশি সেদ্ধ করলে নষ্ট হয়ে যায়। কম পানিতে কম তাপে রান্না করা বা ভাপে সেদ্ধ করে খাওয়া সবচেয়ে ভালো। রান্না করা সবজি বারবার গরম করলেও খাদ্যগুণ নষ্ট হয়। তাই তাজা খাওয়াই ভালো। রোদে ফেলে রাখলে খাদ্যগুণ ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। তামার পাত্রে রান্না করলে ভিটামিন সি একেবারেই থাকে না। তেলে ভেজে খাওয়ার চেয়ে রান্না করে খাওয়াই ভালো। কিছু ভিটামিন আবার তেল দ্রবণীয়। তাই খানিকটা তেল দিয়ে রান্না করা উচিত। নিরামিষ রান্নায় খানিকটা চিনি দিলে ভিটামিন সি রক্ষা পায়।

সবজির গুণ ঠিক রেখে রান্না

বহু যুগ আগে থেকেই ফল শুষ্ক করে বা ফলের মধ্যকার জলীয় অংশকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা ও খাওয়ার প্রচলন আছে। কিশমিশ, খোরমা, শুকনো খেজুর, আমসি, আমসত্ত্ব ইত্যাদি আমাদের দেশে জনপ্রিয়। ইদানীং বাজারে বিদেশি শুকনো ফল যেমন: এপ্রিকট, ক্রানবেরি, ফিগ ইত্যাদিও প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণত ফলকে শুকিয়ে ফেলার পর এর মধ্যকার উপাদানের ঘনত্ব বেড়ে যায় বলে শুকনো ফলে সাধারণ ফলের চেয়ে পুষ্টি বা ক্যালরি বেশি। শুকনো করে ফেলার পরও এতে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, রিবোফ্ল্যাভিন, থায়ামাইন ইত্যাদি পুরোপুরি সংরক্ষিত থাকে। এ ছাড়া শুকনো ফলে চর্বি, কোলেস্টেরল ও সোডিয়াম বা লবণ থাকে না বললেই চলে। তবে এতে চিনি বা শর্করা পরিমাণ বেশি।

অনেক প্রস্তুত প্রণালিতে খানিকটা চিনি মেশানো হয় বলে এগুলো রক্তে শর্করা বাড়াতে পারে। কিশমিশ, শুকনো খেজুর এপ্রিকটে প্রচুর পরিমাণে আয়রন আছে এবং রক্তশূন্যতার রোগীদের প্রায়ই এসব ফল খেতে বলা হয়। এ ছাড়া কিশমিশে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাসও অনেক। রক্ত চলাচলে সাহায্য করে এগুলো। রক্তনালিকে সুস্থ রাখে। শুকনো ফলে প্রচুর আঁশ বা ফাইবার থাকে, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। বিশেষ করে এপ্রিকট ও ফিগ বা শুকনো ডুমুর পরিপাকন্ত্রের সুসস্থতার জন্য ভালো। শুকনো ক্রানবেরি প্রস্রাবের সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। শুকনো আম বা আমসত্ত্বতে আছে প্রচুর ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই। আরও আছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, যা ত্বকের সুরক্ষা দেয়। কিশমিশে যে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে, তা ত্বককে সতেজ রাখে বলে সৌন্দর্য চর্চায় এর ব্যবহার সুপ্রাচীন। শুকনো ফলের ভালো দিক হলো, এটি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে খাওয়া যায় ও সহজে বহনযোগ্য, পচনশীল নয়। শুকনো কাচের বয়াম বা জারে সংরক্ষণ করে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করে প্রতিদিন কিছু কিছু করে খেতে পারেন।

কর্মব্যস্ততা ও সুস্থতা

কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও শরীরের কিছু হালকা ব্যায়াম প্রয়োজন। তেমনি কাজের পদ্ধতি ঠিক হওয়াটাও জরুরি। কম্পিউটার ব্যবহার এবং বসে কাজ করার সময় যেসব বিষয় খেয়াল রাখা দরকার :

১. সব সময় পিঠ ও ঘাড় সোজা রেখে বসুন। ঘাড় বা কোমর বাঁকিয়ে বসলে পরবর্তী সময়ে ব্যথা হতে পারে।

২. নরম গদির চেয়ার পরিহার করুন। রিভলভিং চেয়ারও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এমন চেয়ার ব্যবহার করুন, যাতে বসলে পুরো মেরুদণ্ড স্বাভাবিক, সোজা ও স্থির থাকে। আরামদায়ক উচ্চতার চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করুন। পিঠ টান করে পিছনে লাগিয়ে বসা ভাল।

৩. কম্পিউটার মনিটর থাকবে চোখের উচ্চতায়। শরীর থেকে মনিটরের দূরত্ব থাকবে কমপক্ষে এক হাত। অনেকে অফিসের ডেস্কের যেকোনো এক প্রান্তে কম্পিউটারের মনিটর রাখেন (ডান বা বামদিকে)। ফলে বারবার মনিটরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে কাজ করতে হয়। এটি একেবারেই উচিত নয়। কিছুদিন এভাবে কাজ করলে ঘাড়ের ব্যথায় ভুগতে হবে। তাই কম্পিউটারের মনিটর রাখুন ঠিক সামনের দিকে।

৪. ফাইল বা কোনো কাজ পড়তে হলে বা কিছু লিখতে হলে খেয়াল রাখুন যেন ঘাড় বাঁকিয়ে কাজটি করতে না হয়। টেবিল কিছু হলে ঘাড় বাঁকিয়ে লিখতে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে টেবিল পরিবর্তন করা সম্ভব না হলেও টেবিলের ওপর অধিক পুরুত্বের বইপত্র রেখে কাজের জায়গাটুক উঁচ করে নিন। এভাবে কাজ করলে ঘাড় বাঁকাতে হবে না।

৫. কম্পিউটারের মাউস বা কি-বোর্ড ব্যবহারের সময় হাতের কবজি ভাঁজ করে রাখা ঠিক নয়। কবজি ভাঁজ না করে। সোজাভাবে হাত রেখে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। কি বোর্ড ও মাউস রাখুন আরামদায়ক দূরত্বে। কাজ করার সময় শরীর থেকে কনুই যেন খুব দূরে সরে না যায়।

৬. কাজের সময় পা সোজাভাবে মাটিতে রাখুন, চাইলে পা-দানিতে রাখতে পারেন।

৭. কম্পিউটারে কাজ করলে ২০ মিনিট পর পর ২০ সেকেন্ড ২০ ফুট দূরে তাকিয়ে থাকুন।

৮. একটানা বসে না থেকে ৯০ মিনিট পর পর দাঁড়ানো / হাঁটার অভ্যাস করুন।

স্বাস্থ্য সম্মত খাবার

ওজম কমাতে, রক্তচাপ ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমাতে একট বয়স হলে খাবারদাবারে আনা চাই নিয়ন্ত্রণ। আমরা সবাই জানি যে খাবার হওয়া চাই সুষম, অর্থাৎ আমিষ, শর্করা, চর্বি ও ভিটামিন, খনিজের সমাহার থাকা চাই। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এমন কিছু খাবার আছে, যা কম কম খাওয়াই ভালো।

চিনি ও চিনিযুক্ত পানীয় : সাদা চিনি, বাদামি চিনি, ফ্রুকটোজ কর্ন সিরাপ, কর্ন সুগার, মধু-নানা নামের চিনি যুক্ত করা হয় বাজারজাত পানীয়তে। যে নামেই থাকুক, এগুলো সবই সহজ শর্করা, যা রক্তে শর্করা ও ওজন বাড়ায়। প্রতিদিন কেবল ছোট সাইজের এক ক্যান চিনিযুক্ত পানীয় (কোলা, জুস ইত্যাদি) বছরে আপনার ওজন বাড়াবে **১৫** পাউন্ড।

বেকারি : কেক, প্রেস্ট্রি, ডোনাট, কুকিজ-এসব খাবারে থাকে বাড়তি চিনি, কিছু লবণ, প্রক্রিয়াজাত শর্করা, ট্রান্সফ্যাট নামের খারাপ চর্বি। এগুলো ক্ষতিকর।

সাদা শর্করা : শর্করা আমাদের মূল খাবার। কিন্তু সাদা ভাত, ময়দার তৈরি রুটি বা পরোটা, সাদা পাউরুটি, নুডলস, পাস্তা এগুলো সহজেই শর্করা ও জন বাড়ায়। তাই আঁশযুক্ত বা গোটা শষ্যের তৈরি খাবার থেকে শর্করা বেছে নিন। বেছে নিন লাল বা মোটা ভাত, আটার রুটি, ব্রাউন ব্রেড, পাস্তা ইত্যাদি।

দুগ্ধজাত খাবার : বেশির ভাগ দুগ্ধজাত খাবারই মিষ্টিদ্রব্য। এ ছাড়া ঘন দুধ ও দুধের তৈরি পনির, মাখন পায়েস, পুডিং, আইসক্রিম এগুলো সবই উচ্চ ক্যালরিযুক্ত। ননিহীন দুধ বা কম ননিযুক্ত দুধ বেছে নেওয়া ভালো।

লাল মাংস : গরু ও খাসির মাংসের তৈরি নানা লোভনীয় পদের খাবার মাসে এক-দুই দিনে সীমিত করে নিন। আমিষের উৎস হিসেবে বেছে নিন মাছ, দুধ, ডিম, মুরগি, বাদাম ও ডাল।

চিকন পাতলা মানেই অসুখ নয়

প্রশ্ন : উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কম, স্বাস্থ্য খারাপ, বন্ধুরা হাসাহাসি করে। তা ছাড়া প্রায়ই অসুস্থ থাকি। কীভাবে স্বাস্থ্যভালো করতে পারি?

উত্তর : ওজন ঠিক আছে কি না, তা বুঝতে চিকিৎসকেরা একটি নির্দেশক ব্যবহার করেন, যার নাম বিএমআই বা বডি মাস ইনডেক্স। উচ্চতা অনুযায়ী ওজনের পরিমাপ এটা। যদি বিএমআই ঠিক থাকে তবে দেখতে শুকনো বা চিকন হলেও আপনি সুস্থ আছেন বলে ধরে নিতে হবে। তবে বিএমআই স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে আন্ডারওয়েট বা ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী বলা যায়। উচ্চতা, ওজন এবং কাজের ধরন বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা সম্পর্কে জেনে নিন। কিছু সাধারণ রোগের জন্য অনেক সময় ওজন কমে যেতে পারে। ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের সমস্যা, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা বা কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগ আছে কি না, তা পরীক্ষা করে নিতে পারেন। খাবার রুচি ভালো এবং অনেক খাই। তবু ওজন বাড়ে না। রুচি ভালো এবং যথেষ্ট খাবার খাওয়ার পরও ওজন কম থাকার কারণ হতে পারে অতিরিক্ত পরিশ্রম কিংবা কিছু রোগ। অন্তত: ডায়াবেটিস ও থাইরয়েডের পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। পরিশ্রম অনুযায়ী প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা নির্ধারণ করুন। একটি সুষম খাদ্য তালিকায় আমিষ, শর্করা, চর্বি বা তেল ও ভিটামিন খনিজের সঠিক সমাহার থাকতে হবে। সামান্য চাপে, পরিশ্রম বেশি করলে বা ঠিকমতো ঘুম না হলে দ্রুত ওজন কমে যায় এবং স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে কেন? সারা দিন যতই পরিশ্রম করুন না কেন, পরিপূর্ণ ঘুম হওয়াটা জরুরি। ঘুম অনেকটা ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার মতো। সারা দিনের পরিশ্রমের পর এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় একটি প্রক্রিয়া। ঘুমের সময় হরমোনজনিত নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুষ্টি উপাদানগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগে। রোজ ছয় ঘণ্টা ঘুমালে আপনি সতেজ ও প্রফুল্ল থাকবেন। নিজের জীবনের জন্যই আপনাকে খেতে হবে। প্রথমে আপনার বয়স, উচ্চতা, ওজন কর্মপরিধি প্রভৃতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্যালরির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। সেই অনুযায়ী প্রতিদিনের খাবারে পরিমাণটাও ঠিক করে নিতে হবে। প্রয়োজনে অল্প অল্প করে বারবার খেতে হবে। রপ্ত হোক সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং রোজকার হালকা ব্যায়াম। প্রতিদিন অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণ করবেন। খেতে ভালা না লাগলে কিছুদিন পরপর খাবারের রেসিপি বদলে নিতে পারেন। এ ছাড়া ছোটখাটো কোনো শারীরিক সমস্যা থাকলে চিকিৎসা করিয়ে নিন।

সুস্থতার পাঁচ তরিকা

বিশ্বজুড়ে বাড়ছে স্ট্রেস। বাড়ছে অস্থিরতা, অশান্তি, মানসিক চাপ। আর সবকিছু মিলে বাড়ছে হৃদ্‌রোগ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাফিক জ্যামই হোক, আর অফিসে মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপ নিত্যদিনের এসব টেনশন আর অস্থিরতা হৃদ্‌যন্ত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, রক্তচাপ বাড়ায়। তাই স্বাস্থ্যকর খাদ্যভ্যাস আর নিয়মিত হাঁটাহাঁটির বাইরেও

মানসিক চাপ বা স্ট্রেস কমানোর পরামর্শ চিকিৎসকদের। সম্প্রতি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বিজ্ঞানীরা কীভাবে দৈনন্দিন চাপ কমাবেন তার একটা নির্দেশনা দিয়েছেন।

হাসুন, পজিটিভ থাকুন : নির্মল হাসি রক্তনালির প্রদাহ কমায়, রক্তে স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, এমনকি রক্তে উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরল বাড়ায়।

ধ্যানমগ্নতা : সারা দিনের ব্যস্ততার মধ্যে ১০ মিনিট সময় বের করুন নিজের জন্য। এই সময়টা একা থাকবেন। গভীর শ্বাস নেবেন, চারপাশের সব ভাবনা চিন্তা ভুলে যাবেন। গবেষকরা বলছেন, মেডিটেশন বা ধ্যান, যোগব্যায়াম বা প্রার্থনা-যে পদ্ধতিই ব্যবহার করুন না কেন, এটা উপকারে আসবে।

ব্যায়াম : মনের এই ব্যায়ামের পাশাপাশি দেহের ব্যায়ামও জরুরি। ব্যায়াম যে শুধ ওজন, রক্তচাপ আর রক্তের চর্বি কমায় তা নয়, স্ট্রেস বা চাপ কমাতেও সাহায্য করে। যতবারই আপনি ব্যায়াম করেন, মন সজাগ আর আনন্দময় করার হরমোন নিঃসৃত হয়, যার নাম এনডোরফিন।

'প্লাগ' খুলে দিন : চাপ কমানোর একটা উৎকৃষ্ট উপায় হলো আনপ্লাগড হওয়া। দিনে টিভি, কম্পিউটার, সেলফোন অন্তত আধঘণ্টার জন্য হলেও বন্ধ করে রাখবেন। এই সময়টা এমন কিছ করবেন, যা দেহ-মনকে সতেজ করে।

সহজ শখ : খুব ছোট ছোট ব্যাপার যেমন: দীর্ঘ সময় ধরে দারুণ একটা গোসল, গুনগুনিয়ে গান গাওয়া বা শোনা, বাগান করা- এসব সহজ শখ মানসিক চাপ কমাতে অনেকটাই সাহায্য করে।

স্বস্তিতে নিজের কাজ

অফিসের কাজের নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমা থাকলেও, নিজের ঘরের কাজের ক্ষেত্রে তা থাকে না। অনেক বাড়িতে মায়েরা দিনের পর দিন কাজ করতে করতে নিজেদের ঘাড়-পিঠ-কোমরের যন্ত্রণাও ক্রমাগত সহ্য করে থাকেন। বয়সজনিত ব্যথা কিংবা বাতের ব্যথা ভেবে খুব একটা গুরুত্বও দেন না অনেকে। অথচ রোজকার কাজে সঠিক দেহভঙ্গি ব্যথামক্ত থাকাটা খুব কঠিন কিছ নয়। দৈনন্দিন নানা কাজে যেমন - দাঁড়িয়ে রান্না করার ব্যবস্থা থাকা ভালো। তা সম্ভব না হলে উঁচু টুলে বসে রান্না করতে পারেন। তবে একটানা দাঁড়িয়ে থেকে বা একটানা বসে থেকে রান্না করা ঠিক নয়। রান্নার মাঝে বিরতি দিতে হবে। হালকা আঁচে রান্না বসিয়ে দিয়ে অন্য ঘরেও কিছু কাজ করে আসতে পারেন। কাটা-বাছা ও ধোয়াধুয়ির কাজ দাঁড়িয়ে করতে পারলে ভালো হয়। তবে এ ক্ষেত্রেও তা সম্ভব না হলে উঁচু টুলে বসে করতে হবে। গ্রামে নলকূপের সাহায্যে পানি ওঠাতে হয় কিংবা পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। সম্ভব হলে মোটরের সাহায্যে পানি ওঠানোর ব্যবস্থা করুন। বড় কলসে পানি ওঠানোর পরিবর্তে ছোট ছোট বালতি বা বড় বোতলে

পানি বহন করুন। বাড়ি থেকে পুকুরের দূরত্ব বেশি হলে বড় একটি লাঠির দুই প্রান্তে দড়ি বেঁধে পানির পাত্রগুলো বহন করতে পারেন। লাঠিটি কাঁধে নিয়ে পানি বহন করলে কোমরে কম চাপ পড়বে। ঘাড় বা কোমরে ব্যথা থাকলে বালতি থেকে মগের সাহায্যে পানি উঠিয়ে গোসল করার পরিবর্তে শাওয়ারে গোসল করা ভালো। বাড়িতে শাওয়ার না থাকলে গোসলখানায় একটি মোড়া রাখুন। মোড়ায় বসে বালতি থেকে পানি উঠিয়ে গোসল করুন। এর ফলে বারবার ঝুঁকতে হবে না। একট ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় কুসুম গরম পানিতে গোসল করা ভালো, এর ফলে শরীরের বিভিন্ন ব্যথা কম হবে। দাঁড়িয়ে ঘর মোছার ব্যবস্থা করা ভালো। বাড়িতে একটি লাঠির একপ্রান্তে কাপড় বা ব্রাশ সংযক্ত করে নিতে পারেন। এটি দিয়ে ঘর মোছা যাবে। গ্রামে যারা মাটির ঘরে বাস করেন, তাদের জন্য বিষয়টি অন্যরকম। কোমর বা ঘাড়ে ব্যথা থাকলে প্রতিদিন ঘরে মাটি না লেপে সপ্তাহে দুই দিন মাটি লেপে দিতে পারে। যারা সেলাই করেন, তারা অবশ্যই ঘাড় ও পিঠ সোজা রেখে কাজটি করবেন। পা নাড়িয়ে সেলাই মেশিন চালাতে হলে সেটিতেও মোটর লাগানোর ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। যেসব মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান, তারা দুধ খাওয়াবার সময় ঘাড় ঝুঁকিয়ে রাখবেন না। দুধ খাওয়ানোর সময় স্বাচ্ছন্দ্যে বসুন এবং শিশুকেও আরামদায়ক ভঙ্গিতে রাখুন।

ভ্যারিকোস ভেইন (পায়ের শিরা ফুলে যাওয়া)

পায়ের শিরাগুলো ফুলে উঠছে আঁকাবাঁকা শিরা দেখা যাচ্ছে। নীল শিরাগুলো একটু যেন বেশি দৃশ্যমান। এই সমস্যার নাম ভ্যারিকোস ভেইন। এই সমস্যায় প্রথম দিকে কেবল পায়ের শিরায় বারবার টান খায়, বিশেষ করে ঘুমের মধ্যে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে পা ফুলে যায়। পরে পায়ের শিরাগুলো ফুলে ওঠে। যাদের জন্মগতভাবে শিরার গাত্র বা ভালভে দূর্বলতা আছে, তাদের এই রোগ হতে পারে। যাঁরা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করেন, তাঁদেরও এই সমস্যা বেশি হয়। এ জন্য একসময় এটাকে ট্রাফিক পুলিশের রোগ বলা হতো। পোশাকশ্রমিক, শিক্ষক, চিকিৎসক বা নার্সদের তাই এ সমস্যা বেশি হতে দেখা যায়। এ ছাড়া গর্ভাবস্থা, পেটের টিউমার বা পেটে পানি জমলে শিরার ওপর চাপ পড়েও এই সম্যা হয়। রোগের শুরুতে কিছ নিয়মকানুনন মেনে চলতে হয়। দীর্ঘ সময় একইভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবেন না, বিশেষ করে পা দুটো ক্রস করে বসে থাকা। নিয়মিত ব্যায়াম করুন যাতে পায়ে রক্ত চলাচল ঠিক থাকে। ওজন কমান। পায়ে কমপ্রেশন স্টকিং বা বিশেষ মোজা পরা যায়। ঠিকঠাক চিকিৎসা না করালে পরে এ থেকে আলসার বা ক্ষত হতে পারে, কালো হয়ে যেতে পারে, রক্তপাত হতে পারে। এমনকি ত্বক শক্ত হয়ে বা রক্ত জমাট বেঁধে নালি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই ভ্যারিকোস ভেইনের চিকিৎসা নেয়া উচিত। অস্ত্রোপচার করে সমস্যা দূর করা যায়। আজকাল লেজার পদ্ধতিতে কাটাছেঁড়া ছাড়াই চিকিৎসা করা হয়। এ ধরনের চিকিৎসা বর্তমানে বাংলাদেশেই সহজলভ্য।

মানসিক চাপ এড়ানোর উপায়

কাজের চাপ, দুশ্চিন্তা, যানজট-সব মিলিয়ে নাগরিক জীবনে মানসিক চাপের অভাব নেই। এতে মেজাজ বিগড়ে হট্টগোল বাঁধাচ্ছেন কেউ, রেগে যাচ্ছেন; আবার কেউ ভুগছেন মাথাব্যথা, অনিদ্রা বা পেটের সমস্যায়। মানসিক চাপ এড়ানোর জন্য ব্যায়াম একটি স্বীকৃত উপায়। নির্দিষ্ট কিছু ব্যায়ামের মাধ্যমে আপনি মানসিক চাপ কমাতে পারেন, রাগও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোনো ব্যায়াম উন্মুক্ত পরিবেশে চর্চা করার সুযোগ থাকলে তা থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যাবে। এমন ব্যায়াম প্রতিদিন দুইবেলা অবশ্যই করুন, সম্ভব হলে তিনবেলা। তবে প্রতিবেলা ব্যায়ামের মাঝে অন্তত আট ঘণ্টার বিরতি নিতে হবে।

- আসন করে বসুন। হাত দুটি ধীরে ধীরে মাথার ওপর তুলুন। দুটি হাতের তাল একসঙ্গে লাগান। হাত দুটি টান টান করে উঁচ অবস্থায় রেখে ধীরে ধীরে সামনের দিকে শরীর ঝুকাতে থাকুন। ঝুঁকে থাকা অবস্থায় ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণতে থাকুন। গোনা শেষে পিঠ সোজা করুন। তিন থেকে ছয়বার একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করুন।
- উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থায় হাত সামনের দিকে রাখুন। হাত দুটি বুকের নিচ বরাবর রেখে হাতের ওপর ভর দিয়ে ওপর দিকে তাকান। উন্মুক্ত স্থানে এ ব্যায়াম করা সম্ভব হলে, এ সময় আকাশের দিকে তাকান। এভাবে তিন থেকে ছয়বার ওপর-নিচে মাথা নাড়ানোর পর হাত দুটি পিছিয়ে এনে কিছুটা ঢাল করে মাথা নামিয়ে বসুন। এ সময় বুকভরে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন।
- আসন করে বসুন। দ্রুত শ্বাস নিন ও ছাড়ুন ২৫-২০ বার। দুই মিনিট বিশ্রাম নিন।
- বিছানা বা মেঝেতে সোজা হয়ে বসুন। পা দুটি সামনে সোজাভাবে রাখুন। হাত দুটি সামনে সোজাভাবে রাখুন। হাত দুটি হাঁটুর ওপর রাখুন। ২০ থেকে ২৫ বার স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন।
- অফিসেও চেয়ারে বসে পেছনের অংশে পিঠ সোজাভাবে রাখুন। হাত দুটি হাঁটুর ওপর রেখে ২০ থেকে ২৫ বার শ্বাস নিন ও ছাড়ুন।

রক্তের চর্বি মাত্রা কমাতে হবে

রক্তে চর্বি বেড়ে গেলে তা ধমনিতে জমা হয়ে রক্ত চলাচলে বাধা দেয়। আর এ থেকেই হৃদ্‌রোগ, মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ বা স্ট্রোক ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। তাই রক্তে চর্বি বা কোলেস্টেরল যাতে বেড়ে না যায়, সে বিষয়ে আজকাল অনেকেই সচেতন। চর্বি নিয়ন্ত্রণে

রাখতে কেউ বলেন রসুন চিবিয়ে খান, কেউ বলে অলিভ তেলে রান্না করেন। আসল কথা হলো, চর্বি যাতে না বাড়ে সে জন্য কিছু খাবার একেবারেই বাদ দিতে হবে, কিছ খাবার খেতে হবে কম।

১. সম্পৃক্ত চর্বি যত কম খাওয়া যায়, ততই ভালো। গরু বা খাসির মাংস এবং ঘি-মাখনে যে চর্বি থাকে, সেটাই সম্পৃক্ত চর্বি। এগুলো বর্জন করুন। আর উপকারী অসমপৃক্ত চর্বি আছে মাছের তেল, বাদাম ও বীজ জাতীয় খাবারে। ট্রান্সফ্যাটও কম খেতে হবে। বেকারি খাবার ও ফাস্ট ফুডে তেল উচ্চতাপে আংশিক হাইড্রোজেনেটেড হয়ে ক্ষতিকর ট্রান্সফ্যাটে পরিণত হয়।

২. আঁশযুক্ত খাবার প্রচুর পরিমাণে খাবেন। যেমন: যব, ভুট্টা, লাল আটার রুটি, ফলমূল, শাক-সবজি। এগুলো রক্তে চর্বি কমাতে সাহায্য করবে।

৩. উদ্ভিজ্জ স্টেরল ও স্টেনল উপাদান রক্তে চর্বি কমাতে সাহায্য করে। ফলের রস, টক দই, তাজা শাক-সবজিতে পাওয়া যাবে এই উপাদান।

৪. নিজের জন্য জুতসই খাদ্যতালিকা নিজেই বানিয়ে নিতে পারেন। অন্যের ডায়েট চার্ট অনুসরণ করে লাভ হয় না। কঠোর খাদ্যতালিকার চেয়ে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে ওপরের নির্দেশনা অনুযায়ী কিছু পরিবর্তন আনলেই উপকার মেলে।

৫. তারপরও রক্তে চর্বি বেড়ে গেলে এবং আপনার হৃদ্‌রোগের অন্যান্য ঝুঁকি থাকল চিকিৎসকের পরামর্শ চবি কমানোর ওষুধ সেবন করাই ভালো।

রোজাদার রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ঔষধ

অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত ব্যক্তিরা রোজা রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধ সেবন নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়েন। এ নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে ১৯৯৭ সালের জুনে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত নবম ফিকাহ-চিকিৎসা সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই সম্মেলনে জেদ্দা ইসলামিক ফিকাহ অ্যাকাডেমি, আল আজহার ইউনিভার্সিটি, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইসলামিক শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (আইএসইএসসিও) প্রভৃতি শীর্ষ ইসলামি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। রোজা পালনরত অবস্থায় কী কী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে এবং ওষুধ প্রয়োগে রোজা নষ্ট হবে না, সে বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনাই তাদের মূল আলোচনার বিষয় ছিল। ওই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসুস্থ অবস্থায় কয়েকটি ওষুধ গ্রহণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন: রোজা পালনরত অবস্থায় চোখ, নাক ও কানের ড্রপ, স্প্রে, ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে। হৃদ্‌যন্ত্রের এনজাইনার সমস্যায় বুকে ব্যথা উঠলে নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট বা স্প্রে জিহ্বার নিচে ব্যবহার করলে রোজা নষ্ট হবে না। কোনো ওষুধ ত্বক, মাংসপেশি, শিরা, হাড়ের জোড়ায় ইনজেকশন হিসেবে প্রয়োগ

করা যাবে। তবে স্যালাইন বা গ্লুকোজ জাতীয় কোনো তরল শিরাপথে গ্রহণ করা যাবে না। চিকিৎসার প্রয়োজনে অক্সিজেন কিংবা চেতনানাশক গ্যাস নিলে রোজা নষ্ট হবে না। ক্রিম, মলম ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার ইত্যাদি ব্যবহার করলে এবং এসব উপাদান ত্বকের গভীরে প্রবেশ করলেও কোনো সমস্যা হবে না। রোজা রেখে দাঁত তোলা, দাঁতের ফিলিং করানো ও ড্রিল ব্যবহার করা যাবে। রোজা রেখে রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা দেয়া যাবে। রক্তদান বা রক্ত গ্রহণ করতেও বাধা নেই। চিকিৎসার জন্য যোনিপথে ট্যাবলেট কিংবা পায়ুপথে সাপোজিটরি ব্যবহারে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। হার্ট কিংবা অন্য কোনো অঙ্গের এনজিওগ্রাফি করার জন্য রোগ নির্ণায়ক দ্রবণ শরীরে প্রবেশ করানো যাবে। রোগ নির্ণয়ের জন্য এন্ডোসকোপি বা গ্যাস্ট্রোস্কোপি করা যাবে। তবে এসব পরীক্ষার সময় শরীরের ভেতরে খাদ্যগুণ সম্পন্ন কোনো তরল বা অন্য কিছু প্রবেশ করানো যাবে না। রোজা পালনরত অবস্থায় মাউথওয়াশ, মুখের স্প্রে না গিলে ব্যবহার করা যাবে এবং গড়গড়া করা যাবে। রোজা রেখে বায়োপসি ও ডায়ালাইসিস করা যাবে।

তথ্য সূত্রঃ বিট্রিশ মেডিকেল জার্নাল।

যখন অনেক ওষুধ খেতে হয়/পলি ফার্মেসি

অসুখ-বিসুখ সারাতে অনেকে নানা রকম ওষুধ খান। আবার কেউ একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করেন। এতে কখনো বিপত্তি হতে পারে। তার একটা হচ্ছে ওষুধে-ওষুধে প্রতিক্রিয়া বা ড্রাগ ইন্টারেকশন। বেশির ভাগ ওষুধের বিপাক যকৃতে এবং নিষ্কাশন কিডনি দিয়ে হয়ে থাকে। কখনো কোনো একটি ওষুধ অন্য ওষুধের বিপাকক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে বা অন্য ওষুধের কার্যকারিতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। একে বলে ড্রাগ ইন্টারেকশন। একই সঙ্গে রক্তে চর্বি কমানোর ওষুধ ও ছত্রাকরোধী ওষুধ খেলে চর্বির ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেড়ে যেতে পারে। আবার হৃদ্‌রোগের ওষুধ ডিগোক্সিনের সঙ্গে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক আছে যা না খাওয়াই ভালো। থাইরয়েডের ওষুধের সঙ্গে অন্য কিছ ওষুধ একসঙ্গে খেলে ওষুধটির শোষণ কমে যেতে পারে।

১. হয়তো আপনি একেকটি রোগের কারণে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে থাকেন। একজন চিকিৎসক যে ওষুধ দিয়েছেন, অন্যজন তা না জেনেই আরেকটি ওষুধ দিচ্ছেন। তাই নিয়মিত বা এই মুহূর্তে কী কী ওষুধ খান, কোনো চিকিৎসকের কাছে গেলে সেটা তাঁকে অবশ্যই জানাবেন।

২. নিয়মিত ওষুধ একটি ব্যবস্থাপত্রে থাকাই ভালো। আলাদা আলাদা অনেক ব্যবস্থাপত্র নিয়ে ওষুধ কিনতে গেলে দোকানদার বিভ্রান্ত হতে পারেন।

৩. অনেক সময় ওষুধের দোকান থেকে ওষুধের ব্র্যান্ড পাল্টানো হয় বা একটি ব্র্যান্ড না থাকলে আরেকটি দেয়া হয়। সে ক্ষেত্রে বিষয়টি পরবর্তী সময়ে চিকিৎসককে জানাবেন ও নিজে ওষুধের জেনেরিক নামটি পরীক্ষা করে দেখবেন।

৪. চিকিৎসকে পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে কোনে ওষুধ কিনে খাবেন না। আপনি হয়তো জানেন না সাধারণ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বড়িও অন্য ওষুধের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘাটাতে পারে। মহিলারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি সেবন করলে অবশ্যই চিকিৎসককে জানাবেন। কেননা এটি বিভিন্ন ওষুধের বিপাকক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে।

৫. নিজের নিয়মিত ওষুধগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখুন। কী কারণে কোন ওষুধটি কখন কী মাত্রায় খান- তা নিজে স্পষ্ট ধারনা রাখবেন, যাতে জরুরি অবস্থায় বা অসুস্থতায় বলতে ভুল না হয়।

ভিটামিন

মাঝবয়সী ও বেশি বয়সী নারীদের অনেকেই ভিটামিন বড়ি নিয়মিত সেবন করেন। দুনিয়া জুড়ে ওষুধের দোকানে অনেকেই ভিটামিনের কৌটার ক্রেতা। কিন্তু আদৌ কি তারা সবাই ভিটামিনের অভাবে ভুগছেন?

- গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন নারীদের আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ফলিক অ্যাসিডের চাহিদা বেড়ে যায়। এ সময় ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট প্রায় সবাইকেই খেতে বলা হয়। এতে কোনো সমস্যা নেই।
- মেনোপজের পর নারীদের হাড় ক্ষয় বা অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। এ সময় তাদের দৈনিক ১ হাজার ২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ও ৮০০ ইউনিট ভিটামিন ডি খাওয়া উচিত। তবে সেটা সাধারণ খাবারের মাধ্যমেও খাওয়া যেতে পারে। যদি এমন হয় যে খাবারে ঘাটতি পূরণ হচ্ছে না, তবে চিকিৎসকের পরামর্শে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম সেবন করা যেতে পারে।
- এমনিতে প্রতিদিন তাজা শাক-সবজি, ফলমূল ও দুধ খেলে একজন সুস্থ নারীর আর আলাদা করে ভিটামিন খাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে কিছু উপসর্গ মাঝে মাঝে সাময়িক ভিটামিনের ঘাটতি নির্দেশ করে। যেমন ঠোঁটে-জিভে ঘা, ঠোঁটের কোণে ঘা, জিভ লালচে ও চকচকে দেখানো, অনেক চুল পড়া ও ত্বক খসখসে হয়ে পড়া, মাংসপেশিতে কামড়ানো অভাবজনিত কারণে হচ্ছে কি না, তা যাচাই করতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- মাসিকের সঙ্গে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, পাইলসের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক-আলসারের কারণে নারীদের রক্তশূন্যতা হতে পারে। হজমের নিয়মিত গোলমালেও অন্ত্রে ভিটামিন শোষণ বাধা পায় ও ভিটামিনের ঘাটতি হয়। এসব ক্ষেত্রে দূর্বলতা, ক্লান্তি, মাথা হালকা বোধ হওয়ার কারণ লৌহের বা অন্যান্য ভিটামিনের অভাব কি না পরীক্ষা করা উচিত। প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট বা পরিপূরক খাবারও নেয়া যায়।

গলা শুকানো মানে ডায়াবেটিস নয়

বারবার মুখ ও গলা শুকিয়ে এলে অনেকে ভাবতে শুরু করেন ডায়াবেটিস হয়েছে। কিন্তু ডায়াবেটিস ছাড়াও নানা কারণে এমন সমস্যা হতে পারে। গরমের সময় আমরা ত্বকের মাধ্যমে প্রচুর পানি হারাই, তাই শরীরে দ্রুত পানিশূন্যতা দেখা দেয়। তখন মস্তিষ্কের বিশেষ অংশ সক্রিয় হয়ে ওঠে, পিপাসা পায়। মুখ-জিভ-গলা শুকিয়ে আসে। প্রচুর পিপাসা লাগে। এটা স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া। তাই খুব গরমে বা ঘাম হলে মুখে-জিভ-গলা শুকিয়ে আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কারও যদি এই শুষ্কতা বাড়াবাড়ি রকমের দেখা দেয়, যথেষ্ট পানি পান করার পরও মুখ বারবার শুকায়, তাহলে প্রথমেই লক্ষ্য করুন আপনি কোনো ওষুধ খাচ্ছেন কি না। খুবই সাধারণ কিছু ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় মুখ ও গলা শুকায়। যেমন: অ্যান্টিহিস্টামিন বা অ্যালার্জির ওষুধ এবং সর্দিকাশি ডায়ারিয়া বা স্মৃতিভ্রম রোগে ব্যবহৃত ওষুধ। বারবার তৃষ্ণা পেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়েছে কি না অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত। দাঁত ও মুখগহ্বরের সাধারণ কিছু সমস্যায় মুখ শুকাতে পারে। যেমন: দাঁত ক্ষয়, মাড়ির প্রদাহ। যাঁদের নাক বন্ধ থাকে ও সব সময় মুখ দিয়ে শ্বাস নেন, তাঁদেরও মুখ বারবার শুকিয়ে যায়। পক্ষাঘাতের পর রোগীর এই সমস্যা হতে পারে। লালাগ্রন্থি আক্রান্ত হয়, এমন কিছু রোগ, মুখমণ্ডলে রেডিও বা কেমোথেরাপির পর মুখ শুকানোর সমস্যা হতে পারে। অতি উদ্বেগ বা মানসিক চাপের রোগীদেরও মুখ শুকায়। মোটা মানুষের ঘুমের সময় নাক নয়, মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়- মুখ শুকায়।

মুখের শুষ্কতার প্রতিকারের জন্য পরামর্শ :

- মুখগহ্বরের সুস্থতার জন্য দিনে অন্তত দুবার ফ্লুরাইডযুক্ত টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করবেন। ডেন্টাল ফ্লস ব্যবহার করবেন।
- সুগার ফ্রী ক্যান্ডি বা চুইংগাম চিবাতে পারেন। এতে লালা নিঃসরন বাড়ে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করুন।
- যাঁদের মুখ শুকায়, তারা কফি পান করবেন না। ধূমপানও না।
- শুকনো খাবার যেমন : ক্র্যাকার্স, টোস্ট, শুকনা রুটি, মুড়ি-চিড়া ইত্যাদি খেলে মুখের শুষ্কতা বাড়বে। একট আর্দ্র ও নরম খাবার বেছে নিন।
- নাক বন্ধ থাকলে তার চিকিৎসা করুন।

কিডনি রোগ প্রতিরোধের উপায়

কিডনির রোগ যেমন জটিল তেমনি এর চিকিৎসাও ব্যয়বহুল। দীর্ঘমেয়াদি কিডনি অকার্যকারিতায় শেষ অবধি ডায়ালাইসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপন ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আমাদের দেশে এই দুটো চিকিৎসাই সাধারণের সামর্থ্য ও আয়ত্তের বাইরে। কিডনি কেবল শরীরের রক্ত শোধন বা বর্জ্য নিষ্কাশনই করে না; রক্তকণিকা তৈরি, হাড়ের সুস্থতা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, পানি ও লবণের ভারসাম্য রক্ষাসহ আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। তাই কিডনি নষ্ট হয়ে গেলে এই সবকিছু ওপরই প্রভাব পড়ে। কিডনি বিকল হওয়ার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ, প্রদাহ বা গ্লোমেরুলোনেফ্রোটিস-যা ছোটদেরও হতে পারে, পাথর, ক্যানসার ইত্যাদি, তার সঙ্গে নানা ওষুধ ও রাসায়নিকের বিষক্রিয়া। একট সচেতন থাকলেই আমরা এসব থেকে দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোড প্রতিরোধ করতে পারি। এক. অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ কিডনি বিকল করে। পরিবারে যাদের বয়স ৪০ পেরিয়েছে, তারা নিয়মিত রক্তচাপ মাপুন, বেশি থাকলে ওষুধ গ্রহণ করুন। পাতে লবণ একেবারেই নিষেধ। রক্তচাপ একটু বেশি থাকলে কিছু হয় না বা সমস্যা না হলে ওষুধ খাবার দরকার নেই- এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসুন। বয়স্করা অনেক সময় ওষুধ খেতে ভুলে যান, বা রক্তচাপ বাড়লেও বুঝতে পারেন না। তাঁদের দিকে বিশেষ নজর দিন। দুই. বাংলাদেশে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস কিডনি বিকল হওয়ার প্রধানতম কারণ। রক্তে শর্করা কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নিচে রাখতেই হবে। নিয়মিত রক্তের শর্করা মাপুন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। যাঁদের ডায়াবেটিস আছে, তারা বছরে অন্তত এক বা দুবার কিডনি পরীক্ষা করাবেন। মনে রাখবেন, ডায়াবেটিস যে কারও হতে পারে। যে কোন বয়সে যে কোন সময় হতে পারে। তিন. স্থুলতার সঙ্গেও কিডনি রোগের সম্পর্ক আছে। এ বছরের (২০১৭) কিডনি দিবসের প্রতিপাদ্যই ছিল অধিক ওজন ও কিডনি রোগ। দেখা গেছে কিডনিতে পাথর, ক্যানসার ও দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগের সঙ্গে স্থুলতা জড়িত। এ ছাড়া ওজন বাড়লে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে ঝুঁকিও বাড়ে। তাই নিয়মিত ব্যায়াম করুন। ওজন কমান। এতে অন্যান্য রোগের মতো কিডনি রোগের ঝুঁকিও কমবে। চার. যখন-তখন ইচ্ছে হলেই দোকান থেকে কিনে ওষুধ খাবেন না। অনেক ওষুধ আছে যা কিডনির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। অনেক ওষুধ মাত্রাতিরিক্ত হলে কিডনির সমস্যা হতে পারে। বনাজি, হারবাল ওষুধ, অতিরিক্ত ভিটামিন ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টও ক্ষতিকর হতে পারে। শিশুদের যেকোনো ওষুধে খুবই সাবধানতা জরুরি। মাত্রার একট এদিক-ওদিক হতে পারে বিরাট বিপত্তি। তাই সাবধান, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ কখনো নয়। পাঁচ. ধূমপান কিডনিতে রক্ত চলাচল ব্যহত করে। এ ছাড়া কিডনি ক্যানসারেরও ঝুঁকি বাড়ায়। ধূমপান একেবারেই বর্জন করুন। শিশুর ও নারীরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন। সবার সুরক্ষার জন্যই ধূমপান ছাড়াটা জরুরি। ছয়.পরিবারে সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। প্রচুর শাক-সবজি, ফলমূল খেতে হবে। লাল মাংস কম খান। পানি বেশি খেলে কিডনি ভালো থাকবে এমন কোনো কথা

নেই। তবে আবহাওয়া অনুযায়ী যথেষ্ট পানি পান করুন। শিশুরা স্কুলে ঠিকমতো পানি পান করে কি না খেয়াল করুন। প্রস্রাব আটকে রাখা খারাপ। প্রস্রাবে সংক্রমণ এড়াতে ব্যক্তিগত ও টয়লেটের পরিচ্ছন্নাতার দিকে নজর দিন। সাত. বয়স বাড়লে, বিশেষত উক্ত রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস থাকলে, প্রতিবছর নিয়ম করে কিডনির সুস্থতা জানতে প্রস্রাবে আমিষ ও প্রয়োজনে অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান। কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলে সতর্ক হোন। ছোটদেরও কিডনিতে প্রদাহ হয়। প্রস্রাব কম হওয়া, লাল হওয়া ও শরীরে পানি জমা এর লক্ষণ। এমন হলে চিকিৎসা নিতে দেরি করবেন না।

বাড়তি লবণ খারাপ

আমরা প্রায়ই রোগীদের বলে থাকি বাড়তি লবণ খাবেন না। কাথাটার অর্থ আসলে কী?

- লবণ আর সোডিয়াম এক কথা নয়। রান্নায় ব্যবহৃত লবণ হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড। লবণের ৪০ শতাংশ জুড়ে থাকে সোডিয়াম। তাই এক চামচ লবণ মানেই কিন্তু এক চামচ সোডিয়াম নয়। আমাদের কম খেতে হবে সোডিয়াম। বিশেষ করে, যাদের উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, কিডনি ও যকৃতের সমস্যা ইত্যাদি আছে।
- বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গ্রুপ যে নির্দেশনা দিয়েছে, তাতে দৈনিক ১৫০০ থেকে ২৩০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম খাওয়া যাবে। মানে ১৫০০ মিলিগ্রামের কম হলে তো খুবই ভালো, তবে ২৩০০ মিলিগ্রামের ওপরে কখনোই নয়। তো ১৫০০ মিলিগ্রামে সোডিয়াম আছে ৩ দশমিক ৭৫ গ্রাম পরিমাণ লবণ, মানে পৌনে এক চামচ লবণে। ২৩০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম খেতে হলে ৬ গ্রাম পরিমাণ লবণ খেতে হবে, অর্থাৎ এক চামচ। তার মানে দাঁড়াল, সারা দিনে এক চামচ পরিমাণের বেশি লবণ খাওয়া যাবে না।
- গড়পড়তা আমরা দৈনিক ৩০০০ থেকে ৩৫০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম খেয়ে ফেলি। এর একটা বড় অংশ আসে প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে। কেননা খাবার সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় এতে প্রচুর লবণ যোগ করা হয়। এ ছাড়া লবণ মূলত যোগ করা হয় খাবারে স্বাদ বাড়াতে। আর কেউ কেউ তো পাতে- এরপরও আলাদা লবণ নিয়ে খান।
- বেকিং সোডা ব্যবহৃত হয় এমন খাবার (যেমন পাউরুটি বা ব্রেড, বেকারির বিভিন্ন খাবার), বিস্কুট, প্রক্রিয়াজাত মাংস (যেমন সসেজ, নাগেট), যেকোনো টিনের বা সংরক্ষিত খাবার (যেমন আচার, পনির), সস বা সয়াসসে ভেজানো খাবার যা পরে পরিবেশন করা হয় (যেমন চিকেন ফ্রাই ও অন্যান্য ফাস্টফুড), ইনস্ট্যান্ট নুডলস ও পাস্তা, লবণ মাখানো চানাচুর, বাদাম ইত্যাদি বাড়তি

লবণের বড় উৎস। দেখা যায়, আমরা রান্নায় লবণ কমিয়েছি ঠিকই, কিন্তু কেনা খাবারে অনেক লবণ রয়ে গেছে, সেটা খেয়াল করছি না।

- কখনো আমরা নিজের অজান্তেই খাবারে লবণ যোগ করে ফেলি অভ্যাসবশত। যেমন সালাদ তৈরির সময় বা কাঁচা ফল খাওয়ার সময়। ওটা হিসাবের মধ্যেই ধরি না। আসলে এতখানি মেপে তো আর প্রতিদিন রান্না করা যাবে না। তাই চিকিৎসক যদি লবণ কম খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তবে তিনটি কাজ করবেন: এক. আলগা লবণ একেবারেই খাবেন না, দুই. রান্নায় আগের চেয়ে একট কম লবণ দিন আর তিন. ওপরে উল্লেখিত অতি লবণাক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।

ম্যাসাজে কি ওজন কমে?

শরীরের ওজন বা মেদ বাড়ার প্রধান কারণ, ক্যালরি গ্রহণ ও ক্যালরি খরচে অসামঞ্জস্য। আমরা যদি খরচের তুলনায় বেশি ক্যালরি গ্রহণ করে ফেলি, তা বাড়তি মেদ হিসেবে শরীরে জমা হবে। তাই মেদ বা ওজন কমানোর পূর্বশর্ত হলো ক্যালরি গ্রহণ কমাতে হবে, সেই সঙ্গে ক্যালরি খরচ বাড়াতে হবে। আপনি যদি প্রতিদিনের চাহিদার তুলনায় ৫০০ ক্যালরি কম গ্রহণ করেন বা বেশি খরচ করতে পারেন, তবে প্রতি সপ্তাহে এক পাউন্ড করে ওজন কমতে শুরু করবে। বডি ম্যাসাজ বা বেল্ট পরে এটা সম্ভব নয়। অনেক সময় এসব পদ্ধতির মাধ্যমে শরীরের কোনো জায়গায় রক্ত চলাচল বাড়ানো, লসিকার মাধ্যমে বাড়তি জলীয় ভাবটা সরানো যায়, যার ফলে আকৃতি বা শেপ পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু এতে সামগ্রিক চর্বির পরিমাণে কোনো প্রভাব পড়ে না। এটা ঠিক যে বিভিন্ন ধরনের ম্যাসাজ বা থেরাপিতে শিথিলায়ন হয়, মানসিক চাপ কমে মাংসপেশি ও অস্থিসন্ধির নমনীয়তা বাড়ে, প্রচুর এনডোরফিন নিঃসৃত হয় বলে শরীর-মন ভালো থাকে। কিন্তু ওজন কমানো ভিন্ন জিনিস। এ জন্য খাদ্যাভ্যাস পাল্টানো ও শারীরিক ব্যায়াম করার কোনো বিকল্প নেই।

চল্লিশের কোঠায় বয়স

চল্লিশের কোঠায় পা মানে আপনি জীবনের এক নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছেন। এই বয়সে পেশাজীবন, সংসার, সাফল্য তুঙ্গে। তারুণ্যের ছটফটানির দিন শেষ, আপনি স্থির হয়েছেন। গুছিয়ে এনেছেন সবকিছু, আর ঠিক এই সময়ই আকস্মিক হৃদ্‌রোগ, উচ্চরক্তচাপ বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (স্ট্রোক) সবকিছু এলোমেলো করে দিতে পারে। বয়স ৪০ পেরোনোর পর থেকেই হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়তে থাকে। তাই এটা সাবধানতার সময়, নিজের দিকে আলাদা করে নজর দেয়ার সময়।

১. খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনুন। তেল-চর্বিযুক্ত খাবার, ফাস্টফুড, গরু-খাসির মাংস, কলিজা, মগজ, কেক-পেস্ট্রি, কোমল পানীয় ইত্যাদির পরিমাণ সীমিত রাখুন। তাজা শাক-সবজি, ফলমূল, লাল চাল বা লাল আটার তৈরি খাবার, ভূট্টা-যব এবং সালাদ বেশি করে খান। লবণ খাওয়াও কমিয়ে দিন।

২. এতদিন সময় পাননি, এবার হাঁটতে শুরু করুন। বেশি না, প্রতিদিন ৩০ মিনিটই যথেষ্ট। অথবা সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট। হাঁটাহাটি ছাড়াও সাঁতার সাইকেল চালনা, খেলাধুলা করতে পারেন। মোটকথা, এবার নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস করুন, তাহলেই সুস্থ-সচল থাকতে পারবেন।

৩. ধূমপান ছাড়ার সিদ্ধান্তটা শুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। মনের জোর থাকলে নিশ্চয়ই পারবেন। পাশাপাশি তামাক, গুল, জর্দা ইত্যাদি সেবনের অভ্যাসও পুরোপুরি বাদ দিন।

৪. পরিবারে হৃদ্‌রোগের ইতিহাস সন্ধান করুন। বাবা-মা, ভাইবোন বা র-ক্ত সম্পর্কের কারও মধ্যে ৫৫ বছরের কম বয়সী পুরুষ বা ৬৫ বছরের কম বয়সী নারীদের হৃদ্‌রোগ বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকলে সতর্ক হোন।

৫. নিজের ওজন সম্পর্কে সচেতন হোন। উচ্চতা অনুযায়ী ওজন বজায় রাখুন। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা জরুরি। রক্তে শর্করা ও চর্বির মাত্রা দেখে নিন। রক্তচাপ মাপুন। সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হেলা করবেন না।

৬. রাত জাগার অভ্যাস ছাড়ুন। হৃদ্‌রোগ এড়াতে সাত-আট ঘণ্টার নিরবচ্ছিন্ন ঘুম জরুরি। বিছানায় যাওয়ার আগে রাত জেগে মোবাইল, ফেসবুক, কম্পিউটার বা গেমস নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়। রাতের খাওয়া নয়টার মধ্যে সেরে নিন।

৭. মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা কমান। বন্ধু-বান্ধব, পরিবার ও স্বজনের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটান। ভালো শখের পরিচর্যা করুন। মাঝেমধ্যে কাজে বিরতি নিয়ে বেড়িয়ে আসুন।

মাথাব্যথা, নাক বন্ধ, জ্বর জ্বর

ঠাণ্ডা-গরমের তারতম্যে, সর্দি-কাশিতে, বৃষ্টিতে ভেজা বা গরমে ঘামা- এসব পরিস্থিতি সাইনোসাইটিসের রোগীদের জন্য কষ্টকর বটে। এই সময়ে তাদের অসুখ বেড়ে যায়। সাইনাস হলো মাথার খুলির হাড়ের মধ্যে অবস্থিত কিছু ফাঁকা জায়গা। চোখের পেছনে, নাকের হাড়ের দুই পাশে এ রকম ফাঁকা জায়গা আছে। এই ফাঁকা জায়গায় সর্দি জমে সাইনোসাইটিস বা প্রদাহ হয়। এতে বাতাস আটকে যায় এবং মাথা ব্যথা করে। এই মাথাব্যথা সাধারণত কপালে বা গালের দুদিকে কিংবা চোখের পেছনে অনুভূত হয়। সকালের দিকেই শুরু হয় এবং একট নিচ হলে ব্যথা বাড়ে। ওপরের পাটির দাঁতেও ব্যথা হতে পারে। সঙ্গে জ্বর জ্বর ভাব বা শীত শীত অনুভূত হতে পারে। মাথা ব্যথার কারণ খুঁজতে গিয়ে সাইনোসাইটিস পাওয়া যায়। এই সময়ে বন্ধ নাক, সর্দি, জ্বরের সঙ্গে মাথাব্যথা হলে সাইনোসাইটিসে ভুগছেন কি না লক্ষ করুন। এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে কিছু পরামর্শ:

- নাকে স্যালাইন স্প্রে বা ড্রপ দিলে জমে থাকা মিউকাস বা আঠালো পদার্থ নরম হয়ে আসবে এবং সাইনাসের ফোলা বা ব্লক কিছুটা হলেও দূর হবে।
- আর্দ্র ও গরম বাতাস বন্ধ সাইনাস খুলে নিতে সহায়ক। রাতে ঘুমানোর আগে খানিকটা বাষ্প নিলে রাতে আরাম পাবেন। গরম পানি দিয়ে গোসল করে বাথরুমে কিছুটা সময় কাটান। অথবা গামলায় গরম পানি নিয়ে বাষ্প নাক দিয়ে টেনে নিন।
- খুব মাথাব্যথা করলে এক টুকরো কাপড় গরম পানিতে ভিজিয়ে কপাল, চোখের ওপর বা নাকের দুপাশে সেঁক দিন। এতেও সাইনাসের বদ্ধতা কাটবে এবং আরাম পাবেন।
- সব সময় অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে তা নয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না। তবে মাথাব্যথা বেশি হলে প্যারাসিটামল খেতে পারেন।

ফল ও ভিটামিন সি

ভিটামিন সি-এর ভালো উৎস হলো নানা ধরনের ফল। বিশেষ করে টক ফল। গবেষকেরা বলেন, একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর প্রতিদিন ৭৫ মিলিগ্রাম, পূর্ণবয়স্ক পুরুষের ৯০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি খাওয়া উচিত। গর্ভবতীদের ৮৫-৮০ মি.গ্রা.।

কমলা : একটা কমলায় প্রায় ৭০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি আছে। গোটা কমলা বা কমলার রস ভিটামিন সি-এর চমৎকার উৎস। কমলার মতো অন্যান্য ফল, যেমন মাল্টা বা জাম্বুরায়ও ভিটামিন সি অনেক। ১০০ গ্রাম মাল্টায় আছে ৩২ মিলিগ্রাম এবং ১০০ মিলিগ্রাম জাম্বুরায় আছে ৬১ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি।

পেঁপে : পাকা পেঁপেতে আছে বেশি পরিমাণে ভিটামিন সি। প্রতি ১০০ গ্রাম পেঁপেতে ৬০ মিলিগ্রামের মতো ভিটামিন সি পাবেন।

পেয়ারা : পেয়ারা ভিটামিন সি-এর সবচেয়ে ভালো উৎস। একটা গোটা পেয়ারায় (৫৫ গ্রাম ওজনের) ১২৫ মিলিগ্রাম ভিটামিস সি পাওয়া যায়।

আনারস : আনারসের প্রতি ১০০ গ্রাম পরিমাণে ভিটামিন সি-এর পরিমাণ ৪৭ মিলিগ্রামের মতো।

লেবু : দেশি সবুজ লেবুতেও ভিটামিন সি অনেক। ১০০ গ্রাম লেবুতে ৫৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাবেন।

ভিটামিন ডি

বহু মানুষ ভিটামিন 'ডি'র অভাবে ভুগছে। একাধিক গবেষণা অনুযায়ী, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের এ সমস্যা আছে। সূর্যের অতিবেগুনি UVB রশ্মি ভিটামিন 'ডি'র উৎস। সূর্য যখন প্রখর থাকে, তখনই অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছায়। কাচ, ঘন মেঘ, কাপড়চোপড়, ধুঁয়া ও সানস্ক্রিন এই রশ্মিকে বাধা দেয়। তাই দু-একবার বাইরে বেরোলেই আপনার শরীর ভিটামিন 'ডি' পাবে না।

সময় : আলোয় বেরিয়ে যখন দেখবেন আপনার ছায়া আপনার তুলনায় ছোট, তখনই সেই আলোতে আপনার ত্বক সবচেয়ে বেশি ভিটামিন 'ডি' তৈরি করতে পারবে (১১টা - ৩টা)।

মেলানিন : যারা কালো, তাদের ত্বকে মেলানিন নামের রঞ্জক উপাদান বেশি। আর যারা ফরসা, তাদের ত্বকে এই উপাদান কম থাকে। মেলানিন অতিবেগুনি রশ্মিকে বাধা দেয়। ফরসা লোকজনের প্রতিদিন ২০ মিনিট রোদে থাকলেই চলে।

কাচ : অতিবেগুনি রশ্মি কাচ ভেদ করতে পারে না। তাই গাড়ি বা ঘরের ভেতর জানালা বন্ধ অবস্থায় রোদ এলেও লাভ নেই, পর্যন্ত ভিটামিন 'ডি' মিলবে না।

পোশাক ও সানস্ক্রিন : এগুলোও ত্বকে সরাসরি ভিটামিন 'ডি' লাগতে বাধা দেয়। তাই আপাদমস্তক ঢেকে বেরোলে চলবে না। অন্তত হাত-পা বা মুখের কিছু অংশ খোলা রাখুন। মাঝেমধ্যে সানস্ক্রিন ছাড়াই রোদে বোরোতে হবে।

বার্ধক্য : বয়স বাড়তে থাকলে ত্বকের ভিটামিন 'ডি' তৈরি করার ক্ষমতা কমতে থাকে। আর বয়স্কদেরই কিন্তু হাড় ক্ষয়ের সমস্যা বেশি। তাই বয়স হয়েছে বলেই সারা দিন বাড়ি বসে থাকা ঠিক নয়। নিয়মিত বেরোন এবং গায়ে রোদ লাগান।

বায়দূষণ ও আবহাওয়া : দূষিত বায়ু, ধোঁয়া ইত্যাদি অতিবেগুনি রশ্মিকে শুষে নেয় বা প্রতিফলিত করে। তাই দূষিত শহরে থাকলে মাঝেমধ্যে একট দূরের গ্রামে বা আউটিংয়ে যাওয়া উচিত।

ডেঙ্গু, না চিকুনগুনিয়া?

বর্ষায় কয়েক বছর ধরে ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়মিত দেখা যাচ্ছে। ইদানীং এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন ভাইরাস জ্বর- চিকুনগুনিয়া। এই দুই ধরনের ভাইরাস প্রায় একই সময়ে দেখা দেয়। এদের জীবাণুবাহী মশাও একই প্রজাতির, এডিস। রোগের লক্ষণ ও উপসর্গেও নানা মিল আছে।

কিছু তফাত আছে : ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া দুটোই ভাইরাস জ্বর। পাশাপাশি থাকে তীব্র শরীর ব্যথা। তবে পার্থক্য হলো, ডেঙ্গুজ্বরে চোখ ও মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হয়, মাংসপেশি ও হাড়ে ব্যথাও হয়। তবে গিরা তেমন ফুলে না বা ব্যথাও কম থাকে। কিন্তু চিকুনগুনিয়ার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে গিরায় ব্যথা। আফ্রিকার আঞ্চলিক ভাষায় এই চিকুনগুনিয়ার মানে বাঁকা হয়ে যাওয়া। কেউ বলেন ল্যাংড়া জ্বর। কারণ এতে আক্রান্ত রোগীর ঘাড়, পিঠ, মাজায় এত তীব্র ব্যথা হয় যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হয়। তখন কেউ কেউ খুঁড়িয়ে হাঁটতে বাধ্য হন। সাধারণত: চিকুনগুনিয়ায় জ্বর, ত্বকে র‍্যাশ, সন্ধি বা হাড়ের জোড়ায় ব্যথা ও গায়ে ব্যথা করে। এর চেয়ে তীব্র হলে সন্ধি ফুলে যায়, রক্তচাপ ও প্রস্রাব হ্রাস প্রভৃতি সমস্যা হতে পারে। রোগটি সবচেয়ে জটিল রূপ নিলে উচ্চমাত্রার জ্বর, সন্ধি ব্যথা ও ফোলা, বমি এবং ডায়রিয়ায় (রোগী) অচেতনও হয়ে যেতে পারে। তবে চিকুনগুনিয়ায় ডেঙ্গুর চেয়ে মৃত্যুঝুঁকি কিছুটা কম। ডেঙ্গ সাধারণত ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সেরে যায়। তবে চিকুনগুনিয়ার রোগী ৭ থেকে ১০ দিনে সেরে উঠলেও ব্যথা কিছ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এমনকি জ্বরটা সেরে গিয়ে আবারও হতে পারে।

কী করবেন?

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা প্রায় একই রকমের। ডেঙ্গু এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন বা ডেঙ্গ আইজিএম অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করে রোগনির্ণয় করতে হয়। তার আগ পর্যন্ত চিকিৎসার কোনো হেরফের নেই। সমস্যা তীব্র না হলে বাড়িতেই থাকুন।

প্রচুর পরিমাণে পানি ও তরল খাবার পান করুন (দিনে তিন লিটার, সঙ্গে লবণ-জল, ডাবের পানি, স্যালাইন ইত্যাদি)। জ্বর ও ব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল খেতে পারেন। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। সন্ধি ব্যথা কমাতে ঠাণ্ডা ছ্যাঁক নিতে পারেন, হালকা ব্যায়াম করা যায়। রোগ নির্ণয়ের আগেই অ্যাসপিরিন বা অন্য ব্যথানাশক সেবন করা যাবে না। প্যারাসিটামল খেতে পারেন।

কখন হাসপাতালে যাবেন?

এমনিতে চিকুনগুনিয়া ডেঙ্গুর মতো জটিল না হলেও ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি বা ছোট শিশু, অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং কিডনি, যকৃৎ বা হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ঝুঁকি থাকে। ডেঙ্গুতে রক্তচাপ কমে গেলে বা প্রস্রাবের পরিমাণ দিনে ৫০০ মিলিলিটারের কম হলে তিন দিন বাড়িতে চিকিৎসার পরও ব্যথা তীব্র রয়ে গেলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শিরায় স্যালাইন দিতে হতে পারে। চিকুনগুনিয়া রোগ শনাক্ত করতে পিসিআর, কালচার বা অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করা যেতে পারে। উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এ রোগে কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয় না, এটি বাতরোগও নয়। মশা নিধন ছাড়া ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়ার মতো রোগ থেকে নগরবাসীর রেহাই নেই।

ঘাম যখন বেশি

ঘাম কিন্তু স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। ঘামের মাধ্যমে শরীর বাড়তি তাপ হারিয়ে শীতল হয়। তাই ঘাম উপকারী। তবে কারও কারও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বা সামান্য পরিশ্রমেও অতিরিক্ত ঘাম হতে দেখা যায়। মানসিক উত্তেজনা, রাগ, ভয়, উদ্বেগের কারণে ঘাম বেড়ে যেতে পারে। অতি উদ্বেগের রোগীদের হাত-পায়ের তালু বেশি ঘামে। রাতে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘেমে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে প্রতি রাতে ঘুমের মধ্যে ঘেমে বিছানা ভিজে যাওয়া, জ্বর জ্বর ভাব, গা ম্যাজম্যাজ থাকলে সাবধান হওয়া উচিত। যক্ষ্মা বা লসিকাগ্রন্থির ক্যানসারে রাতে ঘাম হয়। ডায়াবেটিস রোগীরা হঠাৎ বিন্দু বিন্দু শীতল ঘামে ঘেমে উঠলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে শর্করা কমে গেছে কি না সতর্ক হোন। এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে বুক ধড়ফড়, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, হাত কাঁপুনি থাকতে পারে। এমনটি হলে দ্রুত সহজ শর্করা যেমন চিনির শরবত খেয়ে নিলে সমস্যা মিটে যাবে।

দীর্ঘমেয়াদি ডায়াবেটিসের রোগীদের স্নায়ুজনতি সমস্যা হলে খাবার সময় বা পরে মাথা, কপাল, ঘাড় বেশি ঘামতে পারে। ঘামের সঙ্গে মাঝে মাঝে বুকব্যথা, বুকে চাপ ধরার মতো সমস্যা হলে অবশ্যই হৃদ্‌রোগ আছে কি না নিশ্চিত হওয়া চাই। আবার থাইরয়েডগ্রন্থির সমস্যায় বেশি ঘাম হয়, তবে এর সঙ্গে ওজন হ্রাস, ডায়রিয়া, বুক ধড়ফড় ইত্যাদি আরও উপসর্গ থাকে। নারীদের মেনোপজ-পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত ঘামতে দেখা যায়। একে

হটফ্লাশ বলা হয়। হটফ্লাশের সুচিকিৎসা আছে, তাই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। অনেক সময় কিছু ওষুধের প্রভাবেও ঘাম হয় বেশি। কারও কারও হতে পারে কফি-চা পান করার পরও। অতিরিক্ত গরমে বা রোদে বেশি ঘেমে গেলে মাথা ঘোরে, শরীর দুর্বল লাগে, ঝিমঝিম করে। পানি ও লবণ বেরিয়ে যায় বলে এমন লাগে। তাই বেশি ঘামলে যথেষ্ট পানি, স্যালাইন পানি, ডাবের পানি পান করুন। উদ্বেগজনিত সমস্যা থাকলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হোন। পরীক্ষা বা কোনো দুশ্চিন্তায় বেশি ঘাম, হাত-পায়ের তালু ঘামা উদ্বেগের লক্ষণ। সঙ্গে বুক ধড়ফড়ানি থাকতে পারে। মনে রাখবেন থাইরয়েড সমস্যায় প্রায় একই ধরনের উপসর্গ হয়। তাই থাইরয়েড হরমোন পরীক্ষা করে নিতে পারেন। স্থূল ও আনফিট ব্যক্তিরা সহজেই অল্প পরিশ্রমে ঘেমে ওঠেন। ফিট থাকার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করুন। যারা বেশি ঘামেন তারা চা-কফি কম পান করবেন। কোনো ওষুধ থেকে হচ্ছে কি না খেয়াল করুন। জ্বর আছে কি না তাই মেপে দেখুন। শিশুরা একট বেশিই ঘামে। তাদের বেশি কাপড় পরাবেন না।

মাথার যন্ত্রণা/মাথাব্যথা

কিছু কারণে মাথা ব্যথায় নারীরাই সাধারণত বেশি আক্রান্ত হন। এসবের মধ্যে দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপজনিত মাথাব্যথা ও মাইগ্রেন অন্যতম। মানসিক চাপজনিত মাথাব্যথা হলে সাধারণত অনুভূতিটা এমন হয় যেন মাথায় বা মাথার তালুতে কিছ একটা চেপে ধরে আছ। সারা দিনের কাজের শেষে ব্যথার তীব্রতা বাড়তে থাকে। তবে ব্যস্ততার সময় মনে হয় ব্যথা যেন একট কম। এমন ব্যথা কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত থাকতে পারে; তবে মাঝখান কোনো দিনই পুরোপুরি ব্যথামক্ত হয় না। এমন ব্যথা উপশমের জন্য মানসিক চাপমক্ত থাকার চেষ্টা করুন। অনেক ক্ষেত্রে মাথাব্যথার চিন্তা থেকেই মাথ াব্যথা বাড়তে থাকে। ব্যথানাশক ওষুধ সেবনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। মাইগ্রেনের ব্যথা হয় মাথার যেকোনো একপাশে। সাধারণত মধ্য বয়সে পৌঁছানোর আগেই এ অসুখ শুরু হয়। রোগী প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পান। মাথার একপাশে দপদপ করে। বমিভাব বা বমিও হতে পারে। রোগী এ সময় আলো আওয়াজ সহ্য করতে পারেন না। তাই এ সময় তিনি অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে থাকতে পছন্দ করেন। একবার শুরু হলে ব্যথা একটানা ৪ থেকে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতে পারে কোনো কোনো রোগীর মাইগ্রেন ব্যথা শুরু হওয়ার আগে কিছু বিশেষ লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন: চোখের সামনে রূপালি আঁকাবাঁকা রেখা দেখা, হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্য দেখতে না পাওয়া, কথা বলতে অসুবিধা কিংবা শরীরের কোনো অংশ ঝিনঝিন করা বা অবশ লাগা। যেসব মাইগ্রেন রোগীর এমন লক্ষণ থাকে, তাঁদের ইস্ট্রোজেন বা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি না খাওয়াই ভালো। মাইগ্রেনের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারও কারও ক্ষেত্রে কলা, চকলেট, পনির বা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি, খেলে মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়ে, তারা নির্দিষ্ট ওই উপাদানটি এড়িয়ে চলুন। আরেক ধরনের মাথাব্যথা নারীদের হতে পারে। এ ক্ষেত্রে

ব্যথা পাশাপাশি চোখের কিছু সমস্যা হয়। যেমন: একটি জিনিসকে দুটি দেখা বা শরীরে অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক চোখে দেখতে না পাওয়া। সাধারণত স্থুল বা বেশি ওজনের নারীদের এই সমস্যা হয়। ওজন কমাতে পারলে ব্যথা উপশম হয়ে থাকে। যেকোনো মাথাব্যথার সঙ্গে জ্বর, শরীরের কোনো একপাশের দুর্বলতা বা ত্বকে ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ: শোয়া অবস্থায় ব্যথার তীব্রতা বৃদ্ধি বা ঘুম ভেঙ্গে মাথাব্যথা কিংবা যেকোনো ব্যক্তির আচমকা প্রচণ্ড মাথাব্যথা শুরু হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

নাক ডাকা বা স্নোরিং

বিড় বিড়ে বিরক্তিকর ঘর ঘর শব্দ ঘুমের মধ্য হয় ।নাক ও শ্বাস নালীতে নিশ্বাসের বাতাস বাধা প্রাপ্ত হলে শ্বাস নালীর নরম মাংস ও টিস্যুগুলো কাঁপার কারনে শব্দের উৎপত্তি হয়। নাক ডাকা খুবই স্বাভাবিক এবং সাধারন একটা ঘটনা। অধিকাংশ লোকের এমনকি বাচ্চাদেরকে এটা হতে পারে। নাক ডাকার সাথে যদি শ্বাস গ্যাপ (apnea) হয় সেটা খারাপ। কিন্তু শ্রুতিকটু উচ্চকিত নাক ডাকার প্রতিকার দরকার। স্লিপ এপনিয়া হলে –

১। উচ্চকিত নাক ডাকার সাথে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।
২। শ্বাস টেনে নেবার জন্য অস্থির হয় বা খাবি খায়।
৩। নিদ্রাহীনতায় ভুগে।
৪। ঘুম থেকে উঠে শুকানো মুখ নিয়ে গলা ব্যাথা করে।
৫। দিনের বেলার অবসাদ।
৬। দিবা নিদ্রা
৭। সকালের দিকে মাথা ব্যাথা ।
৮। উচ্চ রক্ত চাপ
৯। বংশগত হতে পারে। বয়স বাড়লে বাড়ে। শ্বাস নালীর অগ্রভাগ সঙ্কুচিত হলে- যেমন নাকের দেয়াল বাঁকা, নাকে কনজেসন, বড় টনসিল, বৃহদাকার জিহবা।
১০। ঘুমের আগে মদ খেলে বা ঘুমের ঔষধ খেলে শ্বাস নালী ঢিলা থাকে বিধায় কাঁপে।

প্রতিকারের জন্য

১। ওজন স্বাভাবিক করতে হবে।
২। ধূমপান বাদ দিতে হবে।
৩। কাত হয়ে শুতে হবে।
৪। চিত হয়ে সোয়া যাবেনা।
৫। নাকের কনজেশন পরিষ্কার করতে হবে।
৬। নাকের ছিদ্র বড় করার জন্য ব্যবস্থা করা।

স্লিপ এপনিয়া থাকলে CPAP (continuous positive air way pressure) মেশিন দিয়ে ঘুমাতে হবে। মেশিন সামান্য প্রশারে শ্বাসনালী খোলা রাখবে। শ্বাস সঠিক থাকবে। ঘুম ভাল হবে। নাক ডাকবেনা।

বুক জ্বলা

ভারী খাবার খেয়ে রসনা তৃপ্ত হলেও পরেও পরে সমস্যা দেখা দেয়। অনেকেরই বুক জ্বালা করে। আবার অসময়ে খেলেও বুক জ্বালাপোড়া করতে পারে। এ সমস্যার মূল কারণ সাধারণত অ্যাসিডিটি বা অম্লতা। অন্ননালির নিচের দিকের স্ফিংটার বা দরজা ঢিলে হয়ে পড়লে পাকস্থলীর অ্যাসিড ওপর দিকে ঠেলে ওঠে। আর সে কারণেই বুক জ্বালাপোড়া করে। কিছু খাবার এ সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে, যেমন গোলমরিচ, রসুন, কাঁচা পেঁয়াজ ও অধিক মসলাযুক্ত খাবার, বেশি তেল-চর্বিযুক্ত খাবার, কমলা, আনারস, টমেটো ইত্যাদি টক ফল বা ফলের রস ও সবজি; চকলেট, ক্যাফেইন বা কফি; পিপারমিন্ট; অ্যালকোহল প্রভৃতি। তাই এগুলো এড়িয়ে চলাই ভালো। নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেমন একবারে অনেক খেয়ে ফেলবেন না। সারা দিনে খাবার ভাগ করে খাবেন। খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়বেন না। শোয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলুন। ভরা পেটে ব্যায়াম করবেন না। বিশেষত পেটের ওপর চাপ পরে এমন ব্যায়াম। শরীরের বাড়তি ওজন কমিয়ে ফেলুন। কোনো কোনো ওষুধ বুক জ্বালার সমস্যাটা বাড়িয়ে দিতে পারে যেমন অ্যাসপিরিন। এগুলো কখন খেতে হবে, তা চিকিৎসকের কাছে জেনে নিন। সাধারণ বুক জ্বালাপোড়া এমনিতেই বা অ্যাসিডিটির ওষুধে সেরে যায়। তবে প্রায়ই বুক জ্বালা করলে এবং পাশাপাশি ওজন হ্রাস, কালো পায়খানা, মলত্যাগের স্বাভাবিক অভ্যাসের পরিবর্তন হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

মশা তাড়াতে গিয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি

প্রতিবছর মশাবাহিত রোগে লাখো মানুষ আক্রান্ত হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে প্রতি গ্রীষ্ম-বর্ষায় নিয়মিত ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিচ্ছে। ইদানীং নতুন যোগ হয়েছে চিকুনগুনিয়া। পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে গিয়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়া। মশা তাড়ানোর জন্য আমরা নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। যেমন মশার কয়েল, স্প্রে, ত্বকে লাগানের লোশন ইত্যাদি। এগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা আবার নতুন স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছি।

কয়েল : ১০০ বছর ধরে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে মশা তাড়ানোর কয়েল। এটি থেকে যে ধোঁয়া বেরোয়, তাতে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান মশা তাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু এই ধোঁয়া ফরমালডিহাইড, হাইড্রোকার্বনসহ আরও কিছু উপাদান থাকে, যেগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যর ক্ষতিকর। হাঁপানি রোগীদের জন্য এই ধোঁয়া খারাপ। শিশুদের ধারে-কাছে কয়েল না জ্বালানোই ভালো।

স্প্রে : মশা তাড়াতে ব্যবহৃত বেশির ভাগ অ্যারোসল স্প্রেতে পাইরিথোয়েড নামক রাসায়নিক উপাদান থাকে। এটা বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে মেশে ও মশা তাড়ায়। এমনিতে এর খুব ক্ষতিকর প্রভাব না থাকলেও একাধিক গবেষণায় দেখা যায়, এ ধরনের স্প্রে ব্যবহার হাঁপানি, ব্রংকাইটিস রোগীদের শ্বাসকষ্ট বাড়তে পারে, শ্বাসনালির ইরিটেশন তৈরি করে, কখনো চোখ জ্বালা করতে পারে, কারও কারও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারও অ্যালার্জি হয়, সর্দিকাশি দেখা দেয়।

ক্রিম : মাশা তাড়ানোর অধিকাংশ ক্রিম বা লোশনে ডিট নামের এক ধরনের টলঅ্যামাইড থাকে। অনেকের ত্বকে এ থেকে ফুসকড়ি র‍্যাশ, চুলকানি, অ্যালার্জি ও চোখে সমস্যা হতে পারে।

উপায় : মশার হাত থেকে বাঁচার কোনো না কোনো পদ্ধতি অবলম্বন ছাড়া উপায় নেই। তাতে খানিকটা ঝুঁকি থাকলেও মশাবাহিত জটিল অসুখ-বিসুখ থেকে তো রেহাই মিলবে।

পরামর্শ :

১. ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে স্প্রে করুন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যান। স্প্রে করার সময় এবং পরপরই ঘরে শিশুদের থাকতে দেবেন না। অন্তত দু-এক ঘণ্টা পর ঘরে প্রবেশ করুন এবং ফ্যানের হাওয়ায় ভাসমান কণাগুলোকে বেরিয়ে যেতে দিন।

২. কখনোই কাটা-ছেঁড়া বা অ্যালার্জিক ত্বকে ক্রিম লাগাবেন না। নির্দিষ্ট সময় পর ভালো করে সাবান পনি দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলবেন। মুখমণ্ডল ও চোখের কাছে লাগাবেন না।

৩. সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হলো নিজেকে ও বাড়ির পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা। মশারি টানিয়ে শোবেন। সাদা বা হালকা রঙের পোশাক পরুন।

রোজাদার ডায়াবেটিক রোগীর জন্য দুটি আদর্শ খাদ্যতালিকা

মোট ১ হাজার ৩০০ কিলোক্যালরি

ইফতার : ছোলা আধা কাপ (৮০ গ্রাম), বড় পেঁয়াজ ২টা, বেগুনি বা আলু চপ ১টা, মুড়ি ১ কাপ, খেজুর ৩টি, ফলের সালাদ আধা বাটি, রায়তা আধা কাপ।

সন্ধ্যারাত : আটার রুটি ২টা অথবা ১ কাপ ভাত বা ১ কাপ ওটস, সবজি ইচ্ছামতো, ১ টুকরো মাছ বা মাংস।

সাহ্‌রি : ভাত ২ কাপ, মাছ বা মাংস১ টুকরো, ডাল ১ কাপ বা দুধ ১ কাপ, সবজি ইচ্ছামতো।

মোট ১ হাজার ৮০০ কিলোক্যালরি

ইফতার : ছোলা ৩ কাপ (১২০ গ্রাম), পেঁয়াজ ৩টা, বেগুনি ২টা বা আলুর চপ ১টা মুড়ি ২ কাপ, খেজুর ৩টা, ফলের সালাদ ১ কাপ, রায়তা আধা কাপ।

সন্ধ্যারাত : আটার রুটি ৩টা অথবা ভাত দেড় কাপ, মাছ-মাংস ২ টুকরো, সবজি ইচ্ছামতো।

সাহ্‌রি : ভাত আড়াই কাপ (৩০০) গ্রাম), মাছ বা মাংস ২ টুকরো (৬০ গ্রাম), ডাল বা দুধ ১ কাপ, সবজি ইচ্ছামতো।

ভাইরাস জ্বর

তাপমাত্রার ওঠা-নামার সময় ফ্লুর প্রকোপ বেড়ে যায়। অনেকে হালকা জ্বর, কাশি, নাক বন্ধ, গলা বসা, স্বর ভাঙা সমস্যায় আক্রান্ত হতে শুরু করে। এই ফ্লু মৌসুম মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত চলে। এটি ভাইরাসজনিত রোগ। তাই দ্রুত একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায়। এতে তেমন কোনো জটিলতা না হলেও বেশ ভোগান্তি হয়।

সাত দিনের জ্বর : ভাইরাসজনিত জ্বর ওষুধ খেলে সাত দিনে সারে, না খেলে সারে এক সপ্তাহে- এমন একটা প্রবচন আছে। কথাটা ঠিক। ফ্লুর জ্বর তিন থেকে পাঁচ দিন, বড়জোর সাত দিন থাকবে। জ্বরের পাশাপাশি যদি নাক বন্ধ থাকে, নাক দিয়ে পানি পড়ে, গলা খুসখুস করে এবং কাশি হয়– তাই অকারণে অস্থিরতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ পথ্যের দরকার নেই। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল খেতে পারেন। উপসর্গের চিকিৎসা করতে হবে; বেশি পানি খেতে হবে।

অ্যান্টিবায়োটিক দরকার নেই : ভাইরাস জ্বরে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজে আসে না। এই জ্বরের মূল চিকিৎসা উপসর্গ কমানো। যেমন: জ্বর হলে প্যারাসিটামল, নাক বন্ধের জন্য নাসাল স্প্রে, গলা খুসখুসের জন্য গরম লবণ-পানি দিয়ে গড়াগড়া করা কাজে লাগে। সঙ্গে চাই প্রচুর পানি দিয়ে ও তরল খাবার এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম।

অ্যান্টি-হিস্টামিন না খাওয়া ভালো : ভাইরাসজনিত জ্বর-কাশিতে অ্যান্টি-হিস্টামিন জাতীয় ওষুধ না খাওয়াই ভালো। এটি কাজ দেয় অ্যালার্জিজনিত কাশি-সর্দিতে। বরং গরম স্যুপ, হালকা গরম পানি, লেবু-চা খেলে স্বস্তি পাবেন।

কখন ডাক্তার দেখাবেন : খুব বেশি জ্বর হলে, প্যারাসিটামলেও জ্বর না কমলে কানব্যথা বা কান দিয়ে পুঁজ বেরোলে, শ্বাসকষ্ট, প্রচণ্ড মাথাব্যথা, অসংলগ্নতা, ত্বকে ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ দেখা দিলে সেটা ফ্লু না হতে পারে। সেক্ষত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। জ্বরের সঙ্গে সর্দি-কাশি বা গলায় অস্বস্তি কিছুই না থাকলেও, তা-ও ফ্লু না, ডাক্তার দেখান।

ব্যথানাশক

আমাদের দেশে ব্যথার বড়ি কিনতে ও খেতে চিকিৎসকের কোনো ব্যবস্থাপত্রও দরকার হয় না। ইচ্ছে হলেই কিনে খাওয়া যায়। প্রচলিত ব্যথার ওষুধ আসলে মূলত চার ধরনের- এসিটামিনোফ্যান বা প্যারাসিটামল, নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ওষুধ, স্টেরয়েড এবং ওপিয়েড জাতীয় ওষুধ। এর মধ্যে প্যারাসিটামল ও আইবুপ্রোফেন, ন্যাপরোক্সেন জাতীয় নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি সারা বিশ্বেই ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ হিসেবে স্বীকৃত অর্থাৎ ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই কেনা যায়। তবে অন্যান্য ওষুধ কিনতে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র লাগে। কিন্তু আমাদের দেশে অন্য ওষুধগুলোও কেনা যায়। তবে ওপিয়ড, যেমন মরফিন, প্যাথিডিন ইত্যাদির ব্যাপারে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে।

এক. এসিটামিনোফেন বা প্যারাসিটামলের খুব বেশি ঝুঁকি না থাকলেও যাদের যকৃতের সমস্যা আছে, তাদের জন্য এটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশে অনেকেরই ক্রনিক লিভার ডিজিজ, হেপাটাইটিস বি ও সি সংক্রমণ এখনো লুক্কায়িত অবস্থায় আছে। না জেনে তাদের বেশি প্যারাসিটামল খাওয়া বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। যারা অ্যালকোহল পান করেন, তাদের জন্যও এটি ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক জ্বর হলে একই সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা পরপর সাপোজিটরি, মুখে খাবার বড়ি ইত্যাদি বারবার ব্যবহার করেন। তাই মাত্রা যাতে না ছাড়িয়ে যায়, সেদিকে লক্ষ রাখুন।

দুই. নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি দুনিয়াজুড়ে বাত, ব্যথা, প্রদাহজনিত ব্যথায় এবং কাটা-ছেঁড়া শল্য চিকিৎসার পর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এ ধরনের ওষুধ রোগ সারাতে ও তীব্রতা কমাতে কার্যকর। কিন্তু কিডনি অকার্যকারিতা, হাঁপানি রোগী ও পেপটিক আলসারে রোগীর জন্য কখনো এরা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কারও অ্যালার্জিও হতে পারে। সম্প্রতি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষকরা বলছেন, অ্যাসপিরিন, নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি এমনকি প্যারাসিটামল নিয়মিত সেবনকারীর শ্রবণ ঘাটতি হতে পারে। গর্ভাবস্থার প্রথম ২০ সপ্তাহের মধ্যে নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি খেলে গর্ভপাতের ঝুঁকি আছে। যাদের গ্যাস্ট্রাইটিস বা আলসার আছে, এবং যারা রক্ত পাতলা করার ওষুধ খান, তাঁদের পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়ায় এগুলো।

তিন. ব্যথা কমানোর আরেকটি ওষুধ হলো স্টেরয়েড। চিকিৎসা বিজ্ঞানে নানা পরিস্থিতিতে এই স্টেরয়েড ব্যবহারের নির্দেশনা আছে। কিন্তু না জেনে-বুঝে স্টেরয়েড ওষুধ দিনের পর দিন খাওয়া, স্টেরয়েড-সংবলিত টোটকা ওষুধ খেতে থাকা নানা ধরনের শারীরিক বৈকল্য করে; যা জীবন সংহারীও হতে পারে। তাই চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া স্টেরয়েড সেবন করা উচিত নয়। চার. মোদ্দা কথা হলো, সম্ভব হলে অবশ্যই ব্যথানাশক খাবার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ব্যথার ওষুধ খেয়ে ব্যথা কমিয়ে আমরা অনেক সময়

আসল রোগকে দাবিয়ে ফেলি। ফলে রোগ ধরা পড়তে সময় নেয়। তাই ওষুধ খেয়ে ব্যথা দাবিয়ে না রেখে প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কারণ নির্ণয় করুন। ব্যথার চিকিৎসার চেয়ে কারণটির চিকিৎসা দরকার।

জ্বর গিরা ব্যাথা

এবার কমিউনিটিতে অনেক রোগী আসছে, জ্বরের পরে ব্যাথা নিয়ে। গিরা ব্যাথা ও ফোলা থাকলে সেটা আর্থাইটিস। শুধু ব্যাথা ফোলা না থাকলে সেটা আরথ্রালজিয়া। আরথ্রালজিয়া এবং আরথ্রাইটিস দুটাই পীড়াদায়ক। বিশেষ করে সারা শরীরে ব্যাথা হলে।

তিনটি ভাইরাস নিয়ে ভাবা যায়।

ডেঙ্গু : ডেঙ্গু তে এত ব্যাথা হয় যে break bone disease বলা হয় ডেঙ্গুকে। ৮-৭ দিন পর অসুখ শেষ হলে ডেঙ্গুর ব্যাথা থাকেনা।

চিকনগুনিয়া : ব্যাথা খুব কষ্টদায়ক। চিকনগুনিয়া তানজানিয়ান শব্দ; এর অর্থ বাঁকা হয়ে যাওয়া বা কুঁচকিয়ে যাওয়া। এত বেশি ব্যাথা যে বাঁকা হয়ে যায় কুচকিয়ে যায়।

রুবেলা ভাইরাল আর্থ্রাইটিস : এবারের জ্বর পরবর্তী ব্যাথা টা রুবেলা হতে পারে।

তিনটা অসুখই আমাদের দেশে হয় বা হচ্ছে। ধরন আলাদা হলে ও ব্যাথা, রাশ, জ্বর সব ভাইরাসের কারনেই হয়। ডেঙ্গুতে রক্তক্ষরণ হলে ও অন্যগুলোতে হয়না।রুবেলায় রাশের সাথে লিম্ফ নোড বড় হয়। টেন্ডার অক্সিপিটাল লিম্ফ নোড রুবেলার বিশেষত্ব। মাংসপেশীতে ব্যাথাও সবগুলোতেই হয়। গিড়া ফুলে আর্থাইটিস ডেঙ্গুতে হয়না। পায়ের পাতা, পায়ের হাতের গিড়া ফুলা রুবেলায় হলে ও বেশি দিন থাকেনা। চিকনগুনিয়ার ব্যাথা এত বেশি যে কাজকর্মে অক্ষম করে ফেলে।সব ভাইরাল ইনফেকশনই সচরাচর ৭ দিনে চলে যায়। ব্যাথা হলে রুবেলার ব্যাথা দুই সপ্তাহের মধ্যে চলে গেলে ও চিকনগুনিয়ার ভোগান্তি তিন সপ্তাহ বা তার বেশি থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে বছরও পেরুতে পারে। রিউমাটয়েড আর্থাইটিস বা সেরেনেগেটিভ আর্থ্রাইটিসের অণুকারী হতে পারে।

প্রসংঙ্গত : আগে না হলেও এবার আমাদের দেশে ও জিকা ভাইরাস জ্বর শনাক্ত হয়েছে। জিকা ভাইরাস ইনফেকশন ও এই তিন ভাইরাল সদৃশ হতে পারে। জিকায় কনজাংটিভাইটিস হয়। জিকার আর্থ্রালজিয়া সপ্তাহান্তে থাকেনা।

সব ভাইরাস ইনফেকশন ই জ্বর থাকা কালীন সময়ে পিসিআর করে এবং জ্বরের পরে এন্টিবডি পরীক্ষা করে ডায়ানসোসি নিশ্চিত করা সম্ভব। প্যারাসিটামলই চিকিৎসা। অপারগ হয়ে পরলে NSAID খেতে হবে; সেক্ষেত্রে ডেঙ্গু হয় নাই এটা নিশ্চিত করে নিতে হবে।

৩য় অধ্যায়

বিশেষ চিকিৎসা

রোজার সতর্কতা

রোজার সতর্কতা : নিচে ফাস্টিং বা রোজা নিরাপদে পালন করার ধাপগুলো ও সতর্কতাগুলো দেওয়া হলো:

● নিরাপদ রোজা রাখার ধাপ ও সতর্কতা

উপবাস (fasting) স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে, তবে এটি সঠিকভাবে এবং সচেতন থেকে পালন করা জরুরি – বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি রোগ ইত্যাদি রয়েছে।

● উপবাস শুরু করার আগে

১. ডাক্তারের পরামর্শ নিন যদি আপনার থাকে:

- ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি সমস্যা, গর্ভাবস্থা
- প্রয়োজন হলে ওষুধের সময়সূচি ও মাত্রা ঠিক করুন

২.

- রমজানে রোজা

● উপবাস চলাকালে করণীয়

৩. পর্যাপ্ত পানি পান করুন

- সারা দিনে পর্যাপ্ত পানি পান করুন (যদি উপবাসে নিষিদ্ধ না হয়)
- ক্যাফেইন বা মিষ্টি পানীয় এড়িয়ে চলুন

৪. ভারী কাজ এড়িয়ে চলুন

- বিশেষ করে শুকনো (dry) বা দীর্ঘ সময়ের উপবাসে
- হালকা হাঁটা বা ইয়োগা করা যেতে পারে

৫. সতর্কতামূলক লক্ষণ নজরে রাখুন

যদি নিচের উপসর্গগুলো দেখা দেয়, উপবাস তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করুন:

- মাথা ঘোরা, দুর্বলতা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
- বুক ধড়ফড় বা ব্যথা
- প্রচণ্ড তৃষ্ণা বা গাঢ় রঙের প্রস্রাব (ডিহাইড্রেশন)
- চিন্তা করার অসুবিধা বা বিভ্রান্তি

৬. রোগ নিয়ন্ত্রণে নজর রাখুন

- ডায়াবেটিস থাকলে: রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়মিত মাপুন
- উচ্চ রক্তচাপ থাকলে: ব্লাড প্রেশার পর্যবেক্ষণ করুন

● উপবাস ভাঙার সময়

৭. সহজে ও হালকা খাবার দিয়ে শুরু করুন

প্রথমে খান:

- পানি, খেজুর, ফল, স্যুপ, দই বা ভাত
- চর্বিযক্ত, অতিরিক্ত মসলাযুক্ত বা ভারী খাবার এড়িয়ে চলুন

৮. ইলেকট্রোলাইট পূরণ করুন

দীর্ঘ উপবাসের পর:

- সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম পূরণ করতে ফল, স্যুপ বা লবণাক্ত খাবার খান

● যাদের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন

নিম্নোক্ত ব্যক্তি/অবস্থায় উপবাস এড়িয়ে চলা উচিত বা কঠোর নজরদারিতে পালন করা উচিত:

- গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা
- কিশোর-কিশোরী
- টাইপ১- ডায়াবেটিস রোগী
- দুর্বল ও বয়স্ক ব্যক্তিরা
- খাওয়ার অভ্যাসজনিত সমস্যা (Eating Disorder)

রোজা

রোজার মাসে ব্যায়াম

ডায়াবেটিস বা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত এবং স্থূলকায় ব্যক্তিদের সুস্থতার জন্য সারা বছর নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম করতে হয়।

- রোজা পালনরত অবস্থায় দিনের বেলা হাঁটা বা ব্যায়াম করা ঠিক নয়। সন্ধ্যায় ইফতারের এক ঘণ্টা পরে হাঁটতে পারেন।
- বিকেলের দিকে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম থেকে বিরত থাকতে হবে। এ সময় শরীরে সঞ্চিত পানি ও গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায়।
- যখনই ব্যায়াম করেন, শরীরে পানিশূন্যতা যেন না হয়। ইফতারে ও তারপর প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন। ব্যায়ামের পর খনিজ উপাদান ও লবণসমৃদ্ধ পানীয় পান করতে পারেন।
- অন্য সময়ের মতো অনেক বেশি ব্যায়াম করার দরকার নেই। হালকা ব্যায়াম করুন বা ৩০ মিনিটের মতো হাঁটলেই চলবে।
- হালকা সুতি ঢিলেঢালা পোশাক পরে ব্যায়াম করুন। খেয়াল রাখবেন, অতিরিক্ত গরমে ঘেমে আপনার শরীর পানি ও লবণ হারাতে পারে।
- রোজা পালনরত অবস্থায় ব্যায়াম নিষেধ নয়।

ডায়াবেটিস রোগীর ইফতার?

ইফতারে আমাদের দেশে নানা ধরনের ভাজা-পোড়া ও মিষ্টি খাবারের প্রচলন আছে। খেজুর, শরবত ও জিলাপি ছাড়া ইফতার যেন অসম্পূর্ণ।

চিনি বা গুড় দেয়া কোনো খাবার বা শরবত খাবেন না। তবে ডাবের পানি, ফলের রস, লেবু-লবণের শরবত খেলে শরীরের পানি ও লবণশূন্যতা দূর হবে। খানিকটা লবণ দিয়ে টকদইয়ের লাচ্ছি বা হল পান করতে পারেন। যাঁদের কোষ্ঠ্যকাঠিন্য আছে, তারা ইসবগুল মেশানো পানীয় বেছে নিতে পারেন।

- ইফতারে ভাজা-পোড়া কম খেয়ে স্বাস্থ্যকর প্রোটিন বেশি রাখুন। যেমন আদা-পুদিনা দিয়ে কাঁচা ছোলা, সেদ্ধ ছোলা না ভেজে, শসা, টমেটো দিয়ে সালাদ করে খেতে পারেন। টক-মিষ্টি ফলের সালাদ খান। ইফতারে তিনটি খেজুর খাবেন।

মূল খাবারটা সাহ্‌রিতে খেতে হবে, দুপুরের সমপরিমাণ। ডায়াবেটিসের রোগী সাহ্‌রি না খেয়ে কখনো রোজা থাকবেন না। ইফতারের পর সন্ধ্যারাতে ভাত না খেয়ে বরং রুটি, ফলমূল, ওটস, দুধ-দই-চিঁড়া ইত্যাদি খেতে পারেন।

হেপাটাইটিসের টিকা

জন্ডিসের অন্যতম কারণ হেপাটাইটিস্ গোত্রের ভাইরাস। নানা ধরনের হেপাটাইটিস্ ভাইরাসের মধ্যে হেপাটাইটিস্ এ এবং হেপাটাইটিস্ বি-এর টিকা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। হেপাটাইটিস্ বি-এর টিকা নেয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই ভাইরাসের সংক্রমণ হলে যকৃতের দীর্ঘমেয়াদি রোগের, (ক্রনিক লিভার ডিজিজ) আশঙ্কা থাকে। এতে যকৃতের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা কমে আসতে থাকে, একসময় যকৃত পুরোপুরি অকেজো হয়ে গিয়ে রোগীর অকাল মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এমনকি এই সংক্রমণ থেকে যকৃতের ক্যানসারও হতে পারে। ভাইরাসটির বিরুদ্ধে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা একবার পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে আজীবন সুরক্ষা পাওয়া যায়। জন্মের পর থেকে ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত যে কেউ এ টিকা নিতে পারেন। তবে ইতিমধ্যেই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকলে টিকা নেয়া যাবে না। তাই টিকা নেওয়ার আগে রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে শরীরে ইতিমধ্যেই ভাইরাসটি বাসা বাঁধেনি। প্রথম ডোজ টিকা নেওয়ার এক মাস পর দ্বিতীয়টি এবং প্রথম ডোজ নেওয়ার দিন থেকে ছয় মাস পর তৃতীয় ডোজটি নিতে হয়। তিনটি ডোজ সম্পন্ন হওয়ার পর রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হয় যে টিকা নেয়ার ফলে রক্তে ভাইরাসের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে কি না। তিনটি ডোজ সম্পন্ন হওয়ার পর পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে না উঠলে পাঁচ বছর পর চতুর্থ ডোজ (বুস্টার ডোজ) নিতে হয়।

কারা টিকা নিতে পারবেন না

হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি ও গর্ভবতী নারী এই টিকা নিতে পারবেন না। একবার হেপাটাইটিস বি-এর টিকা নেওয়ার পর যাঁর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তাকেও পরবর্তী ডোজগুলো আর দেয়া হয় না।

তিন প্রকার ভাইরাসে এক্যুট হেপাটাইটিস হয়

'এ' ভাইরাস ও 'ই' ভাইরাসের হেপাটাইটিস সম্পূর্ণ সেরে যায়। সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সার হয় না। বি ও সি ভাইরাসে সিরোসিস ও ক্যান্সার হয়। এ ও বি'র জন্য ভ্যাক্সিন আছে। সি'র কোন ভ্যাক্সিন নাই। বিওসি হেপাটাইটিসের চিকিৎসা আছে।

দাঁত ফেলতে সাবধানতা

দাঁতে যেকোনো শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা জরুরি: ১. যে যন্ত্রপাতি দিয়ে দাঁত ওঠানো হবে সার্জারি করা হবে সেগুলো জীবাণুমুক্ত না থাকলে হেপাটাইটিস বি অথবা সি ভাইরাস এমনকি এইডসের মতো রোগ পর্যন্ত ছড়াতে পারে। তাই যন্ত্রপাতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ২. ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি রোগ, উচ্চ রক্তচাপ,

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা স্ট্রোক, ক্যানসার রোগী অথবা অন্তঃসত্ত্বাদের ক্ষেত্রে আগে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রা, ক্রিয়োটিনিন, রক্তচাপ, ক্লটিং টাইম, হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি পরীক্ষা করে নিতে হবে। ৩. ডায়াবেটিস রোগীদের অবশ্যই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যারা ইনসুলিনের ওপর নির্ভরশীল, তারা দিনের প্রথমদিকে অর্থাৎ সকালের নাশতা ও ইনসুলিন নেয়ার পর ডেন্টাল সার্জারি করাবেন। ৪. যাদের দাঁতের সার্জারি হবে, তারা যদি রক্ত পাতলা করার ওষুধ সেবন করেন, চিকিৎসককে অবশ্যই জানাতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের মতামত নিয়ে ডেন্টাল সার্জারির পাঁচ দিন আগে থেকে ওই ওষুধগুলো খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে। নইলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে। ৫. যারা ধূমপায়ী অথবা পানের সঙ্গে জর্দা সেবন করেন, তাঁদের অন্তত সাত দিন আগে এগুলো বন্ধ করতে হবে। নইলে সার্জারির পর ঘা বা ক্ষত শুকাতে দেরি হবে। ৬. গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাবধানতা দরকার। এ ক্ষেত্রে পেনিসিলিন নিরাপদ। পেনিসিলিন গ্রুপ না নেয়া গেলে ক্লিনডামাইসিন চলবে।

নাকের হাড় বাঁকা (DNS)

আশি শতাংশ মানুষেরই নাকের হাড় একটুখানি বাঁকা। তবে এ রকম থাকলেই যে চিকিৎসা দরকার, তা নয়। এ থেকে সমস্যা হলেই কেবল চিকিৎসা প্রয়োজন। নাকের হাড়টা যেদিকে বাঁকা, সেই পাশে শ্বাস নিতে একট কষ্ট হয়। নাক বন্ধ মনে হতে পারে। বাঁকা অংশে বাতাস চলাচলের পথ সরু থাকে। মাথাব্যথা, হাঁচি, সর্দি, গলায় অস্বস্তি এমনকি কানেও সমস্যা হতে পারে। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে নাকের মধ্যখানের হাড় বা সেপটাম ও অন্যান্য হাড়ের বৃদ্ধি সামঞ্জস্য না থাকলেই এই সমস্যা দেখা দেয়। ১৮ থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত এই বৃদ্ধি চলে। ছোটবেলায় কোনোভাবে নাকে আঘাত পেলে ঝুঁকি বাড়ে। হামাগুড়ি দেয়ার সময়ই সাধারণত শিশুরা নাকে আঘাত পায়। তখন না হলেও পরে সমস্যা দেখা দেয়। নাকের হাড় বাঁকা হলেই শল্যচিকিৎসা অপরিহার্য নয়। হাড়টা কতখানি বাঁকা, তার ভিত্তিতে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন নির্ভর করে। যদি নাকের ছিদ্র প্রায় বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা হয়, নাক দিয়ে রক্তপাত হয় বা প্রচণ্ড মাথাব্যথা হয়-সে ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসা লাগতে পারে। যদি বাঁকা হাড়ের সঙ্গে অ্যালার্জির সমস্যা থাকে, শল্যচিকিৎসায় সাময়িক ফললাভ হয়। কিন্তু সাত আট মাস পর আবার নাক বন্ধ হতে শুরু করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পরিবর্তে অ্যালার্জি, সাইনাস ইত্যাদির চিকিৎসায়ও সুফল মিলতে পারে।

শুষ্ক চোখ

চোখ শুষ্ক হয়ে পড়লে খচখচে, অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। কখনো চোখ জ্বালাপোড়াও করতে পারে। চোখের কর্ণিয়ার সামনে পাতলা তরলের একটি স্তর থাকে। প্রতিবার চোখের পলক পড়ার সময় এ তরলটি চোখের পুরো অংশে ছড়িয়ে পড়ে। চোখের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় নানান উপাদানসমৃদ্ধ এ তরল অংশ কোনো কারণে কমে গেলে চোখ শুষ্ক হয়ে যায়। অনেক সময় একটানা দীর্ঘ সময় একদিকে তাকিয়ে থাকার কারণে চোখ শুষ্ক হতে পারে। অশ্রুগ্রন্থিসহ চোখের অন্য যেসব গ্রন্থি প্রয়োজনীয় এ উপাদানগুলো নিঃসরণ করে, তাতে সমস্যা হলে বা গ্রন্থিগুলোর নিঃসরণনালির রোগ হলেও এমনটা হতে পারে। চোখের পাতায় কোনো রোগ হলে কিংবা কোনো রোগের কারণে চোখ পুরোপুরি বন্ধ করতে না পারলেও (থাইরয়েড হরমোনজনিত এবং স্নায়ুবিক কিছু সমস্যায় এমন হয়) চোখ শুষ্ক হয়ে যায়। শুষ্ক চোখে জীবাণুর সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। এ সমস্যায় সাধারণ কৃত্রিম চোখের পানি চোখের ড্রপ হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়া মূল রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন।

কিছু পরামর্শ : একটানা দীর্ঘক্ষণ একদিকে তাকিয়ে থাকবেন না। যেমন কম্পিউটার, মোবাইল ফোন বা ট্যাব নিয়ে কাজ করার সময় কিছুক্ষণ পর পর এদিক-ওদিক তাকানো প্রয়োজন এবং অবশ্যই চোখের পাতা ফেলা উচিত। একটানা পড়াশোনা করার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র একটানা চালিয়ে রাখা ঠিক নয়, এতে চোখ শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। অত্যন্ত উষ্ণ আবহাওয়াও এড়িয়ে চলা উচিত।

ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়া পথ্য

ঢাকা শহরের বহু মানুষ ডেঙ্গ ও চিকুনগুনিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এই দুই ধরনের জ্বরই এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে আক্রান্ত হওয়ার হার বেশি। এই দুই রোগে জ্বর, গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, শরীরে ফুসকড়ি বা র‍্যাশ হয়ে থাকে। খুব দুর্বল লাগে, মাথা ঘোরে, কারও কারও বমি হয়। রক্তচাপও কমে যেতে পারে। বলতে গেলে রোগী প্রায় কিছুই খেতে চায় না। বিশেষ করে, শিশু ও বয়স্ক মানুষকে নিয়ে সমস্যা বেশি হয়। খাওয়া বন্ধ করে দেয়ার ফলে তারা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এমন রোগীকে খাওয়ানোর ব্যাপারে কয়েকটি পরামর্শ :

- জ্বর হলে শরীরে ক্যালরি চাহিদা বাড়ে। কারণ, তখন বিপাক বেড়ে যায়, বেশি পুষ্টির দরকার হয়। তাই খাওয়া বন্ধ করে দিলে বিপদ বাড়বে। রুচি কমে গেলে এমন খাবার বেছে নিন, যা অল্প খেলেও বেশি ক্যালরি পাওয়া যায়।
- ডেঙ্গ বা চিকুনগুনিয়া হলে প্রচুর তরল পান করতে হয়, দিনে কমপক্ষে তিন লিটার। পানির পাশাপাশি লবণ ও খনিজ উপাদানসমৃদ্ধ তরল (যেমন: ডাবের

পানি, ওরস্যালাইন, লেবু-লবণের শরবত, ফলের রস) পান করা উচিত। এতে করে রক্তচাপ হ্রাসের ঝুঁকি কমবে। তবে অতিমিষ্টি পানীয় বমির উদ্রেক করতে পারে। বাজারে কোমল পানীয় বা আইসক্রিম সহজে পিপাসা মেটায় না।

- অরুচি বা বমি ভাবের মধ্যে তেল-মসলাযুক্ত খাবার, ফাস্ট ফুড ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। খাবারের তালিকায় পর্যাপ্ত শর্করা যেমন: ভাত, জাউভাত, ওটমিল ইত্যাদি রাখুন। রাখুন প্রোটিনও, যেমন: দুধ, দই, মাছ বা মুরগির মাংস ও স্যুপ।
- অনেক ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়া রোগীর খেতে গেলেই বমি আসে। তারা হালকা শুকনো খাবার খেতে পারে। যেমন বিস্কুট, মুড়ি ইত্যাদি। এতে বমি ভাব কমবে। এ ছাড়া আদা-চা, গ্রিন টি বা শুকনো আদা বমি ভাব কমায়। এ সময় ফলমূল খেতে হবে বেশি করে।

ক্যান্সার

(১) ক্যানসার প্রতিরোধ

চাইলে এই প্রাণঘাতককে প্রতিরোধ করা সম্ভব। তার জন্য চাই ধূমপান সম্পূর্ণভাবে বর্জন, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন। প্রক্রিয়াজাত মাংস (হ্যাম, বেকন, সসেজ ইত্যাদি), লাল মংস (গরু,খাসি, ভেড়া) এবং লবণ দিয়ে সংরক্ষণকৃত খাদ্য সরাসরি ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। যুক্তরাজ্যের ক্যানসার রিসার্চ বলছে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস থেকে অন্তত ছয় ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। এগুলো হুলো মুখগহ্বর, গলা, কণ্ঠনালি, ফুসফুস, পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্যানসার। আর ফলমূল, শাক-সবজি ও আঁশসমৃদ্ধ খাবার ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। খাদ্যতালিকায় যোগ করুন নানা ধরনের রঙিন শাক-সবজি, ফলমূল বাদাম, গোটা শষ্যের তৈরি খাবার ও শিমজাতীয় সবজি। এসবে আছে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট (বিটা ক্যারেটিন, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই), ফলেট, সেলেনিয়াম, ফ্লাভনয়েড, লাইকোপিনসহ বিভিন্ন উপাদান, যা ক্যানসার রোধে কার্যকর। প্রচুর ফলমূল পাকস্থলী ও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় কমলা, কমলার রস, পেঁপে, ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়, রসুন বিভিন্ন ধরনের পেঁয়াজ, পেঁয়াজপাতা ও কলি পাকস্থলী, অন্ত্র ও পায়ুপথের ক্যানসার রোধ করে ক্যারোটিনয়েড সমৃদ্ধ সবজি, যেমন: গাজর, মিষ্টি আলু, পালংশাক, গাঢ় সবুজ শাক-সবজি ইত্যাদি ফুসফুস, মুখগহ্বর, কণ্ঠনালি ও খাদ্যনালির ক্যানসার রোধ করে। শর্করাবিহীন সবজি, যেমন: ফুলকপি, ব্রোকলি, শসা, মাশরুম, শিম ইত্যাদি পাকস্থলী ও খাদ্যনালির ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার, যেমন: কমলা, জাম, মটর, ক্যাপসিকাম ইত্যাদি খাদ্যনালির ক্যানসার কমায় লাইকোপনসমৃদ্ধ খাবার, যেমন: টমেটো, পেয়ারা, তরমুজ ইত্যাদি প্রস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি কামায়। তাই

ক্যানসার রুখতে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন ধরনের সবুজ ও রঙিন শাক-সবজি রাখুন। যতটা সম্ভব কাঁচা ও খোসাসহ খান, অথবা অল্প তাপে রান্না করুন।

(২) ক্যানসারের সতর্ক সংকেত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ক্যানসার রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কারণ, অজ্ঞতা, অসচেনতা, কুসংস্কার ইত্যাদি। ক্যানসার প্রতিরোধ ও রোগটির ঝুঁকি সম্পর্কে ঠিকমত না জানার ফলে এ দেশে ক্যানসার শনাক্ত করতেই অনেকের দীর্ঘদিন পেরিয়ে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে যাওয়ায় রোগটি ধরা পড়ে। ফলে চিকিৎসা প্রায়ই অনিরাময়যোগ্য হয়ে যায়। সাধারণত ক্যানসারের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো উপসর্গ থাকে না। নিয়মিত ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ে অংশ নিলে প্রাথমিক পর্যায়েই রোগটি শনাক্ত করা সম্ভব।

(১) বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই রোগের ঝুঁকি বাড়ে। ধূমপান ও তামাক সেবন ৬০ শতাংশ ক্যানসারের জন্য দায়ী।

(২) ৮০ শতাংশ ফুসফুস ক্যান্সার ধূমপান ও তামাক সেবনে।

(৩) এ ছাড়া অ্যালকোহল গ্রহণ, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ ও আর্সেনিকযক্ত পানি পানের পরিণামেও ক্যানসার হতে পারে।

(৪) শরীরের ওজন অতিরিক্ত বেড়ে গেলে, শারীরিক পরিশ্রম বাদ দিয়ে অলস জীবনযাপন করলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

(৫) দীর্ঘমেয়াদি সংক্রামক ব্যাধি (যেমন: হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি ও হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস প্রভৃতি) থেকেও ক্যানসার হতে পারে।

(৬) তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও দীর্ঘ সময় প্রখর রোদের সংস্পর্শে এলে, ঘরে-বাইরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকলে, পরিবারে ক্যানসারের ইতিহাস থাকলে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। ক্যানসারের কয়েকটি সতর্কসংকেত (ক) রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। জরায়ু থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয়। দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময় এবং মেনোপজ- পরবর্তী নারীদের মাসিকের মতো রক্তক্ষরণ হয়। (খ) স্তনের অস্বাভাবিক পরিবর্তন, যেমন: স্তনে চাকা অনুভব হয়, ত্বক কুঁচকে যায়, বৃন্ত দেবে যায়, বৃন্ত হতে তরল বের হয়। (গ) খাবার গিলতে কষ্ট হয়। দীর্ঘদিন বদহজম হয়, পেট ফেঁপে থাকে, ফুলে ওঠে এবং ভারী বোধ হয়। (ঘ) ত্বকের ক্ষত সারতে দেরি হয়। (ঙ) আঁচিলের পরিবর্তন হয়। (চ) মলমূত্র ও কাশিতে রক্ত দেখা যায়। পেটব্যথা ও মনমরা ভাব বেশি হয়। মুখ ও মুখগহ্বরের ক্ষত শুকায় না। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা হয়, শরীরের যেকোনো স্থানে পিণ্ড বা চাকা অনুভব হয়, অকারণে জ্বর ও শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়। সাধারণত ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী পুরুষদের অণ্ডকোষের পরিবর্তন বা চাকা অনুভব হতে পারে। পাশাপাশি প্রস্রাবের সমস্যা,

ঘনঘন প্রস্রাব, জ্বালাপোড়া, আটকে যাওয়া, বেগ কমে যাওয়া ইত্যাদি। আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় জরুরি। এসব উপসর্গ তিন সপ্তাহ স্থায়ী হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ক্যান্সার চিকিৎসা

প্রাথমিক চিকিৎসা:যে চিকিৎসা ক্যান্সারকে সমূলে উৎপাটন করতে পারে। সার্জারী কেমোথেরাপী রেডিওথেরাপী সব ধরনের চিকিৎসায় এটা সম্ভব।

এ্যাডজুভেন্ট থেরাপি : উদ্দেশ্য হল প্রাইমারির পর থেকে গেলে সেই ক্যান্সার সেলকে মেরে ফেলা। কেমোথেরাপী রেডিওথেরাপী বা হরমোন থেরাপি দিয়ে এটা সম্ভব।

নিওএডজুভেন্ট থেরাপি : এডজুভেন্ট থেরাপির অনুরুপ।কিন্তু নিওএডজুভেন্ট দেওয়া হয় প্রাইমারী থেরাপির আগে।

পেলিয়েটিভ কেয়ার : রোগী রোগীর ফ্যামিলীকে ভালো রাখাই এ টিম ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশ্য।

ব্যথা বেদনা

ব্যথা বেদনা হলে সাধারণ ভাবে সবাই সেটাকে বাত বলে থাকে। সার্বিক অর্থে এর ইংরেজি হলো রিউমাটিজম। হাড্ডি গিরা মাংসপেশির এবং সাথে সংযুক্ত যেকোন কিছুতে ব্যথা হলেই সেটা রিউমাটিজিম। বিভিন্ন ভাবে এটা হতে পারে। তবে গিরা যদি না ফুলে বড় অসুখ নয়।

বাত খুব সাধারণ সবচেয়ে প্রচলিত অসুখ। বয়সের সাথে হাড্ডির বয়স বাড়ে গিরার পরিবর্তন হয়; কোনটার এক কোণা ছোট হয়, কারো এক পাশ বেড়ে যায়, সরে যায়। পরিবর্তনটা ইংরেজিতে ডিজেনারেশন হলেও অনেকে এটাকে ক্ষয় বলায় রোগীরা ভয় পায় । আসলে হাড্ডি/গিরার ক্ষয় হয়না, বয়স হয়। বয়সের সাথে চুলদাড়ি যেমন পাকে এগুলোও পাকে। পাকা চুল যেমন কালো হয়না,সত্তর থেকে সতেরতে যেমন আসা যায় না, বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া এই গিরাগুলোও তেমনি যৌবন পায় না। আসল চিকিৎসা হলো মানিয়ে চলা। কিছু ব্যায়াম করা যাতে মাংস পেশীগুলো সতেজ শক্ত থাকে গিরাকে সাপোর্ট দিতে পারে। প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোন ব্যথার ঔষধ খাওয়া উচিত নয়, দরকার পড়ে না। ব্যথার সাথে গিরা ফুলে গেলে, গরম হলে এবং অন্য উপসর্গ থাকলে বড় অসুখ, বিশেষ চিকিৎসা লাগবে।

গোড়ালি ব্যথা

১। সাধারণতঃ জুতার সমস্যা, হাঁটাচলার সময় অসতর্কতার ফলে গোড়ালি মচকে যাওয়া এবং অতিরিক্ত ওজনের কারণে গোড়ালিতে ব্যথা হয়ে থাকে।

২। এ ছাড়া গোড়ালিতে প্রদাহ এবং পায়ের গঠনগত কিছু সমস্যার কারণেও গোড়ালিতে ব্যথা হতে পারে।

৩। ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ের পাতার চামড়ার নিচের জিনিষ (প্লান্টার ফাসাইটিস) শক্ত হয়। ক্যালকেনিয়ামের সাথে লাগানো অংশের হাড্ডিতে ব্যথা হয়। এক্স-রে করলে ক্যানকেনিয়াল স্পার পাওয়া যায়। ঘুম থেকে উঠে মেঝেতে পা ফেললে ভীষণ ব্যথা-সারা দিন হাঁটলে আস্তে আস্তে চলে যায়। কিছুদিন কষ্ট হলে আস্তে আস্তে খাপ খেয়ে যায়। বড় ধরনের চিকিৎসা লাগে না। ব্যথার জেল, আরাম দায়ক সোল, স্টেরয়েড ইনজেকশন নিলে সাময়িক ভালো লাগে।

দীর্ঘমেয়াদি গোড়ালি ব্যথা?

পায়ের স্ট্রেচিং ব্যায়াম করতে পারেন। পা দুটোকে টান করে রেখে পায়ের আঙুলগুলো নিজের দিকে টেনে আনতে চেষ্টা করুন। এতে পায়ের পেছন দিকে মাংসপেশির জোর বাড়বে। এর ফলে গোড়ালি ভারসাম্যে থাকবে। শরীরের ভারসাম্য বাড়াতে কিছুক্ষণ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। দুই পায়ের আলাদাভাবে দাঁড়ানোর অভ্যাস করুন।

তরুণ বয়সে কোমরব্যথা (এ্যাংকাইলোজিং স্পনডাইলাইটিস)

কোমরব্যথা একটি সুপরিচিত সমস্যা। বিশ্বের বয়স্ক মানুষের ৮৫ শতাংশই জীবনে কখনো না কখনো কোমরব্যথা আক্রান্ত হয়েছেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যথার মারাত্মক কোনো কারণ পাওয়া যায় না। ৮০ শতাংশ কোমরব্যথা তিন মাসের মধ্যে সেরে যায়। এ জন্য সাধারণ ব্যথানাশক, জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও ব্যায়ামের দরকার হয। তিন মাসের বেশি সময় ধরে ব্যথা থাকলে সেটা দীর্ঘমেয়াদি বাতরোগ কি না, খতিয়ে দেখতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অ্যাংকাইলোজিং স্পনডাইলাইটিস, যা কম বয়সেই বেশি হয়ে থাকে। অ্যাংকাইলোজিং স্পনডাইলাইটিস একটি প্রদাহজনিত বাতরোগ। এতে মূলত মেরুদণ্ড আক্রান্ত হয়। তবে হাত-পায়ের গিরা, গোড়ালি, রগ অথবা রগ ও হাড়ের সংযোগস্থলও আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণত ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সী যুবকেরা বেশি আক্রান্ত হন। পুরুষরাই বেশি। পুরুষ:নারী ৩:১। এ রোগের প্রধান লক্ষণ ঘুম থেকে ওঠার পর বেশি তীব্র থাকে এবং দিনের বাকি সময় কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ব্যথার তীব্রতায় রাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। সকালে কোমর বা অন্যান্য আক্রান্ত স্থানে জড়তা থাকে, সহজে নাড়ানো যায় না। এ ছাড়া মেরুদণ্ডের নড়াচড়া সীমিত হয়ে পড়ে। এ রোগের পারিবারিক ইতিহাসও থাকতে পারে। মূলত লক্ষণ দেখেই রোগ নির্ণয় করা যায়। অস্থি সন্ধির এঙ-রে বা এমআরআই করে নিশ্চিত হওয়া যায়। চিকিৎসার পদ্ধতিগুলো হলো ব্যায়াম, ব্যথানাশক ও বাতের সুনির্দিষ্ট কিছু ওষুধ। সঠিক চিকিৎসা না

করা হলে ব্যথা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি পঙ্গুত্বের ঝুঁকি দেখা দেয়। ধীরে ধীরে মেরুদণ্ড শক্ত বা আড়ষ্ট হয়ে যাবে, হিপ জয়েন্ট অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। তাই তরুণদের কোমরব্যথা তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদি হলে অবহেলা না করে চিকিৎসা নেয়া উচিত। সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি ব্যায়াম দারুণ উপযোগী।

হাড়েরও বয়স বাড়ে

হাঁটতে পারেন না। হাঁট ভাঁজ করতেও বাধে। ভারী কাজ তো দূরের কথা। বয়স হলে বেশির ভাগ মানুষের এই অভিযোগ। বলেন, 'আমার হাড় ক্ষয়ে গেছে। কিংবা হাড্ডি সামনে সরে গেছে'। কিন্তু তাই বলে হাঁটাহাঁটি ও কাজকর্ম বন্ধ করে দিলে তো চলবে না। বয়স বাড়লে চুল যেমন পাকে, হাড়েরও তেমনি বয়স হয়। হাড়ের জোড়া বা অস্থিসন্ধির বয়সও বাড়ে। ইংরেজিতে একে বলে ডিজেনারেশন। এর মানে অস্থিসন্ধির একবারে ক্ষয়ে যাওয়া নয়। মেয়েদের ২৭, ছেলেদের ৩২ বছর বয়স থেকে এই পরিবর্তন শুরু হয়। কোথাও হাড্ডির আকার পরিবর্তন হয়, কখনো কোনটা বাড়ে-কমে। মাংসপেশি বা লিগামেন্ট চাপ দিলে বা খোঁচা দিলে ব্যথা লাগে। মেরুদণ্ডে এ রকম হলে আমরা বলি ঘাড় (সার্ভাইকাল) বা মাজায় (লাম্বার) স্পনডাইলোসিস হয়েছে। হাঁটু, কোমর বা গোড়ালিতে হলে বলি অস্টিওআর্থ্রাইটিস। কিন্তু এমন সমস্যা হলেও যত দূর সম্ভব সচল থাকতে হবে। এতে হাড় যেমন ভালো থাকবে, মাংসপেশি দুর্বল হবে না, রক্ত চলাচলও বাড়বে। দৈনন্দিন কাজকর্ম একট মানিয়ে নিয়ে চালিয়ে যেতে হবে। শরীরের ওজন কমান। হাঁটু, ঘাড় বা কোমরের ব্যথা কমাতে নির্দেশিত নিয়মে ব্যায়াম করবেন। লো ইমপ্যাক্ট এক্সরসাইজ, যেমন: হাঁটা, সাঁতার, যোগব্যায়াম উপকারী। সারাদিন একই ভঙ্গিতে বসে থাকবেন না। যেমন: টিভি বা কম্পিউটারের সামনে, পড়ার টেবিলে বারবার ভঙ্গি পরিবর্তন করুন। শরীরটাকে সচল রাখুন।

কোমর ব্যথার বিপদচিহ্ন

কোমরব্যথা খুবই পরিচিত সমস্যা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি আমাদের প্রতিদিনের চলাফেরা-ওঠাবসার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে এই সমস্যা সাধারণ ওষুধ, নিয়ম-কানুন ও ব্যায়ামের মাধ্যমেই সেরে যায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোমর ব্যথার কারণ গুরুতর হতে পারে। কখন বুঝবেন এই কোমর ব্যথাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার? এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা কিছু বিপদচিহ্ন বা সতর্ক সংকেত সন্ধান করেন। বয়স ২০ বছরের কম ও ৫০ বছরের বেশি হলে কোমর ব্যথার কারণ অনুসন্ধান করা জরুরি। ব্যথার ধরন বা তীব্রতা যদি সব সময় একই রকম থাকে বা ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকে এবং বিশ্রাম নিলেও উন্নতি না হয়, সেটাকে বিপদ সংকেত হিসেবে ধরে নিতে হবে। বড় কোনো আঘাতের ইতিহাস থাকলে, কোমরব্যথার পাশাপাশি বুকে ব্যথা হলে, রোগীর আগে কখনো যক্ষ্মা হয়ে থাকলেও বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। ক্যানসার, অস্টিওপোরোসিস, এইডস, দীর্ঘকাল স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ সেবনের ইতিহাস থাকলে কোমর ব্যথাকে অবহেলা করা চলবে না। ব্যথার পাশাপাশি জ্বর, শরীরের ওজন হ্রাস, অরুচি, অতিরিক্ত ঘাম ইত্যাদি

উপসর্গ থাকলে এবং ব্যথাটা কোমর ছাড়িয়ে পায়ের দিকে-বিশেষ করে এক পায়ের হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ছড়ালে অথবা এক পায়ে তীব্র ব্যথা বা অবশভাব হলে সতর্ক হতে হবে। প্রস্রাব বা পায়খানার সমস্যা, মলদ্বারের আশপাশে বোধহীনতা, মেরুদণ্ডে বক্রতা, পায়ের দুর্বলতা বা পায়ের মাংসপেশির শুষ্কতা ইত্যাদি উপসর্গকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে কোমরব্যথার সঙ্গে উল্লেখিত যেকোনো উপসর্গ থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

শীতে বাতের ব্যথার কষ্ট

শীতকালটা বাত ব্যথার রোগীদের একটি খারাপই কাটে। শীতে বা ঠাণ্ডায় বাতের প্রকোপ বাড়ে এমন কোনো প্রমাণ নেই, তবে এ সময় ব্যথার কষ্ট বাড়ে এটা সর্বজন স্বীকৃত। যুক্তরাষ্টের এক সমীক্ষায় ৬৭ দশমিক ৯ শতাংশ বাতের রোগী শীতে ব্যথা বেড়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। যদিও আমাদের দেশে শীত অত তীব্র নয়, তবে বাতব্যথার রোগীরা এ সময় একট বিপাকে পড়েন। শীতে কেন ব্যথার অনুভূতি বাড়ে, এর কারণ সুনিশ্চিত নয়। অনেকে শীতে বায়ুর চাপ কমে যাওয়াকে দায়ী করেন। বায়ুচাপ কমে গেলে পেশিকলা প্রসারিত হয় ও স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ব্যথাবোধ বেড়ে যায়। এ ছাড়া শীতে ব্যায়াম অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ঠাণ্ডায় হাত-পায়ের রক্তনালি সংকুচিত হলেও ব্যথা বাড়ে। শীতে বাতব্যথার রোগীদের করণীয়: শীতে উষ্ণ থাকার চেষ্টা করাটাই সবচেয়ে ভালো সমাধান। পর্যাপ্ত গরম কাপড় পরুন। বাইরে বেরোনোর সময় একাধিক লেয়ারে বা প্রস্থে প্রস্থে পোশাক পরুন। উন্মুক্ত অংশ, যেমন হাত, পা, মাথা, কান, গলা যথাসম্ভব ঢেকে রাখুন। মোজা, মাফলার, দস্তানা, স্কার্ফ ব্যবহার করুন। হালকা গরম পানিতে গোসল করবেন। ঠাণ্ডায় যাদের হাতের রং পরিবর্তিত হয় (সাদা থেকে নীল ও তারপর লাল), তারা শীতকালে বাড়তি সতর্ক হবেন। নিয়মিত ব্যায়াম ছাড়বেন না হঠাৎ ব্যায়াম বন্ধ করে দিলে গিরার ব্যথা ও জড়তা বেড়ে যেতে পারে। শীতকালে সূর্যালোক কম থাকায় ভিটামিন ডি-এর অভাব হয়। বেশি করে ভিটামিন যুক্ত খাবার বা প্রয়োজনে ভিটামিন ডি বড়ি খেতে হবে। ব্যথা বেশি বেড়ে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী স্বল্প মেয়াদে ব্যথানাশক ওষুধ খেতে পারেন। যথেষ্ট পানি পান করবেন। কর্মক্ষম থাকাই শীতে বাতব্যথার রোগীদের ভালো থাকার মূলমন্ত্র।

অস্থিসন্ধির সমস্যা মেয়েদের কেন বেশি?

হাড়ের জোড়া বা অস্থিসন্ধির সমস্যা নারীদেরই বেশি। বয়স না বাড়তেই বেশির ভাগ নারী কোমরব্যথা, হাঁটুব্যথা, কবজিব্যথাসহ নানা রকম ব্যথায় আক্রান্ত হন। গবেষকেরা বলেছেন, অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা সন্ধিক্ষয় রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ৬০ শতাংশই নারী। এ ছাড়া হাড় জোড়ার বিভিন্ন রোগ যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, লুপাস, স্ক্লেরোডারমা ইত্যাদি মেয়েদেরই বেশি হয়। মেনোপজ-পরবর্তী নারীদের হয় অস্টিওপোরোসিস হাড়ের ঘনত্ব যায় কমে। আর এ কারণে হাড় ভাঙার ঝুঁকি নারীদেরই বেশি। মেয়েদের এই অস্থিসন্ধির সমস্যা বেশি হওয়ার কিছ কারণ রোগগুলোর নিজস্ব ধরন। যেমন লুপাস পুরুষদের তুলনায় ছয় গুণ বেশি হয় নারীদের, এটাই এ রোগের ধরন। আবার কিছু কারণ

পরিববেশগত। যেমন নারীরা মধ্যবয়স থেকেই ওজন বৃদ্ধির সমস্যায় পড়েন, দেহের স্বাভাবিক ফিটনেস বজায় রাখতে ব্যর্থ হন। এর বিরূপ প্রভাব পড়ে অস্থিসন্ধির ওপর। ব্যায়াম ও খেলাধুলাতেও মেয়েরা পিছিয়ে। এছাড়া সারা দুনিয়ার মেয়েরা ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-র অভাবে ভুগছেন, যে দুটো জিনিস হাড়ের সুস্থতায় খুব জরুরি। অস্থিসন্ধি সুস্থ রাখতে তাই অল্প বয়স থেকেই নারীরা সচেতন হবেন। ব্যায়াম করুন, যা অস্থিসন্ধি সচল রাখে, যেমন সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা ইত্যাদি। হাড়ের ঘনত্ব তৈরি হয়ে যায় বয়স ২০ হওয়ার একটু পরেই। তাই অল্প বয়স থেকেই যথেষ্ট ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার যেমন দুধ, দই, ছোট মাছ, সবুজ পাতাওলা শাক ইত্যাদি খাবেন। ভিটামিন ডি আছে সূর্যালোকে। তাই বাইরে মেয়েদের নিয়মিত খেলাধুলা বা হাঁটাহাঁটি করা উচিত। গর্ভাবস্থা ও দুধ খাওয়ানোর সময় বাড়তি ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি বড়ি সেবন করা উচিত। বয়স বাড়া ও মা হওয়ার পরও নিজের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন। বাড়তি মেদ জমতে দেবেন না। দৈনন্দিন কাজ করার সময় সচেতন থাকুন, যেন সন্ধির ওপর বেশি চাপ না পড়ে। যেমন ভারী কিছ ওঠানোর সময়, নিচ হয়ে রান্নাঘরে কাজ করার সময় সঠিক দেহভঙ্গির ব্যবহার করুন। সচল থাকুন, হাড্ডি সতেজ থাকবে।

হাড়ের যত্ন

অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ভঙ্গুরতা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা আজকাল বেড়েছে। এই সমস্যায় হাড়ের ঘনত্ব যায় কমে, ফলে সহজেই ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। বিশ্বব্যাপী বয়স্ক মানুষেজনের হাড় ভেঙে শয্যাশায়ী দশা এবং এ- সংক্রান্ত জটিলতায় মৃত্যুর অন্যতম কারণ অস্টিওপোরোসিস। এতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি পুরুষদের চেয়ে নারীদেরই বেশি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবারই হাড়ের ঘনত্ব ও শক্তি কমতে থাকে। কিন্তু এই সমস্যা তাদেরই বেশি হয়, যাদের কম বয়সে হাড়ের শক্তি ঘনত্ব ঠিকমতো বাড়েনি বা সঠিক মাত্রায় পৌঁছায়নি। তাই অল্প বয়সেই হাড়ের সর্বোচ্চ শক্তি ও ঘনত্ব অর্জন করার লক্ষ্যে সচেতন হতে হবে। নইলে বেশি বয়সে হাড় ভাঙার জটিলতা থেকে রেহাই মিলবে না। ছোটবেলা থেকেই পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। গর্ভাবস্থায়, স্তন্যপান করানোর সময় এবং মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নারীদের প্রতিদিন ১ হাজার ২০০ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যালসিয়াম খেতে হবে। পাশাপাশি এ সময় প্রয়োজনে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি বড়ি খেতে হবে। ধূমপান বর্জন করতে হবে। এ ছাড়া কৈশোর থেকে নিয়মিত ব্যায়াম করা চাই। এতে হাড়ের শক্তি বাড়বে। মনে রাখবেন, আপনার হাড়ের ঘনত্ব কিন্তু নির্ধারিত হয়ে যায় ২০ বছর বা তার একট বেশি বয়সেই। তাই হাড়ের যত্ন নিতে হবে তরুণ বয়সেই। অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে কি না, তা কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ দেখে বোঝা যায় না। এটি নীরবেই হতে থাকে। হাড় যখন ভেঙে যায়, তখনই রোগটা প্রকাশ পায়। তাই ঝুঁকি বিবেচনা করে রোগ নির্ণয়ের জন্য হাড়ের ঘনত্ব বা বোন মিনারেল ডেনসিটি পরীক্ষা করতে হয়। বৃদ্ধ বয়স, দীর্ঘমেয়াদি স্টেরয়েড-জাতীয় ওষুধ সেবন, ধূমপান, মাদকাসক্তি, ভগ্নস্বাস্থ্য, আগেও অল্প আঘাতে হাড় ভাঙার ইতিহাস ইত্যাদি

হলো ঝুঁকি। রোগ শনাক্ত হলে হাড়ের ঘনত্ব বাড়ানোর চিকিৎসা নেয়া যেতে পারে। তবে এর চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই অধিক কার্যকর। তাই নিজের হাড়কে ভালোবাসুন ভবিষৎকে মজবুত করুন। ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ুন।

কিডনি রোগ ও কোমর ব্যথা

কোমর বা মাজায় ব্যথা। নিয়ে সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। পেছনে বা মাজায় দুই হাত দিয়ে দেখায়-আমার কিডনি নষ্ট হলো নাকি। আসলে কিডনি ফেইলিউর বা কিডনি অকার্যকারিতায় সাধারণত কোনো ব্যথা-বেদনা হয় না। এর উপসর্গ ভিন্ন। তবে কিডনিতে পাথর হলে সার্বক্ষণিক মৃদ একটা ব্যথা হতে পারে। কিডনির সংক্রমণেও ব্যথা হতে পারে। কিডনির পাথর মূত্রনালি বা মূত্রতন্ত্রের অন্য কোথাও চলে এলে তীব্র ব্যথায় রোগী গড়াগড়ি খায়। সাধারণ কোমর ব্যথার সঙ্গে এর মিল নেই। আসলে বেশির ভাগ কোমর ব্যথার কারণ কিডনি নয়। এর বেশির ভাগটাই মেরুদণ্ডের হাড় ও সন্ধি বা পেশির সমস্যা। হাড় ক্ষয় হলে মেরুদণ্ডে কমপ্রেশন ফ্র্যাকচার হতে পারে। হতে পারে মেরুদণ্ডের যক্ষ্মা এমনকি টিউমার। কোমরের হাড়ে বাত, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, স্পনডাইলাইটিস, ডিস্ক প্রলাপস বা সরে যাওয়ার কারণে ব্যথা হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রে ব্যথাটা মেকানিক্যাল, অর্থাৎ কোমরের বা মেরুদণ্ডের হাড়ের ওপর চাপ বা ভূল দেহভঙ্গির কারণে। গাড়িতে বসে লম্বা ভ্রমণ, অতিরিক্ত ভার বহন, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে বা বসে কাজ করা, কোমর বাঁকা করে কাজ করা ইত্যাদি হলো এর কারণ। এসব ক্ষেত্রে বিশ্রাম ও সাধারণ ব্যথানাশক এবং দেহভঙ্গি ঠিক করাই চিকিৎসা। অন্যান্য ক্ষেত্রে সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কারণ জেনে চিকিৎসা করতে হবে। ব্যায়ামের অভ্যাস করতে হবে।

পায়ের পাতার চার ব্যায়াম?

সারা দিন হাঁটাহাঁটি আর বাইরে জুতো পরার দরুন অনেক সময় বাড়ি ফিরে পায়ের পাতা বা গোড়ালি ব্যথা হয়। গোড়ালির ব্যথা কমাতে কিছু ব্যয়াম উপকারী।

এক. পায়ের পাতা কোনো শক্ত কিছুর (যেমন পিঁড়ি) ওপর আলতো করে রাখুন। এবার পাতা দিয়ে শক্ত জিনিসটার ওপর ধীরে ধীরে চাপ দিন। গোড়ালির হাড় বাঁকাবেন না। তবে গোড়ালির ওপরের পেশি শক্ত হবে। এভাবে ১৫ সেকেন্ড চাপ দিন, ১০ সেকেন্ড শিথিল করুন।

দুই. পা এবার শক্ত জিনিসটার নিচে রাখুন। পাতা দিয়ে জিনিসটার ওপর মানে নিজের দিকে চাপ দিতে থাকুন। ১৫ সেকেন্ড চাপ দিন, ১০ সেকেন্ড শিথিল করুন।

তিন. মেঝে বা শক্ত কিছুতে সোজা হয়ে পা লম্বা করে বসুন। এবার পায়ের পাতা ধীরে ধীরে নিচের দিকে বাঁকান যতটা সম্ভব। হাঁট ভাঁজ হবে না। ১৫ সেকেন্ড ধরে রাখুন। কয়েকবার করুন।

চার. একইভাবে বসে থেকে এবার পায়ের পাতা নিজের দিকে বাঁকান। যতটা সম্ভব। হাঁট ভাঁজ না করে। ১৫ সেকেন্ড ধরে রাখুন। কয়েকবার করুন।

গিরাব্যথা ও বাতজ্বর

বাতজ্বর আমাদের দেশে একটি বহুল পরিচিত সমস্যা। জ্বরের সঙ্গে গিরা ব্যথা থাকলে অনেকে বাতজ্বর হয়েছে বলে সন্দেহ করেন এবং বছরের পর বছর ইনজেকশন নেন। কিন্তু গিরা ব্যথা মানেই বাত জ্বর নয়। আবার বাত জ্বরের সফল চিকিৎসা না করলে পরে হাটের ভালভে সমস্যা হতে পারে। তাই এই রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় যেমন প্রয়োজন, তেমনি দরকার সঠিক চিকিৎসা। বাতজ্বর মূলত ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সে হয়ে থাকে, -৩০এর পর হয় না বললেই চলে। গিরা ব্যথা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ, কিন্তু একমাত্র নয়। এ রোগে বড় গিরাগুলো একের পর এক লাল হয়ে ফুলে যায় ও তীব্র ব্যথা হয়, একটা কমলে আরেকটা শুরু হয়। অনেকের দুই-তিন সপ্তাহ আগে গলাব্যথার ইতিহাস থাকে। গিরায় সমস্যা না হয়ে শুধ শরীর বা হাড়ে ব্যথা বা কামড়ানো বাতজ্বরের লক্ষণ নয়। অনেক সময় গিরা ব্যথার সঙ্গে রক্তের একটি পরীক্ষা করা হয়। এ.এস.ও টাইটার- এটা বেশি হলেই বাতজ্বরের চিকিৎসা শুরু করে দেয়া হয়। এএসও টাইটার বেশি মানে বাতজ্বর নয়। বাতজ্বর প্রকৃত অর্থে হার্টের অসুখ, কোন ক্রমেই গিরায় অসুখ নয়। বাতজ্বরের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো গিরা ব্যথা ও ফোলার সঙ্গে বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট, বুক ব্যথা, হাত-পায়ের অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়া, ত্বকে লাল লাল চাকা, গুটি ইত্যাদি। বাতজ্বরের রোগীদের দীর্ঘমেয়াদি পেনিসিলিন ইনজেকশন বা বড়ি দেয়ার উদ্দেশ্য, হার্টের ভালভের সুরক্ষা এটা গিরা ব্যথার চিকিৎসা নয়। নানা ধরনের বিভ্রান্তির জন্য আমাদের দেশে অনেকের বাতজ্বর না হলেও পেনিসিলিন দেওয়া হয়, আবার অনেকের অন্য কোনো বাতরোগ আছে কিনা, তা নির্ণয় করা হয় না। তাই এ রোগের সঠিক শণাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের সাহায্য নিন।

আঙুলের জড়তা কাটাতে ৫ ব্যায়াম

একটানা কাজ করতে করতে হাতের আঙুলের জড়তা বা ব্যথা অনুভব অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে যারা কম্পিউটারের কি-বোর্ড ও মাউস ব্যবহার করেন, তারা এমন সমস্যা এড়াতে কাজের ফাঁকেই কিছু ব্যায়াম করতে পারেন। বড়ো আঙুল ছাড়া বাকি চারটি আঙুল একসঙ্গে ভাঁজ করুন এমনভাবে, যেন আঙুলের মাথাগুলো যথাসম্ভব কবজির কাছাকাছি আসে। এরপর আঙুলগুলো প্রসারিত করুন। মনে মনে ১ থেকে ১০ গুনতে গুনতে ১০ বার এই ব্যায়াম করুন। এক হাতে শেষ হলে অপর হাতের ব্যায়াম করুন একইভাবে। এবার এই চারটি আঙুল এমনভাবে ভাঁজ করুন, যেন আঙুলের মাথাগুলো তালুর মাঝামাঝি স্থান স্পর্শ করে এবং আঙুলগুলোর প্রতিটি জোড়া বা অস্থিসন্ধি ভাঁজ হয়ে থাকে। এরপর আঙুল ছড়িয়ে দিন। এভাবে ধীরে ধীরে ব্যায়ামটি করুন ১০ বার, এক হাত শেষে অন্য হাতে। বুড়ো আঙুল ভাঁজ করে তালুতে স্পর্শ করুন। এরপর আঙুল প্রসারিত করুন। ১০ বার করে দুই হাতেই এটা চর্চা করুন। ডান হাতে বুড়ো আঙুল স্থির রেখে অন্য আঙুলগুলো

দিয়ে একে এক বুড়ো আঙুলটির মাথা স্পর্শ করুন। এভাবে দুবার ব্যায়ামটি করার পর একই নিয়মে বাম হাতের আঙুলগুলোর ব্যায়াম করুন। ডান হাতের আঙুলগুলোর চারপাশে একটি রাবার ব্যান্ড পেঁচিয়ে নিন। রাবার ব্যান্ডের অবস্থান হবে আঙুলগুলোর মাঝ বরাবর। এবার ধীরে ধীরে রাবার ব্যান্ডের টানের বিরুদ্ধে গিয়ে টান টান করুন হাতের আঙুলগুলো। ১০ বার এভাবে ব্যায়ামটি করতে হবে। এরপর একই নিয়মে বাম হাতের আঙুলের ব্যায়াম করুন।

ঘাড়ব্যথা কমাতে ৫ পরামর্শ

লোখাপড়া বা সাধারণ কাজকর্মের সময় বসার ভঙ্গি বা শরীর ত্রুটিপূর্ণ অবস্থানে রাখার কারণে ঘাড়ে ব্যথা হয়। এই পরিস্থিতিতে অভ্যাস পাল্টে সুফল মিলতে পারে।

১. একই ভঙ্গিতে ঘাড় গুজে ঘণ্টার পর ঘন্টা কাজ করবেন না। অফিসে ডেস্ক বা কম্পিউটারে কেউ কেউ ঘাড় নিচ বা বাঁকা করে কাজ করেন। সে রকম হলে প্রতি ঘণ্টায় একবার হলেও বিরতি নিন। ঘাড়ের হালকা ব্যায়াম করুন বা এদিক-ওদিক একট ঘুরে আসুন।

২. অফিসে কম্পিউটারের মনিটর আপনার চোখের সোজাসুজি রাখুন। আর নিজের ঘরে ল্যাপটপে যখন কাজ করছেন, তখন টেবিল ব্যবহার করুন বা কোলের ওপর একটা বালিশ রেখে তার ওপর ল্যাপটপ রাখুন। ঘাড় আর মাথার ফাঁকে ফোন ধরে একদিকে ঘাড় বাঁকিয়ে কথা বলবেন না। দীর্ঘ সময় হাত দিয়ে ফোন ধরে রাখাও ঠিক নয়। এসব ক্ষেত্রে ইয়ার পড ব্যবহার করতে পারেন।

৩. রাতে ঘুমোবার সময় অনেক বালিশ ব্যবহার করবেন না। এতে ঘাড়ের হাড়ে চাপ পড়ে। পাতলা একটা বালিশ ব্যবহার করুন যেন মেরুদণ্ড সোজা থাকে।

৪. চোখের সমস্যার জন্য আমরা অনেক সময় ঘাড় পেছনে হেলে দেখতে চেষ্টা করি। এ রকম ক্ষেত্রে চোখ পরীক্ষা করান, প্রয়োজনে চশমা ব্যবহার করুন।

৫. টিভি দেখা, গান শোনা বা অলস সময় যাপন করার সময় সোফায় বাঁকা হয়ে শোবেন না। চেয়ার বা সোফায় সোজা হয়ে বা হেলান দিয়ে বসুন। মাঝে মাঝে বিরতি নিন।

হাতের সহজ ব্যায়াম

হাতের গিটে গিটে ব্যথা হতে পারে বাত বা আর্থ্রাইটিসের কারণে, কখনো বা অতিরিক্ত কাজের চাপে। এ রকম ব্যথা কমাতে ও মুঠোর জোর বাড়াতে সহজ কয়েকটি ব্যায়াম করতে পারেন:

১. জোরে হাত মুঠো করুন। ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড পর্যন্ত ধরে রাখুন। তারপর ধীরে ধীরে পুরোটা খুলে আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিন। এই ব্যায়াম কয়েকবার করুন।

২. হাতের তালু টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিন। হাতের তাল পুরোপুরি সমতল করে টেবিলের ওপর চাপ দিতে থাকুন ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড। তারপর শিথিল করুন। অন্তত চারবার এই অনুশীলন করুন।

৩. হাত দুটো নিজের দিকে ফিরিয়ে আঙুল বাঁকা করে তালুতে লাগান, যেমনটা বিড়ালের থাবা থাকে। ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড এভাবে রেখে ছেড়ে দিন। চারবার অনুশীলন করুন।

৪. নরম স্পঞ্জ বা প্লাস্টিকের বল হাতের মধ্যে রেখে চাপ দিন কয়েক সেকেন্ড রেখে ছেড়ে দিন। ১০ থেকে ১৫ বার এটা চর্চা করুন। সপ্তাহে দু-তিন দিন এটা করবেন। এ ধরনের বল বাজারে পাওয়া যায়।

৫. হাতের তালু টেবিলে বিছিয়ে দিন। এবার একটা একটা করে আঙুল ওপরে ওঠান ও কয়েক সেকেন্ড পর নামিয়ে নিন। ৮ থেকে ১২ বার চর্চা করতে পারেন।

৬. হাত শূন্যে ধরে বুড়ো আঙুল দূর থেকে ভাঁজ করে এনে সংখ্যা গোনার মতো করে কনি আঙুলে লাগান, ব্যথা সারাবে। প্রতি বুড়ো আঙুলে চারবার এই ব্যায়াম করবেন।

৭. যাদের হাতে ব্যথা অনেক, তারা ব্যায়ামের আগে হাতটা গরম করে নিলে উপকার পাবেন। এ জন্য প্রথমে একটা গামলায় হালকা গরম পানি নিন। তারপর হাত দুটো সেই পানিতে কিছুক্ষণ চুবিয়ে রাখুন। এতে রক্ত চলাচল বাড়বে ও ব্যায়াম করতে কষ্ট হবে না।

ফ্রোজেন শোল্ডার?

কাঁধের ব্যথাটা বাড়তে বাড়তে এমন মাত্রায় পৌঁছাল যে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো বা হাত গলিয়ে জামা পরতে পারছেন না। হাত ওপরে বা ডানে-বাঁয়ে সরাতে গেলেই ব্যথা করে। একে বলা হয় ফ্রোজেন শোল্ডার। কাঁধের জোড়া বা সন্ধির চারপাশে লিগামেন্ট, টেন্ডন ইত্যাদি মিলে তৈরি হয়ে ক্যাপসুল। এটা সন্ধিকে স্থিতিশীল রাখে। সেই ক্যাপসুল মোটা ও শক্ত হয়ে গেলে ব্যথা হয়। এটা সন্ধির প্রদাহজনিত সমস্যা। এটা অডহেসিভ ক্যাপসুলাইটিস। নড়াচড়া বন্ধ করলে শোল্ডার ফ্রিজ করে তখন বলে ফ্রোজেন শোল্ডার। এই রোগ ৬০-৪০ বছর বয়সী এবং নারীদের বেশি হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস রোগীর ৪০ শতাংশ হয়।

কারা ঝুঁকিতে?

এই রোগের প্রধান কারণ এখনো অজানা। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। যেমন ডায়াবেটিস, ঘাড়ের জোড়ায় আঘাত, থাইরয়েড সমস্যা ইত্যাদি।

হৃদ্‌রোগীরাও এ সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারেন।

চিকিৎসা : ফ্রোজেন শোল্ডার রোগীর কাছে ব্যথাটাকেই প্রধান সমস্যা মনে হতে পারে। কিন্তু আসল সমস্যাটা হলো ঘাড়ের জোড়ায় জড়তা বা শক্ত হয়ে যাবার অনুভব। তবে ব্যথার সময় বেশি ব্যায়াম করতে নেই। ব্যথা কমলে ধীরে ধীরে ব্যায়াম শুরু করতে হয়। আবার এটাও ঠিক যে ব্যথার ভয়ে হাত নাড়ানো বন্ধ রাখলে জয়েন্ট তত বেশি শক্ত হয়ে যাবে। তাই ব্যথা কমানোর ওষুধের পাশাপাশি সঠিক ব্যায়ামই হলো সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা। এই ব্যথা সাধারণত দু-এক বছরের মধ্যে কমে যায়। ব্যথানাশক ওষুধের ব্যবহার কমাতে রোজ পাঁচ মিনিট হালকা গরম বা ঠাণ্ডা সেঁক নিতে পারেন।

কয়েকটি ব্যায়াম : কাঁধ ঘোরানো: কাঁধের দুই পাশে হাত ঝুলিতে রেখে ধীরে ধীরে দুই কাঁধ পর্যায়ক্রমে দুই মিনিট করে সামনে-পেছনে ঘোরানো।

পেন্ডুলাম এক্সরসাইজ : হাতে কিছু ওজন নিয়ে (যেমন পানিভর্তি বোতল) সামনে-পেছনে ১০ বার করে দিনে কমপক্ষে দুবার দোলানো ।

দেয়াল স্পর্শ : ব্যায়ামটি হামাগুড়ির মতো। দেয়ালে ধীরে ধীরে আঙুল নিচ থেকে ওপরে ঠিক ততটুক তুলতে হয়, যতটুক তুললে ব্যথা অনুভূত হবে না।

তোয়ালে ব্যবহার : এই ব্যায়ামে পেঁচানো তোয়ালে কাঁধের পেছনে দিয়ে পিঠের ওপর ফেলে ওঠা-নামা করতে হয়।

টেবিল স্পর্শ : চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর হাত রেখে আঙুল বেয়ে এগোতে হয়।

সারা গায়ে ব্যথা

সর্বাঙ্গে ব্যথা, শরীর মুড়মুড় করে – অনেকেই এমন সমস্যার কথা বলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো তেমন জটিল কিছু নয়। সমস্যাটা অনেক সময়ই থাকে মনে, শরীরে নয়। কিন্তু ফাইব্রোমায়ালজিয়া নামে একটি রোগ আছে, যাতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা হতে পারে। এটি তেমন কোনো ভয়ানক রোগ নয়, কিছু নিয়ম মেনে চললে সমস্যাটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। সাধারণত এ রোগে শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশিতে ব্যথা অনুভূত হয়। ব্যথা তীব্রও হতে পারে। তবে এর পাশাপাশি অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ফুলে যাওয়া বা বিকৃতি দেখা দিলে, জ্বর থাকলে, সেটি ফাইব্রোমায়ালজিয়া নয়; অন্য কোনো ধরনের বাতরোগ। ফাইব্রোমায়ালজিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের ওপরের ও নিচের অংশ-দুই দিকেই ব্যথা থাকে। শরীরের কিছু নির্দিষ্ট অংশে চাপ দিলে ব্যথাটা অনুভূত হয়। রোগী প্রচণ্ড অবসন্নতায় ভুগতে পারেন। রোজকার কাজকর্মে পিছিয়ে পড়তে পারেন। এ ছাড়া প্রায়ই রাতে ঘুম ভেঙে যায়, আর ঘুম আসতে চায় না। মানসিক চাপ, বিষণ্নতা, মনোযোগের ঘাটতি দেখা দেয়। সকালে ঘুম ভেঙে হাত-পায়ে জড়তা কাজ করে। কপালের দুপাশে চাপ ধরে ব্যথা, পেট কামড়ে ধরা বা প্রস্রাবের সময় ব্যথার মতো সমস্যাও হতে পারে। ভয় না পেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই নিশ্চিত হতে পারবেন রোগটা কী। জটিল কোনো সমস্যা না থাকলে জীবনযাপনের ধরনে একট

পরিবর্তন আনুন। নিয়মিত ব্যায়াম করুন। সময়মতো ঘুমান। ঘুমের আগে উত্তেজনাকর কোনো উপন্যাস, নাটক বা চলচ্চিত্র নয়; স্মার্টফোন ব্যবহার বা ভরপেট খাওয়াও নয়। বিকেলের পর চা-কফি নয়। সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি করে নিতে পারেন, যেমন: সুবিধাজনক উচ্চতার চেয়ার-টেবিল বা ফাইল

কেবিনেটের ব্যবস্থা করে নিন। নিজে থেকে ব্যথানাশক খাবেন না, হিতে বিপরীত হতে পারে। ওষুধের ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এ সমস্যা মোকাবিলায় মনের জোরটাই আসল।

সায়াটিকা

অল্প অল্প কোমর ব্যথা থেকেই তীব্র সায়াটিকার উৎপত্তি। কোমর ব্যথা পায়ের দিকে চলে গেলে তাকে সায়াটিকা বলে। কোমরের হাড় ক্ষয় বা চাকতি সরে যাওয়া (পিএলআইডি) জটিলতা থেকে সাধারণত সায়াটিকা হয়। অর্থাৎ সায়াটিক স্নায়ুর গোড়াগুলো দীর্ঘদিন চাপে পড়ে থাকলে এই বৃহৎ স্নায়ুটিতে যে প্রদাহ সৃষ্টি হয় সেটাই সায়াটিকা। এই রোগে রোগী মাঝারি থেকে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। দাঁড়িয়ে থাকলে বা হাঁটলে ব্যথা তীব্রতর হয়। অনেকে শুয়েও থাকতে পারেন না। আরাম পাওয়ার জন্য রোগী এপাশ ওপাশ ছটফট করতে থাকেন। কিন্তু কোনো পজিশনেই আরাম বোধ করেন না। রোগী যদি আগে থেকেই ডায়াবেটিস আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে কষ্ট আরও বেড়ে যায়। ব্যথা ঘুম কেড়ে নেয়। ব্যথার ওষুধও কাজ করে না। অনেকে কোমরে কোনো ব্যথাই অনুভব করে না, ব্যথা নিতম্ব থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি চলে যায়। অনেকে বলেন পা চাবাচ্ছে বা ঝি ঝি ধরে আছে। অনেকে পায়ের গোড়ালি, পাতা বা আঙ্গুলের বোধ পান না বা অবশ হয়েছে মনে করেন। পায়ের স্যান্ডেল ধরে রাখতে পারছেন না বা পা মেঝেতে আছে কিনা বুঝতে পারছেন না। এ ধরনের রোগীকে সমন্বিত চিকিৎসা করতে হয়। পূর্ণ বিশ্রামই এই রোগের প্রধান চিকিৎসা। প্রয়োজন মোতাবেক দিনে তিন চারবার ইলেক্ট্রোথেরাপি প্রয়োগ করা যেতে পারে। ফলে রোগী তীব্র ব্যথা থেকে মুক্তি পাবেন। সাবধানতার সঙ্গে ব্যথার ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত, কারণ ব্যথার ওষুধ পাকস্থলীর প্রদাহ, ডায়াবেটিস রোগী বা কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে সায়াটিক নার্ভ স্ট্রেচিং, থেরাপিউটিক এক্সরসাইজ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই উপকারী। সার্জারির দরকার হলে তখনই শুধ এমআরআই করা উচিত।

হাঁটুব্যথা

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিয়মিত হাঁটাহাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটলে শরীরের ওজন, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে, কমবে হৃদ্‌রোগ ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের (স্ট্রোক) ঝুঁকি। কথাটা অনেকে জানলেও হাঁটতে চান না। না হাঁটার পক্ষে তাদের নানা অজুহাত থাকে। এসবের মধ্যে হাঁটুব্যথার জন্য হাঁটাহাঁটি বন্ধ রাখার প্রবণতা

বেশি দেখা যায়। হাঁটুব্যথা হয় সাধারণত অস্টিওআর্থ্রাইটিসের কারণে। মধ্যবয়সের পরে হাঁটু, কোমর বা পায়ের জোড়া বা সন্ধি বুড়িয়ে যেতে পারে। অস্থিসন্ধিতে দুই হাড়ের মাঝে যে পিচ্ছিল তরল থাকে, তা নড়াচড়ার সময় হাড়ের পরস্পর ঘর্ষণে বাধা দেয়। কিন্তু এই তরল পদার্থ শুকিয়ে গেলে হাড়ের ঘর্ষণে তরুণাস্থি ব্যথা হয়। তখনই শুরু হয় হাঁটুর যন্ত্রণা। বিশেষত মাঝবয়সী নারী, যাদের শরীরের ওজন বেশি-তারাই এ সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হন। তাই দেখা যাচ্ছে, হাঁটুব্যথা কমাতে হলে আপনার শরীরের ওজন কমানো জরুরি। আর ওজন কমাতে কার্যকর একটি উপায় হলো হাঁটা। একাধিক গবেষণায় দেখা যায়, প্রায় আধা কেজি ওজন কমালে হাঁটুর ওপর চাপ প্রায় চারগুণ কমে। তা ছাড়া নিয়মিত হাঁটলে পায়ের মাংসপেশি সুগঠিত হয়ে হাঁটুর ওপর চাপ কমে এবং অস্থিসন্ধির কার্যকারিতা বাড়ে। হাঁটুর ব্যথার অনেক রোগী নিয়মিত না হেঁটে হঠাৎ একদিন অনেক বেশি হেঁটে ফেলেন। ফলে হঠাৎ করে হাঁটুর ওপর চাপ বেড়ে গিয়ে প্রদাহ বেড়ে যায়, বাড়ে ব্যথাও। এর ফলে ওই রোগী পরবর্তী সময়েও হাঁটতে ভয় পান। এ ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে হাঁটতে হবে। প্রথমেই হাঁটার জন্য মসৃণ, সমান্তরাল পথ বেছে নিন। নরম ও আরামদায়ক জুতা পরুন। শুরু করুন প্রতিদিন অন্তত ১০ মিনিট হাঁটা দিয়ে। তার পর প্রতি ১০ দিন অন্তর ৫ থেকে ১০ মিনিট সময় বাড়ান । এভাবে নিয়মিত হাঁটলে দেখা যাবে, এক থেকে দেড় মাসের মাথায় আপনি ৩০ থেকে ৪০ মিনিট টানা হাঁটতে পারবেন। সাধারণত ৩০ মিনিটে প্রায় ৩ হাজার পদক্ষেপ দেয়া যায়- এমন গতিতে হাঁটার চেষ্টা করুন।

কখন হাঁটা বন্ধ করবেন : হঠাৎ হাঁট ফুলে গেলে, ব্যথার তীব্রতা বাড়লে, পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হলে, হাঁটুতে আঘাত পেলে হাঁটা সাময়িক বন্ধ রেখে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ভাঁজ করে বসে থাকলে/ভাঁজ করলে ব্যথা বাড়ে।

রগের সমস্যা?

পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, হাঁটলে পায়ে ব্যথা করে। মনে হয়, পায়ের রগে সমস্যা। আবার কেউ বলে, রক্ত চলে না। রগ বন্ধ হয়ে গেছে। কারও আবার হঠাৎ রগে টান পড়ে। শরীরের ওই অংশ অনুভূতিশূন্য মনে হয়। এমন নানা উপসর্গ আছে। আসলে সাধারণ মানুষ রগ বলতে কখনো রক্তনালি, কখনো স্নায়ু, কখনো-বা মাংসপেশির সঙ্গে যুক্ত টেনডনের সমস্যাকে বোঝান। উপসর্গ অনুযায়ী বুঝে নিতে হয় সমস্যাটা কোথায়। আমাদের শরীরে মূলত দুই ধরনের রক্তনালি আছে: ধমনি ও শিরা। ধমনি ও শিরাগুলো তাদের ছোট-বড় অগণিত শাখা, প্রশাখা, উপশাখাসহ বিন্যস্ত। দুই ধরনের রক্তনালিতেই নানা রকম ব্যথা হতে পারে। যেমন পায়ের ধমনিতে বাধা তৈরি হওয়ার কারণে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং হাঁটতে গেলে পায়ে ব্যথা শুরু হয়। শিরার ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হলে পা ফুলে যায় ও ব্যথা করতে থাকে, যাকে বলে ডিপ ভেনাস থ্রম্বোসিস। আবার চামড়ার নিচের শিরা আঁকাবাঁকা হয়ে ফুলে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে একজন রক্তনালি বিশেষজ্ঞ সমাধান দিতে পারেন। অনেকে স্নায়ুর সমস্যাকেও রগের সমস্যা বলে অভিহিত করেন। স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে, কেটে-ছিঁড়ে যেতে পারে। হাড়ের যে ছিদ্রপথ দিয়ে সেগুলো

বের হয় বা প্রবেশ করে, সেখানে চাপ তৈরি হতে পারে। আর এসবের বহিঃপক্রাশ ঘটে শরীরের আক্রান্ত অংশে ব্যথা, জ্বালাপোড়া, অবশভাব ইত্যাদি উপসর্গের মাধ্যমে। নানা কারণে মাংসপেশিতে টান পড়ে, অনেক সময় মাংসপেশির ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়ে মাংসপেশি শক্ত হয়ে যায়। শরীরের নানা ভুল ভঙ্গির কারণেও মাংসপেশিতে টান পড়ে। যেমন দীর্ঘ সময় একই ভঙ্গিতে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা বা শোয়ার সময় বালিশের সঙ্গে ঘাড়ের অসামঞ্জস্যের কথা বলা যায়। আর এসব কিছুরই সাধারণ বহিঃপ্রকাশ হলো রগে টান বা ব্যথা। আঘাতে শুধু মাংসপেশিই নয়, তার সঙ্গে থাকা রক্তনালি ও স্নায়ুও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অনেক সময় রক্তনালি, মাংসপেশি ও স্নায়ুতে একই সঙ্গে আঘাত লাগে। এমন রোগীদের চিকিৎসায় সাধারণত রক্তনালি, অর্থোপেডিক ও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞদের একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন হয়। মাংস পেশী হাড়ের সাথে টেন্ডন দিয়ে লাগে, টেন্ডনে চোট লাগলেও ব্যথা হয়। টেন্ডনকে অনেকে রগ বলে।

চিকুনগুনিয়া সেরেছে ব্যথা সারেনি

গ্রীষ্মের শুরু থেকেই ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে দেখা দিয়েছে চিকুনগুনিয়া। অতি অল্প সময়ে অধিকসংখ্যক মানুষকে একই সঙ্গে আক্রান্ত করতে পারা এই ভাইরাসের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। জ্বর, র‍্যাশের সঙ্গে প্রচণ্ড গিরাব্যথা ও পেশিব্যথার কারণে এ রোগের আরেক নাম ল্যাংড়া জ্বর। কিন্তু জ্বর ও প্রাথমিক উপসর্গ সেরে যাওয়ার পরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এই গিরাব্যথার স্থায়িত্ব, কখনো কখনো সম্পূর্ণ সেরে যাওয়ার পর আবার নতুন করে গিরা ফোলা বা ব্যথা দেখা দেয়ায় ঘাবড়ে যাচ্ছেন অনেকে। চিকুনগুনিয়াজনিত ব্যথা-বেদনার উপসর্গগুলোকে স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তাৎক্ষণিক, মাঝারি মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি।

তাৎক্ষণিক : জ্বরের শুরু থেকে থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত যদি ব্যথা স্থায়ী হয় তবে তা তাৎক্ষণিক বা একিউট বলা যায়। বেশির ভাগ রোগীরই এ সময়ের মধ্যে সেরে ওঠার কথা। এ সময় সাধারণ প্যারাসিটামল বা ট্রামাডলজাতীয় ওষুধ দিয়ে এই ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জ্বর থাকা অবস্থায় অন্য ব্যথানাশক ও স্টেরয়েড পরিহার করতে হবে।

মাঝারি মেয়াদি : খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তির ব্যথা তিন মাসের অধিক সময় পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এ পর্যায়ে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, স্পনডাইলো আর্থাইটিস, লুপাস ইত্যাদি রোগের পরীক্ষা করতে হবে। তারপর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী বাত নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ সেবন করতে হবে। জ্বর ও প্রাথমিক উপসর্গগুলো পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে সেরে গেলেও চিকুনগুনিয়াজনিত বাতব্যথা আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর একটি দীর্ঘমেয়াদি চাপ ফেলতে যাচ্ছে। মশাবাহিত এ রোগের চিকিৎসা থেকে প্রতিরোধই শ্রেয়।

ত্বক, নখ, চুল

শুষ্ক ত্বক

শীতে ত্বক শুষ্ক হবেই। অনেকের পায়ের ত্বক শুষ্ক হয়ে ফেটে যায়। কারও ত্বক সাদাটে হয়ে যায়, মরা ত্বক উঠতে থাকে। মোট কথা, ত্বকের মসৃণতা যায় হারিয়ে। মেয়েদের সমস্যা একট বেশি প্রকট। থাইরয়েডের সমস্যা মেয়েদেরই বেশি হয়। আর এ সমস্যায় ত্বক খুব বেশি শুষ্ক হয়ে পড়ে। এ ছাড়া খুশকিও এ সময় বেড়ে যেতে পারে। (১) গোসলের সময় অতিরিক্ত গরম পানি নয়, হালকা গরম পানি ব্যবহার করুন। একইভাবে বারবার সাবান দিয়ে ত্বক ঘষবেন না। গ্লিসারিনসমৃদ্ধ বা ময়েশ্চারযুক্ত সাবান হলো ভালো। (২) গোসলের পর ত্বক কিছুটা ভেজা আর্দ্র থাকতে থাকতেই অলিভ অয়েল, গ্লিসারিন ইত্যাদি মেখে নিন। (৩) ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে প্রচুর পানি পান করুন। (৪) ত্বক শুষ্ক হয়ে গেলে চুলকায়। নখ দিয়ে না চুলকে নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল দিয়ে ম্যাসাজ করুন। (৫) মুখমণ্ডল পরিষ্কার রাখতে হালকা পরিষ্কার বা ক্লিনসার ব্যবহার করুন ও পরে তৈলাক্ত ক্রিম লাগান। (৬) উলের বা পশমের কাপড়ের নিচে সুতির জামা পরবেন, যাতে চুলকানি কম হয়। (৭) খুব বেশি শুষ্ক ত্বকে ল্যাকটিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন, ইউরিয়াসমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজিং লোশন, ভ্যাসলিন ব্যবহার করতে হবে। (৮) সপ্তাহে তিন দিন গোসলের এক ঘণ্টা আগে গরম নারকেল তেল মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করলে খুশকি কম হবে। তারপর শ্যাম্প দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এ জন্য কিটোকোনাজল, স্যালিসাইলক অ্যাসিড, সেলেনিয়াম, সালফার ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ শ্যাম্পু ব্যবহার করা যায়।

(একজিমা) চামড়ার এলার্জি

যাদের একজিমা বা চর্মরোগ আছে, তাদের জন্য শীতের সময়টা খারাপ। এই রোগীর ত্বক এমনিতেই শুষ্ক ও খসখসে থাকে, শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় তা আরও প্রকট হয়। চুলকানি থাকে প্রচণ্ড, আর নখ দিয়ে চুলকালে অবস্থা আরও খারাপ হয়, সংক্রমণও হয়ে যায়। ধূলাবালি, ঠাণ্ডা ও শুষ্ক বাতাস, ডিটারজেন্ট বা সাবান- ত্বকের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে চুলকানি ও ফুসকুড়ি-দুটোই বাড়ে। একজিমা রোগীদের ত্বককে আর্দ্র রাখতে হবে। গোসলে বেশি গরম পানি ব্যবহার করবেন না; বেশি বেশি সাবান বা শ্যাম্পুও নয়। গোসলের পর তোয়ালে বা নরম কাপড় দিয়ে পানি সরিয়ে নিন ও আর্দ্র অবস্থাতেই ময়েশ্চারাইজিং লোশন বা তেল মেখে নিন। ময়েশ্চার যা দীর্ঘক্ষণ আর্দ্রতা ধরে রাখে, সেটাই ভালো। যেসব ক্রিম বা লোশনে বাড়তি সুগন্ধি বা রাসায়নিক উপদান নেই, সেগুলোই বেছে নিন। চুলকানি কমানোর জন্য অ্যান্টি-হিস্টামিন খেতে পারেন। এরপরও যাদের ভীষণ চুলকানি হয়, তারা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে মলম ব্যবহার করতে পারেন। ময়েশ্চারাইজিং লোশন ও স্টেরয়েড ক্রিম একই জায়গায় একই সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে না। একজিমা কখনো পুরোপুরি সারবে না। তবে একে নিয়ন্ত্রণে রেখে আপনি ভালো থাকতে পারবেন।

অনাকাঙ্ক্ষিত লোম

হাঠৎ কোনো নারীর নাকের নিচে গোঁফের রেখা দেখা দিলে তা যেমন অস্বস্তিকর, তেমনি দুশ্চিন্তার বিষয়ও বটে। খুবই সামান্য পরিমাণে, হালকা রঙের অল্প কিছু চিক লোম যদি ঠোঁটের ওপরে অংশে কিংবা থুতনির দিকে থাকে, এতে ভয়ের কিছু নেই। যদি এসব স্থানে মাথার চুলের মতো গাঢ় রঙের চুল গজাতে থাকে, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। মেয়েদের ঠোঁটের ওপর এবং থুতনিতে চুল গজানো ছাড়াও তলপেটে বা বুকে চুল গজানো শুরু হতে পারে। এর পাশাপাশি কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে যাওয়া, মাসিকে অনিয়ম এবং মাথার সামনের অংশে দুপাশের চুল পড়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও হতে পারে। শরীরের ওজন বৃদ্ধি, অতিরিক্ত ব্রণ, মুখ ও শরীর ফুলে যাওয়া- এসব লক্ষণ অনাকাঙ্খিত লোমের সঙ্গে দেখা দিলে হরমোনের তারতম্যজনিত সমস্যার কথা ভাবতে হবে। এ ধরনের হরমোনের সমস্যার নেপথ্যে থাকে নানান কারণ, যেমন: ডিম্বাশয়ের কোনো রোগ বা কোনো গ্রন্থির টিউমার। আবার কিছু ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায়ও এমন হতে পারে। সমস্যাটা বংশানুক্রমে হতে পারে। বয়ঃসন্ধির সময় এমন সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। চিকিৎসা নিলে সমস্যা সেরে যায়। রোগনির্ণয়ের আগে লোমনাশী ক্রিম লাগিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে লোম তুলে ফেলার চেষ্টা করা ঠিক নয়। আগে কারণ জানতে হবে, লক্ষণের চিকিৎসা পরে। অন্যান্য কিছ কারণেও নারীর শরীরের বাড়তি লোম দেখা দেয়। যেমন: কারও কপাল, কপালের পাশে বা গালের পাশ দিয়ে, হাত-পায়ে কিছু বাড়তি লোম থাকে। এসব নিয়ে বিচলিত হাওয়া কিছু নেই। তবে শরীরে পুরুষদের মতো লোম গজালে এবং সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ থাকলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসা নেয়া উচিত।

শীতকালে ঠোঁট ফাটা

ভেজা অবস্থায় ঠোঁটে ভ্যাসলিন বা গ্লিসারিন লাগাতে পারেন। এতে ঠোঁট ফাটার ভয় অনেকটাই কমে যায়।

কোনটি ভালো ক্রিম, লোশন নাকি তেল?

ত্বকের গঠন ও প্রকৃতি, শুষ্কতা বা তৈলাক্তভাবের ওপর নির্ভর করে ক্রিম, লোশন বা তেল বেছে নেয়া প্রয়োজন। যেমন শুষ্ক আবহাওয়ায় তেল লাগানো যায়। তবে তেল ব্যবহার করতে চাইলে অলিভ অয়েলই ভালো। ক্রিমের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। শুষ্ক আবহাওয়ায় ত্বকে কোল্ড ক্রিম বা লোশন লাগানো যেতে পারে। ঋতুভেদে ত্বকের পরিবর্তন বিবেচনা করে এবং ত্বকের ধরন বুঝে ক্রিম, লোশন তেল বেছে নেয়াই ভালো।

মুখ ধোয়া (কতবার)

সারাদিনে কতটা সময় বাইরের ধূলাবালিতে থাকা হচ্ছে কিংবা কতটা সময় রোদের উত্তাপে কাজ করে ঘর্মাক্ত হচ্ছেন অথবা বিশেষ পরিবেশে জীবাণ সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে কি না- এসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে মুখ ধোয়া উচিত। যারা ধূলাবালি বা গরমে কাজ করে ঘর্মাক্ত হন, তাদের বারবার মুখ ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ঘরে বা

অফিসের ভেতর কাজ করলে খুব বেশিবার মুখ ধোয়ার প্রয়োজন হয় না, সারাদিনে ৩-২ বার মুখ ধুলেই চলে।

প্রতিবার মুখ ধোয়ার সময়ই কি সাবান বা ফেসওয়াশ

প্রতিবার মুখ ধোয়ার সময়ই সাবান বা ফেসওয়াশ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। সারা দিনে কতবার মুখে সাবান লাগাবেন, এটিও নির্ভর করছে মুখ ময়লা হওয়ার ওপর। মুখে ময়লা, ধূলা লাগলে বা চিটচিটে ভাব চলে এলে সাবান বা ফেসওয়াশ লাগাতে পারেন। ত্বকের তৈলাক্ততা হারিয়ে যেতে পারে অতিরিক্ত সাবান ব্যবহারের ফলে। তাই অতিরিক্ত সাবান ব্যবহার করাও ঠিক নয়। বিশেষ করে শিশুদের ব্যাপারে সতর্কতা জরুরি।

গোড়ালি ফাটলে

শীতকালে অনেকের পায়ের গোড়ালি ফাটে। সাধারণ সমস্যা মনে হলেও এই থেকে নানা জটিলতা হতে পারে। যেমন: ব্যথা তো হয়ই, অনেক সময় পায়ের নিচের ত্বক ফেটে রক্তক্ষরণ হতে পারে। এই ফাটার মধ্য দিয়ে জীবাণ প্রবেশ করে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। আর তা থেকে সেলুলাইটিস হতে পারে। তাই গোড়ালি ফাটারোধে যন্তবান হওয়া দরকার। যেসব কারণে গোড়ালির ত্বক ফাটতে পারে, সেগুলো হলো অতিরিক্ত গরম পানিতে পা বেশি সময় ভিজিয়ে রাখা, পানিশূন্যতা, অতিরিক্ত ঘষাঘষি, ত্বকের শুষ্কতা, অতিরিক্ত ওজন, শক্ত জায়গায় খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি। পেছন খোলা জুতা পরলেও এ সমস্যা বাড়ে। এছাড়া শক্ত পুরু চামড়া বা হাইপারকেরটোসিস, সোরিয়াসিস, জুভেনাইল প্লান্টার ডারমাটোসিস, ডায়াবেটিস ও থাইরয়েডের রোগীদের ঝুঁকি বেশি।

প্রতিকার : শীতকালেও শরীর যেন পানিশূন্য না হয়, সে জন্য প্রচুর পানি পান করতে হবে। গোসলের সময় পিউমিস ষ্টোন ব্যবহার করে শুক্ত মৃত ত্বক তুলে ফেলা ভালো। বারবার ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম ব্যবহার করুন। যারা বারবার পা ভেজান (যেমন অজ করার সময়) তারা প্রতিবারই পা মুছে ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম লাগাবেন। বেশিক্ষণ খালি পায়ে হাঁটবেন না এবং শীতে পেছন খেলা জুতা না পরাই ভালো। হিলপ্যাড ব্যবহার করতে পারেন। ইউরিয়া, স্যালিআইলিক অ্যাসিড, আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিড এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডযুক্ত ক্রিম ব্যবহার করা ভালো, ডায়াবেটিস, স্নায়ুর সমস্যা বা থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে তার যথাযথ চিকিৎসা নিন। সংক্রমণ, আলসার বা ঘা হয়ে গেলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শীতকালীন সমস্যা

শীতে ত্বকের অসুখ

একজিমা: শুষ্কতার কারণে ত্বক ফেটে যায়। আর্দ্রতার অভাবে ত্বকে এ সময় চুলকানি হতে পারে। সাধারণত পা বেশি আক্রান্ত হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা বেশি ভোগেন। অতিরিক্ত গরম পানি দিয়ে দীর্ঘ সময় গোসল করলে অতিরিক্ত সাবান ব্যবহার করলে বা গোসলের পর শক্ত খসখসে তোয়ালে দিয়ে ঘষলে ত্বকের শুষ্কতা আরও বাড়বে।

খুশকি : শীতকালে খুশকি বা সিবোরিয়ার প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। মাথা ছাড়াও ভ্রু, চোখের পাতা, পিঠ, বুকের লোমযুক্ত অংশ, বগলসহ অন্যান্য অংশে খুশকি হতে পারে। এ সময় সাদা মরা ত্বক ওঠে, চুলকায়। এটি চুল পড়ার অন্যতম কারণ। তাই খুশকি হলে চিকিৎসা নেয়া উচিত।

সোরিয়াসিস : সোরিয়াসিসের তীব্রতা এ সময় বাড়তে পারে। হাঁটু, কনুই, মাথার ত্বক, হাত-পা বেশি আক্রান্ত হয়। মাছের আঁশের মতো চামড়া ওঠে। তবে চুলকানি না-ও থাকতে পারে। যাদের সোরিয়াসিস আছে, তারা শীতের শুরুতেই সাবধান হোন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস : ২ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুরা এ সমস্যায় আক্রান্ত হয় বেশি। তবে বড়দেরও এটা হতে পারে। অ্যালার্জি বংশগত এবং তাদের ত্বক এমনিতেই শুষ্কতা বেড়ে গিয়ে চুলকায়। এ ছাড়া সংক্রমণও হয়। উলের কাপড়ে অ্যালার্জি হতে পারে। এ সময় ত্বক আর্দ্র রাখতে হবে।

কেরাটোসিস পিলারিস : বাহু, উরুর বাইরের অংশ গাল এবং পেটের পাশে লোমকূপের গোড়ায় ছোট দানার মতো দেখা দেয়। এটি একটি জিনগত রোগ, কিন্তু শীতকালে বেড়ে যায়। চামড়া স্যান্ড পেপারের মত হয়। এটা কোন ক্ষতিকারক অসুখ নয়।

ঘামাচি

খুবই পরিচিত একটি সমস্যার নাম ঘামাচি। এটি যেমন অস্বস্তিকর, তেমনি যন্ত্রণাদায়ক।

ঘামাচি কেন হয়

১. গরম আবহাওয়ায় শরীরের ঘামগ্রন্থির নালি বন্ধ হয়ে ঘামের বিভিন্ন স্তরে উপাদান চামড়ার বিভিন্ন স্তরে জমা হয়ে ঘামাচি তৈরি করে। শিশুদের ঘর্মগ্রন্থি অপরিপক্ব, তাই ঘামাচি তাদের বেশি হয়।

২. আঁটসাঁট পোশাক এবং কয়েকটি ওষুধের প্রভাবে ঘামাচি বাড়ে। ত্বকে বসবাসকারী স্ট্র্যাফাইলোকক্কাস এপিডার্মিডিস ব্যাকটেরিয়া ঘর্মগ্রন্থি বন্ধ করার নেপথ্যে ভূমিকা রাখে।

৩. অতিরিক্ত জ্বরের কারণেও ঘামাচি হতে পারে।

ঘামাচির ধরন : শিশুদের মাথা, ঘাড়, বগল, শরীরের ওপরের অংশে রানের ভাঁজে, কনুই ও হাঁটুর ভাঁজে ঘামাচি দেখা যায়। বড়দের সাধারণত বুকে-পিঠে-পেটে ঘামাচি হয়। কয়েক ধরনের ঘামাচি আছে। যেমন মিলিয়ারিয়া ক্রিস্টালিনা নামের ঘামাচি শিশুদের, এমনকি জন্মের পর দ্বিতীয় সপ্তাহেই দেখা দিতে পারে। বড়দের ক্ষেত্রে এটা কম দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ছোট ছোট দানা হয়। এগুলো সাধারণত কিছু দিনের মধ্যে আপনা-আপনিই সেরে যায়। মিলিয়ারিয়া রুব্রা নামের আরেকটি ঘামাচিতে ঘর্মগ্রন্থির নালির গভীরে ব্লক বা বাধা তৈরি হয়। ফলে ত্বকে লাল দানা হয়। ছোট-বড় সবারই এটা হয়ে থাকে। এই ঘামাচিতে খুব চুলকায় এবং জ্বালাপোড়া করে। আর মিলিয়ারিয় প্রোফান্ডা নামের ঘামাচি ত্বকের গভীর স্তরে ঘাম নিঃসরণের ফলে জমা হয়।

ঘামাচির ক্ষতিকর দিক : অতিরিক্ত ঘামাচির কারণে অস্বস্তি, জ্বালাপোড়া, শারীরিক দুর্বলতা ঘামে অসহনশীলতা, ক্ষুধামন্দা, মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা হতে পারে। পরবর্তী সময়ে ঘাম নিঃসরণ প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ঘামের পরিমাণ কমে যেতে পারে। চামড়ায় ইনফেকশন হতে পারে।

মুক্তির উপায় : শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা ঘরে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করলে ঘামাচি থেকে দ্রুত পরিত্রাণ মেলে। নিয়মিত গোসল করতে হবে। আক্রান্ত স্থানে ঠাণ্ডা পানি ও বরফ লাগাবেন। ঢিলেঢালা সুতি পোশাক পরুন। ঘুমন্ত শিশুকে বারবার পাশ পরিবর্তন করে দিন। ট্যালকম পাউডার ব্যববহার করতে পারেন। অতিরিক্ত গরম পরিবেশে এড়িয়ে চলুন। গরমে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম থেকে বিরত থাকুন। ক্যালামাইন লোশন কাজে দেয়। জটিলতা হলে চর্ম বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে স্টেরয়েড ও অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ক্রিম ব্যবহার করতে হবে।

মাথার চুল পড়া

প্রতিদিন ৫০ থেকে ১০০টা চুল পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। রক্তশূন্যতা, সন্তান প্রসবের পর, দীর্ঘমেয়াদি জ্বর বা অসুস্থ বা মানসিক চাপ ও হরমোনজনিত কারণে এই চুল পড়ার হার বেড়ে যেতে পারে, যা পরে ফিরে পাওয়া সম্ভব। হঠাৎ মাথার কোনো অংশে চুল পড়ে যাওয়াকে অ্যালাপেসিয়া এরিয়াটা বলা হয়। এরও চিকিৎসা আছে। অনেকের বংশগত কারণে বেশি চুল পড়ে, আবার ভুল শ্যাম্পু, স্প্রে বা অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের কারণেও চুল পড়ে।

- চুল পড়ার পেছনে কারণ আছে কিনা সেটা খুঁজে বের করা উচিত ও কারণটির চিকিৎসা জরুরি।
- প্রথম দিকে কিছু স্প্রে বা ওষুধ, ভিটামিন ইত্যাদি দিয়ে চুল পড়া কমানোর চিকিৎসা করা হয়।
- পরবর্তী আধুনিক চিকিৎসা হলো পিআরপি। এতে নিজের রক্তের উপাদান প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা ইনজেকশনের মাধ্যমে মাথার ত্বকে দেয়া হয়। প্রতি মাসে একবার করে ৬ থেকে ৮ মাস চিকিৎসা নিলে চুল পড়া বন্ধ হয় ও ভালো ফল পাওয়া যায়। পিআরপির সঙ্গে মাইক্রোনিডলিং পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়।
- যাদের মাথায় টাক, তাদের জন্য হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, তেমন পরিচর্যারও দরকার নেই। তিন মাসের মধ্যে পরিপূর্ণ চুল দেখা যায়।
- চুলহীন মাথায় নতুন চুল গজানোর এসব চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে।

চুল পড়া

চুল পড়ার সাধারণ কারণগুলো:

১. Iron deficiency (Ferritin) – যদিও আপনার রেজাল্ট ৬০, এটি চুলের জন্য borderline।

২. Stress বা মানসিক চাপ।

৩. Postpartum hair loss (যদি আপনি সম্প্রতি সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন)।

৪. Hormonal imbalance – যেমন PCOS।

৫. Nutritional deficiency – যেমন Vitamin D, B12, Zinc, Protein ইত্যাদির ঘাটতি।

৬. Androgenetic alopecia – জেনেটিক কারণে চুল পাতলা হয়ে যাওয়া (নারীদের ক্ষেত্রেও হতে পারে)।

৭. Wrong hair care – কেমিক্যাল, হিট, বা অতিরিক্ত বাঁধা।

করণীয়

● খাদ্যাভ্যাস ও সাপ্লিমেন্ট:

- Iron-rich খাবার খান (যেমন: কলিজা, পালং শাক, ডাল, কুমড়ার বিচি)।
- Vitamin C (যেমন: লেবু, কমলা) iron absorption বাড়ায়, তাই iron-rich খাবারের সাথে খাওয়া উচিত।
- Zinc, Vitamin D, Vitamin B12, Biotin – এই ভিটামিন গুলো চুলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।
- আপনি চাইলে multivitamin সাপ্লিমেন্ট নিতে পারেন (যেমন: Nutrifactor Biotin Plus, Hairfinity, Sugar Bear Hair ইত্যাদি) - তবে চিকিৎসকের পরামর্শে।

● বাহ্যিক চুলের যত্ন:

- Minoxidil 2% /5% (চিকিৎসকের পরামর্শে) - এটি চুল পড়া কমায় ও নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।
- Gentle, sulfate-free shampoo ব্যবহার করুন।
- চুলে তেল ম্যাসাজ করুন (Castor oil, Coconut oil, Rosemary oil ইত্যাদি) - কিন্তু অতিরিক্ত না।

● মানসিক চাপ কমান:

- নিয়মিত ঘুম, ধ্যান, হালকা ব্যায়াম - মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি চুলের জন্য সহায়ক।
- Ferritin: 60 ng/ml – এটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য রেঞ্জে (প্রায় 30-200 ng/ml), তবে চুল পড়া সমস্যার ক্ষেত্রে Ferritin $\geq$ 70-100 ng/ml হলে চুল গজাতে বেশি সহায়তা করে। অর্থাৎ, আপনার ফেরিটিন লেভেল একটু বেশি হলে ভালো।
- TSH: 1.0 μIU/ml – এটি একদম স্বাভাবিক থাইরয়েড ফাংশনের মধ্যেই পড়ে। থাইরয়েডজনিত কারণে চুল পড়ার সম্ভাবনা কম।

পায়ের তলায় কড়া

পায়ের নিচের অংশের ত্বক শক্ত হয়ে যায়, কড়া পড়ে অনেকের। সাধারণত অতিরিক্ত বা বারবার চাপ পড়ার কারণে চামড়ার কোনো অংশ এ রকম শক্ত হয়ে যায়। এতে ব্যথাও করতে পারে। পায়ের তুলনায় ছোট বা অসমতল জুতো পরে হাঁটলে কড়া পড়তে পারে। এ ছাড়া হাঁটাচলার অস্বাভাবিকতা,পায়ের স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা, পায়ের অস্বাভাবিক আক তি, ডায়াবেটিস ইত্যাদি কারণেও কড়া পড়ে। বয়স্ক ব্যক্তিদের এই সমস্যা বেশি হতে দেখা যায়।

- পায়ের আকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে জুতা পরুন। যে জুতা পরার কারণে কড়া পড়তে শুরু করেছে, তা পাল্টে ফেলুন।
- সঠিক নিয়মে হাঁটার অভ্যাস করুন, যাতে পায়ের কোনো একটি অংশে চাপ বেশি না পড়ে, বরং পুরো পায়ের পাতার ওপর শরীরের ভার ছড়িয়ে পড়ে।
- গোসলের সময় হালকা গরম পানিতে ১০ মিনিট পা ডুবিয়ে রেখে পিউমিস স্টোন দিয়ে পুরু চামড়ার ওপরের অংশটুকু ঘষে নিলে উপকার মেলে।
- ডায়াবেটিস ওস্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা থাকলে চিকিৎসা নিন। পায়ের আকৃতি ও গঠনের সমস্যাও চিকিৎসককে জানান।
- প্রয়োজনে চর্ম বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী স্যালিসাইলক অ্যাসিড প্লাস্টার, ইউরিয়া ক্রিম, ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সার্জারি বা ইলেকট্রো সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে।
- পায়ের কড়ার চিকিৎসা করা উচিত। কেননা, দীর্ঘদিন এভাবে থাকলে পায়ে সংক্রমণ ও পায়ের হাড়ে সমস্যা হতে পারে।
- অনেক ক্ষেত্রেই এটা নিজে নিজে বিলীন হয়ে যায়।

চিকুনগুনিয়ায় ত্বকের সমস্যা

এ রোগে জ্বর ও গিরাব্যথার সঙ্গে একটা উল্লেখযোগ্য উপসর্গ হচ্ছে ত্বকে নানা ধরনের র‍্যাশ ও চুলকানি। ত্বকের কিছু কিছু সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং বেশ জটিলতার সৃষ্টি করে। বর্ষার আরেক সাধারণ ভাইরাস জ্বর ডেঙ্গ জ্বরের সঙ্গেও ত্বকে র‍্যাশ দেখা দিয়ে থাকে। তবে চিকুনগুনিয়ার সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য আছে। ডেঙ্গু জ্বরে সাধারণত র‍্যাশ দেখা দেয় জ্বরের ৬ষ্ঠ দিনে, জ্বর নেমে যাওয়ার সময়। চিকুনগুনিয়ায় জ্বর কমে যাওয়ার পর এমনকি জ্বরের শুরুতেই র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। লাল বর্ণের ছোট ছোট গোটা, হাত-বুক-পিঠজুড়ে উঠতে দেখা যায়। এগুলো বেশ চুলকায় ও চুলকানির মাত্রা মাঝে মাঝে তীব্র। এটাও ডেঙ্গুর সঙ্গে এই র‍্যাশের তফাত। সাধারণত চার বা পাঁচ দিন পর র‍্যাশ কমে যায়। কিন্তু অনেক রোগীর র‍্যাশ কমে যাওয়ার পর শরীরের বিভিন্ন স্থানে, যেমন মুখ, কান, হাত, পায়ে বিভিন্ন আকৃতির কালো দাগ বা পিগমেন্টেশন দেখা দিতে পারে। এগুলো দেহের অনাবৃত অংশেই হয়। তাই ধারণা করা হয়, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে হচ্ছে। এ ধরনের কালো দাগ দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে তাই আগের তুলনায় কালো দেখাচ্ছে বলে মনে হয়। চিকুনগুনিয়া রোগে ত্বক সূর্যের রশ্মির প্রতি অতিসংবেদনশীল হয়ে উঠে। ফলে সূর্যের আলোতে গেলে ত্বক জ্বালা করে ও বেশি চুলকায়। ত্বকে র‍্যাশ ও পিগমেন্টেশন ছাড়াও চিকুনগুনিয়ার কারণে ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় ঠোঁট, হাতের তাল ও পায়ের তলার চামড়া ফেটে গিয়ে চামড়া উঠতে পারে। এমনকি কোথাও কোথাও জলবসন্তের মতো দানাদার পানিযুক্ত গোটাও দেখা দিতে পারে। ঠোঁটের কোণ, জননেন্দ্রিয় ও বিভিন্ন ভাঁজে ঘা হতে পারে, যা অত্যন্ত ব্যথাদায়ক এবং দু-তিন সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে রোগীকে ভোগান্তির মাঝে ফেলে দেয়। মুখের ভেতর, মাড়ি ও জিভেও ঘা হতে পারে। তবে কালো রং ছাড়া কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

প্রতিকার

চিকুনগুনিয়াজনিত ত্বকের এসব সমস্যা ব্যথা ও কষ্টদায়ক বটে, তবে এগুলো তেমন কোনো জটিলতা বয়ে আনে না। এসব সমস্যা জ্বর গিরাব্যথার মতোই নিজে নিজে সেরে যাবে। চুলকানি তীব্র হলে অ্যান্টি-হিস্টামিনজাতীয় ওষুধ বা স্টেরয়েড মলম ব্যবহার করা যায়। ত্বকের শুষ্কতার জন্য পর্যাপ্ত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। সানব্লক ক্রিম ব্যবহার করলে সূর্যের আলোতে জ্বালাপোড়া কমবে। চিকুনগুনিয়া ছাড়াও ডেঙ্গু, হাম, জলবসন্ত টাইফয়েড ও অন্যান্য সংক্রমণজনিত রোগেও ত্বকে র‍্যাশ হতে পারে। তাই ত্বকে র‍্যাশ হলেই তা চিকুনগুনিয়া নয়। জ্বরের সঙ্গে ত্বকে র‍্যাশ থাকলে তা চিকিৎসককে অবহিত করুন বা ছবি তুলে রাখুন। যথেষ্ট পানি ও অন্যান্য তরল পান করুন। পানিশূন্য হতে দেবেন না। পুষ্টিকর ও ভিটামিনযক্ত ফলমূল খান।

ব্রণ

কেন, কীভাবে?

বয়ঃসন্ধির সময়ই সাধারণত ব্রণের সমস্যাটি বেশি দেখা দেয়। ২৫-২০ বছর বয়স পর্যন্ত এ সমস্যায় অনেকে ভোগে। মুখেই ব্রণ হয় বেশি। তবে পিঠ, বুক ও হাতের উপরিভাগে হওয়াও বিচিত্র নয়। ত্বকের তেলগ্রন্থি বা সেবাসিয়াস গ্রন্থির অতিকার্যকারিতার কারণে যদি অতিমাত্রায় তৈলাক্ত সেবাম তৈরি হতে থাকে, তবে তা একসময় গ্রন্থের মুখ বন্ধ করে দেয়। তখন ব্রণ হয়। কখনো গ্রন্থি ফেটে গিয়ে প্রদাহ হয় ও গোটা হয়ে ফুলে ওঠে। হরমোনজনিত তারতম্যও ব্রণের জন্য দায়ী।

ব্ল্যাকহেড, হোয়াইট হেড

ব্রণ বিভিন্ন চেহারার হতে পারে। যেগুলোর মুখ কালো সেগুলো ব্ল্যাকহেড। আবার সাদা মুখ বা লাল (প্রদাহজনিত) মুখের ব্রণও হতে পারে। ব্রণে কখনো কখনো ব্যথা হতে পারে, পুঁজ হতে পারে এমনকি মাঝে মধ্যে গোটা থেকে সাদা ময়লার মতো বেরোতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরে কালো দাগ ও ক্ষত হয়ে যায়।

খাবারের সঙ্গে ব্রণের কোনো সম্পর্ক নেই। তৈলাক্ত খাবার খেলেই যে ব্রণ হবে, এমন কোনো কথা নেই। তবে মোটা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। কেননা সেটা হরমোনজনিত হতে পারে। ব্রণ হলে বারবার মুখ ফেসওয়াশ বা স্ক্রাবার দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে, এ ধারণাও ভুল। বরং বেশি বেশি এভাবে ধুলে ত্বকের স্বাভাবিক তেল হারিয়ে প্রদাহ বেশি হতে পারে। মুখ মোছার তোয়ালে বা কাপড় সব সময় পরিচ্ছন্ন হতে হবে। এটা ঠিক যে ব্রণ খোঁটা উচিত নয়। এতে জীবাণ আরও ছড়াবে ও প্রদাহ বাড়বে।

ব্রণের চিকিৎসা

ব্রণের চিকিৎসা প্রতিনিয়ত আধুনিকতর হচ্ছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্রণের প্রকার, আনুষঙ্গিক জটিলতা, রোগীর বয়স এবং সময়কাল বিবেচনা করা হয়। প্রথমত চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের ক্রিম, যেমন: ইরাইথ্রোমাইসিন, ক্লিনডাসিন, এজিলিক অ্যাসিড, ট্রেটিনয়েন, বেনজাইল পার-অক্সাইড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কাজ না হলে বা রোগ তীব্র হলে এর পাশাপাশি মুখে খাবার ওষুধও, যেমন: এজিথ্রোমাইসিন, ডক্সিসাইক্লিন, ক্লিনডামাইসিন ইত্যাদি দেওয়া হয়। কখনো এরপরও ব্রণ হতে থাকে বা কখনো বড় গোটা বা ফোঁড়ার মতো দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর হলো আইসো ট্রেটিনয়েন ক্যাপসুল। তবে এটি ব্যবহারে কিছু সতর্কতা জরুরি এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই ব্যবহারযোগ্য নয়। হরমোনজনিত সমস্যায় অ্যান্টিএনোড্রাজেন দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। ব্রণ চিকিৎসায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও বেড়েছে। বিশেষ করে ব্রণ-পরবর্তী দাগ বা ক্ষত সারাতে এগুলো কার্যকর । যেমন: মাইক্রোনিডলিং, মেসোথেরাপি,

রেডিওফ্রিকোয়েন্সি, পিআরপি, মাইকোডার্মাব্রেশন, লেজার ইত্যাদি। মনে রাখবেন ব্রণের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি ও এতে ধৈর্য প্রয়োজন। আধাআধি চিকিৎসা করে ছেড়ে দেবেন না। ব্রণ চিকিৎসায়ও সারে।

সুস্থ ত্বকের জন্য ব্যায়াম?

নিয়মিত ব্যায়াম আপনার হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, রক্তনালিকে ভালো রাখে- এ কথা তো কমবেশি সবাই জানেন। কিন্তু ত্বক ভালো রাখার বিষয়ে ব্যায়ামের কি কোনো ভূমিকা আছে? শারীরিক ব্যায়াম করলে ত্বকের নিচের রক্তনালিতে রক্ত চলাচল বাড়ে। এভাবে ত্বকে অক্সিজেন ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ নিশ্চিত হয়। একইভাবে ত্বকের জন্য ক্ষতিকর উপাদান সরিয়ে নিতেও ব্যায়াম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এ চাড়া নিয়মিত ব্যায়াম আমাদের মানসিক চাপ বা স্ট্রেস কমায়। স্ট্রেস কমলে ব্রণ, সোরিয়াসিস ইত্যাদি উপসর্গ কমে। অ্যালার্জি, একজিমা বা সোরিয়াসিসে আক্রান্ত লোকজন বাইরে হাঁটাহাঁটি বা ব্যায়াম করলে, তাদের রোগের উপসর্গ বাড়ে না। এসব সমস্যায় ব্যায়াম করতে কোনো বিধিনিষেধ নেই।

- প্রখর রোদ ত্বকের ক্ষতি করে। তাই ব্যায়াম বা হাঁটার সময় সকাল বা বিকেলের মিষ্টি রোদ বেছে নিন। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে বাইরে ব্যায়াম না করাই ভালো।
- বাইরে সূর্যালোকে ব্যায়াম করার সময় ত্বকে ভালো মানের সানস্ক্রিন লাগিয়ে নেয়া ভালো। অনেকে এটা লাগাতে চান না, কারণ ঘাম বেশি হয়। কিন্তু তেলবিহীন বা পিএইচ ব্যালান্স সানস্ক্রিনে অত ঘাম হয় না। তবে বেশি ঘেমে গেলে সানস্ক্রিন সরে যায়, তাই রোদে বের হলে ফুলহাতা জামা-প্যান্ট পরাই ভালো।
- অনেকের বাইরে ব্যায়াম করার পর গায়ে ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ ওঠে, কারও ব্রণ বেড়ে যায়, কারও ত্বক জ্বালা করে। এদের জন্যও প্রখর রোদে বের না হওয়া ভালো। ঢিলেঢালা সুতির জামা পরে ব্যায়াম করবেন। মেকআপ নিয়ে ব্যায়াম করতে কখনোই বেরোবেন না। আগেই মুখের ত্বক পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলে ব্রণ কম হবে। ফিরে এসে গোসল সেরে নিন এবং সারা গায়ে হালকা ময়েশ্চার লাগান।
- সাঁতারের মতো ব্যায়াম করার পর অবশ্যই ভালো করে গোসল করে নিন এবং ত্বকে ময়েশ্চার লাগান। কেননা পুলের পানিতে ক্লোরিন থাকে, যা ত্বককে শুষ্ক করে দেয় এবং কখনো জ্বালাও করে।

শিশু কিশোর

শীতে শিশুর গোসল

শীত মানে শিশুদের নিয়ে বাড়তি শঙ্কা, এই বুঝি ঠাণ্ডা লেগে গেল। শীতে গোসল করাতে গিয়ে দুশ্চিন্তা। আসলে কিন্তু সরাসরি ঠাণ্ডার কারণে শিশুরা অসুস্থ হয় না। যেসব ভাইরাস শিশুদের সর্দি-কাশি ও জ্বরের জন্য দায়ী, তাদের প্রকোপ ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। এতেই শীতে সর্দি-কাশি বেশি হয়। তাই শীতে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার পাশাপাশি রোগজীবাণু থেকে দূরে থাকতে হবে। শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আর পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে নিয়মিত গোসল করাতেই হবে। শীতে গোসলের পানি কুসুম গরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। গোসল করানোর আগে দেখে নিন পানি সঠিক তাপমাত্রার কিনা। এই পানিতে অ্যান্টিসেপ্টিক বা অন্য কিছু দেয়ার প্রয়োজন নেই। গোসলের পর সরিষার তেল দেয়ারও দরকার নেই। অবশ্য আগে তেল মাখলে ক্ষতি নেই। খুব বেশি সময় নিয়ে গোসল না। পাঁচ থেকে সাত মিনিটেই সম্পন্ন করুন। শিশুরা বাথরুমে ঢুকলে বের হতেই চায় না। গোসলের পানি গরম করা ও বহন করার সময় সতর্ক থাকুন, যেন দুর্ঘটনা না ঘটে। গিজার থাকলে তা যেন সময়মতো বন্ধ করা হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। যদি শৈত্যপ্রবাহের কারণে খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়ে যায়, তবে ওই ক'টা দিন ঘন ঘন গোসল না করালেও চলে। এ সময় পাতলা কাপড় পানি ভিজিয়ে শরীরটা ভালোভাবে মুছে দিন। সদ্যোজাত শিশুর জন্মের প্রথম দুই দিন গোসল করানো উচিত নয়। এরপর থেকে গোসল করাতে পারেন। অন্যদিকে আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকসের নির্দেশনা হলো শিশুকে প্রথম বছরে সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার গোসল করালেই চলে। তবে সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ ও কম ওজনের শিশুর ক্ষেত্রে গোসলের ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শিশুর বমি ভাব?

খাওয়াতে চাইলে ঠোঁট উল্টে ওয়াক বমির ভাব শিশুদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। তবে এটা কেবল অনিচ্ছা নয়, কোনো অসুখের লক্ষণ বা উপসর্গও হতে পারে। মনোজাগতিক কারণেও শিশুরা বমির মতো ভাব করে থাকে। হয়তো সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাতে চায়, স্কুলে যেতে তার ভালো লাগে না অথবা কোনো দৃশ্য বা গন্ধ তার অসহ্য লাগছে কিংবা এ মুহূর্তে সে খেতে চাইছে না। অনেক শিশুই আছে যাদের মানসিক চাপ বা টেশনের বহিঃপ্রকাশ বমির মাধ্যমে ঘটে। আবার বেশির ভাগ শিশুরই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খেতে ইচ্ছে করে না, বমি ভাব হয়। কোনো খাবার অপছন্দের হলো এমন হতে পারে। শিশুদের বদহজম বা পেটে গ্যাসও হতে পারে। চর্বিযক্ত খাবার, ফাস্ট ফুড বা চকলেট বেশি খেয়ে ফেললে পেটে গ্যাস হয়ে বমি ভাব হতে পারে। যেকোনো ওষুধ খাওয়ার সময় শিশুরা ওয়াক করতে পারে। রক্তশূন্যতা, যকৃতের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস, কৃমি সংক্রমণ, মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ এমনকি মস্তিষ্কের টিউমার হলেও বমি হতে পারে।

প্রতিকার

স্কুলে যাওয়ার দুশ্চিন্তা থাকলে এমন হয়। এ সময় শিশু ঠিকমতো নাশতাও খেতে চায় না। খোঁজ নিতে হবে - ছুটির দিনেও এমন হয়, নাকি কেবল স্কুলের দিন? স্কুলে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না খোঁজ নিন। শিশু কোনো মানসিক টানাপোড়নে ভুগছে কিনা লক্ষ্য করুন। চোখ হলুদ, প্রস্রাবের হলুদ রং হেপাটাইটিসের লক্ষণ, লিভারের পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। শৈশবে ব্রেন টিউমারের কারণেও বমি হতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক বা খিঁচুনি নিরোধক ওষুধের কারণে শিশুর বমি ভাব হতে পারে। অল্প বয়সে মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণে বমি ভাব হতে পারে। তাই প্রস্রাবের কালচার পরীক্ষা করাতে পারেন।

কিশোর-কিশোরীদের টিকা

টিকা শুধ নবজাতক বা ছোট শিশুদেরই জন্য নয়। কৈশোরেও কিছু টিকা বা ভ্যাকসিন দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ধরা যাক, কোনো কিশোর বা কিশোরী শিশু বয়সে ইপিআই সিডিউলে থাকা সব কটি টিকা পেয়ে গেছে। তাদের কি আর টিকা নিয়ে কোনো পরামর্শ থাকতে পারে? উত্তর হলো- হ্যাঁ, পারে। শৈশব পেরিয়ে এখন কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালে যাদের অবস্থান, তাদের রোগ প্রতিরোধ নিশ্চিত করার জন্য কিছ টিকাদানের পরামর্শ আছে। যেমন- ইপিআই সিডিউলে থাকা হুপিং কাশির যে তিন ডোজ ভ্যাকসিন শিশু তার 'ডিপিটি'তে পেয়েছে, দেখা যায় ৫ থেকে ৮ বছরের মাথায় তার কার্যকারিতা অনেকাংশে লোপ পায়। এর ফলে অনেক যুবা ও বৃদ্ধ হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হতে পারে। একইভাবে এ বয়সে এসে শিশুর ধনুষ্টঙ্কার, ডিপথেরিয়া, মেনিনজাইটিস ও জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিন গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। বালিকা ও কিশোরীদের ভবিষ্যতে জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস টিকা অল্প বয়সেই শুরু করার নিয়ম। কিশোর-বয়ঃসন্ধিকালের শিশুদের জন্য যেসব ভ্যাকসিন প্রচলিত আছে তা হলো: *টিটোনাস (টিডিএপি): ১২-১১ বছর বয়সে। * হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি): ৩ ডোজ, ১২-১১ বছর বয়সে এবং ১২ থেকে ২৬ সব নারী। তবে ৯ বছর বয়স পূর্ণ হলে আরো টিকা দেয়া যায়। * মেনিন গোকক্কাল এমসিভি ১২-৪:১১ বছর বয়সে, তবে ১৮-১১ বছরের সবাই এ টিকা নিতে পারে। ১৬ বছর বয়সে একটা বুস্টার ডোজ। ইনফ্লুয়েঞ্জা: প্রতিবছর। ইদানিং হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা (HIV) সহ ৫টা অসুখের ভ্যাক্সিন চালু হয়েছে।

শিশুর ডায়রিয়া

শীতকালে শিশুদের প্রায়ই ডায়ারিয়া হয়। এর ৬০ শতাংশ ভাইরাসজনিত। এই ডায়রিয়া ৩ থেকে ৯ দিন পর্যন্ত থাকে। রোটা ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া শিশু দ্রুত পানিশূন্যতায় ভোগে। তাই বারবার খাওয়ার স্যালাইন ও অন্যান্য তরল খাবার দিতে হবে। সঙ্গে অবশ্যই বুকের দুধ ও সাধারণ অন্যান্য খাবার। স্যালাইন ধীরে ধীরে খাওয়াতে হবে। প্রতি মিনিটে এক চামচ করে এবং প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ১ থেকে ১৫ চামচ

পরিমাণ। মনে রাখবেন, ডায়রিয়ার চিকিৎসায় স্যালাইন ও সাধারণ খাবারদাবারই যথেষ্ট। জ্বর থাকলে বা পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হয়, নয়তো এমনিতেই সেরে যাবে। ডায়রিয়া বন্ধ করার কোনো ওষুধ নেই, দরকারও নেই। খুব বেশি পানির মতো পাতলা পায়খানা হতে থাকলে, বারবার বমি, এমনকি স্যালাইন খেলেও বমি হলে স্যালাইন বা কোনো খাবার খেতে না পারলে, জ্বর বা মলের সঙ্গে রক্ত, অতিরিক্ত পানিশূন্য হয়ে গেলে হাসপাতালে যেতে হবে।

ডায়রিয়া প্রতিরোধ সচেতনতা : শিশুর খাবার সব সময় ঢেকে রাখুন বাসি বা বাইরের খোলা খাবার শিশুকে খাওয়াবেন না। দুধ খাওয়াতে বোতল ব্যবহার করা যাবে না। খাওয়ার পানি কমপেক্ষ আধঘণ্টা ফুটিয়ে নিন। শিশুর হাত ও বাটি-চামচ ধুতেও এই পানি ব্যবহার করবেন। ১২ মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধু বুকের দুধ দেবেন।

শীতে শিশুর জন্য তেল

শীতে শিশুদের ত্বক হয়ে পড়ে শুষ্ক। আর শিশুদের ত্বক নাজুক বলে শুষ্ক ত্বক দ্রুতই ফেটে যায়। তাই ত্বকের সুরক্ষায় অনেক মায়েরই প্রথম পছন্দ তেল। এ নিয়েও বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতের ভিন্নতা আছে। সম্প্রতি এক গবেশণায় দেখা গেছে, খুব ছোট শিশুদের, অর্থাৎ নবজাতকেদের শরীরে তেল মাখালে তো লাভের চেয়ে ক্ষতিই করে বেশি। গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে গায়ে তেল মাখেনি এমন বাচ্চাদের ত্বক বেশি মজবুত। আসলে আমাদের ত্বকের ওপরের কালো আবরেণের নিচেই চর্বি বা ফ্যাটের স্তর থাকে। তেল মাখলে এই চর্বির স্তর পাতলা হয়, অর্থাৎ সুগঠিত হয় না। এর ফলে শিশুর শরীর সহজে শীতল হয়ে পড়তে পারে। এ ছাড়া ত্বকে সংক্রমণের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। একট বড় বাচ্চাদের অবশ্য তেল মাখা যাবে। ভালো কোনো কোম্পানির বোতলজাত তেল ব্যবহার করা উচিত। এসব তেল রিফাইন্ড থাকে বলে অ্যালার্জির ঝুঁকি কম থাকে। সরষের তেল শিশুর ত্বকের জন্য ভালো নয়। কারণ, এই তেল মাখলে ত্বক চিটচিটে হয়ে যায়। ফলে ধূলাবালি সহজে ত্বকে আটকে যায়। আবার ঘন বলে এই তেল লোমকূপ বন্ধ করে দিয়ে সংক্রমণও ঘটাতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি লিনোলেইক অ্যাসিড-সমৃদ্ধ তেল ব্যবহার করা যায়। এটি একধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড। যা ত্বকের সুরক্ষা দেয়। সূর্যমুখী তেলে এটি বেশি থাকে। যাদের একজিমা আছে, তাদের অলিভ অয়েল ব্যবহার না করাই ভালো। অভ্যাসবশত অনেকেই মালিশের জন্য শিশুকে তেল মাখাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। অনেকে আবার গোসলের আগে তেল মাখান, এটা অবশ্য মন্দ নয়। যাদের ত্বক খুব বেশি শুষ্ক, তাদের জন্যও তেল উপযক্ত নয়। যদি শীতে বাচ্চার শুষ্কতার কথাই বিবেচনায় নেন, তবে তেলের পরিবর্তে ভ্যাসলিন কিংবা লোশন হতে পারে উপযুক্ত বিকল্প।

শিশুর নাক থেকে রক্তপাত

হাঠৎ যদি বাচ্চার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, তবে সেটা ভাবনার কথা বৈকি। তবে এ সময় ঘাবড়ে না গিয়ে ভালো করে নাকের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করুন, রক্ত নাকের ভেতর থেকে আসছে,নাকি বাইরে দিকের চামড়া ছিড়ে যাওয়ার কারণে পড়ছে। অনেক শিশুর নাক খোঁটার অভ্যাস থাকে, এতে পাতলা ত্বক ছিঁড়ে রক্ত পড়ে। দীর্ঘদিন সর্দিতে ভুগলে নাক পরিষ্কার করতে করতে নাকের অগ্রভাগ থেকে রক্ত পড়তে পারে। নাকের ভেতরের রক্তনালি খুব স্পর্শকাতর এবং সামান্য আঘাত, এমনকি জোরে ঘষা খেলেও তা ছিঁড়ে যেতে পারে। এতে রক্তপাত হয়। নাকের পলিপ, সাইনোসাইটিস, নাকে আঘাত, মাথায় আঘাত, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, রক্তরোগ, প্রদাহ ইত্যাদি কারণেও রক্তপাত হতে পারে। কিছ ওষুধ যেমন অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রফেন ইত্যাদি সেবন করলে কারও কারও রক্তপাত হয়।

কী করতে হবে : হঠাৎ নাক থেকে রক্তপাত হলে শিশু ভয় পেয়ে যায়, তাই ওকে সাহস দিন। আপনারও ভয়ের কিছ নেই। বলুন, সে যেন কান্নাকাটি, হইচই বা লাফালাফি না করে । শিশুকে সোজা করে বসান, এরপর দুই আঙুল দিয়ে নাক একট চাপ দিয়ে ধরে টেনে রাখুন। নাকের ওপরের দিকে যে শক্ত হাড় আছে, তা ঠিক নিচে রয়েছে নরম তরুণাস্থি। ঠিক নরম জায়গায়টাতেই জোরে চেপে ধরতে হবে। ৫ থেকে ১৫ মিনিট ধরে রাখুন। এ সময় নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়া বন্ধ রাখতে হবে। মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বুলন। নাকের ওপর একট বরফ দিয়ে ধরে রাখা যায়। রক্তপাত বড় অসুখ নয়।

যা করবেন না : পেছনে হেলানো যাবে না। শোয়া যাবে না। এতে রক্ত নাক থেকে গলায় ও পেটে এমনকি শ্বাসনালিতেও যেতে পারে। যদি ৩০ মিনিট পরও রক্ত পড়তে থাকে কিংবা নাকের রক্তপাতের সঙ্গে মাথাব্যথা, চোখে দেখতে সমস্যা হয় কিংবা রক্তরোগ সংক্রমণ অথবা অন্য কোনো সমস্যা থাকে, তবে শিশুকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

শিশু বেশি ঘামে

অনেক বাবা-মা বলে থাকেন, তাদের শিশু মাত্রাতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক রকমের ঘামে। এমনকি শীতের দিনেও বাচ্চারা অনেক ঘামে। সব সময় এই ঘামকে কোনো রোগবালাই ভাবা ঠিক নয়। হলে তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছ নেই। অনেক শিশুর 'মাথা ঘামে বেশি' এর কারণও অজানা, কিন্তু রিকেটস্ (ভিটামিন ডি-এর অভাবজনিত অসুখ) ও জন্মগত হৃদ্‌যন্ত্রের ত্রুটির শিশুতে এটা সুনির্দিষ্ট লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। হাতের পাতা ঘেমে জবজবে হওয়া স্বাভাবিক শিশু ও বয়স্ক দু'জনেরই হতে পারে। থাইরোটাক্সিকোসিস (থাইরয়েড হরমোনের আধিক্যজনিত অসুখে) শিশু বেশি ঘামে। শিশু যদি অ্যানিমিয়া, ব্যথা বা মূর্ছা যাওয়া সমস্যায় ভোগে, তবে অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। ঘর্মাক্ত শিশুর ফিট ব্যামো, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে যাওয়া, জ্বর আছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে। বেশ কিছু ওষুধ শিশুকে অতিরিক্ত ঘামায়। এ ক্ষেত্রে মা যদি কোনো রূপ

ওষুধে আসক্ত থাকেন, তবে স্তনপানরত শিশু তার ফলাফল বহন করতে পারে। শিশু অতিরিক্ত ঘামলে ভেজা কাপড়ে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। তাই ঘামে ভেজা কাপড়চোপড় বারবার পাল্টে দিন। অনেক সময় হালকা শীতেও শিশুরা যখন ঘামছে, তখন বেশি কাপড়চোপড় বা গরম কাপড়ে জড়িয়ে রাখার দরকার নেই। ঘাম থেকে ত্বকে র‍্যাশ হতে পারে। তার চিকিৎসা নিন।

শিশু যদি বিছানা ভেজায়

বেশির ভাগ শিশুই দুই থেকে চার বছর বয়সে প্রস্রাবের বেগ হলে টয়লেট ব্যবহারের ব্যাপারটা শিখে ফেলে। কিন্তু কিছু শিশু আছে, যারা দিনের বেলায় ঠিকঠাক থাকলেও রাতে ঘুমের মধ্যে বিছানা ভেজায়। পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াতে পারে কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে, আর তাকে স্বাভাবিকভাবেই নেয়া উচিত। তবে এরপর এই সমস্যা রয়ে গেলে চিন্তিত হওয়ারই কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত মানসিক চাপ থেকে বাচ্চাদের এই সমস্যা হয়। নতুন স্কুলে ভর্তি, বাসা পরিবর্তন, মা-বাবার মৃত্যুর বা বিচ্ছেদ, নতুন ভাই বা বোনের জন্ম, স্কুলে কোনো শিক্ষককে ভয় পাওয়া, সহপাঠী বা বন্ধুদের উপহাস ইত্যাদি নানা কারণে মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে। আর তা থেকে তৈরি হতে পারে রাতে ঘুমের মধ্যে বিছানা ভেজানোর ঘটনা। এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে শিশুটি ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ, প্রস্রাবে সংক্রমণ বা কোনো রোগে ভুগছে কি না। এসব রোগে প্রস্রাব বেশি হতে পারে। দিনের বেলা বেশি করে পানি পান করান, বিকেলের পর পানির পরিমাণ কমিয়ে দিন। রাতে ঘুমানের আগে এবং ঘুমানোর ঘণ্টা খানেক পর ঘুম থেকে উঠিয়ে টয়লেটে নিয়ে প্রস্রাব করাতে হবে। সপ্তাহে কোন কোন রাতে প্রস্রাব করেনি, সেগুলো শিশুকে বলুন নিজেই ক্যালেন্ডারে দাগ দিতে। প্রস্রাব না করার জন্য তাকে প্রশংসা করুন, কিন্তু প্রস্রাব করলে তিরস্কার করবেন না। কিছু ওষুধ এবং সেন্সরযক্ত অ্যালার্ম কিছুটা কার্যকর হলেও মূলত শিশুর মানসিক চাপ দূর করা গেলেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এ ক্ষেত্রে একজন শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই অসুখ না থাকলেও প্রস্রাবের কন্ট্রোল হতে সময় লাগে।

কিশোর-কিশোরীর খাবার?

কৈশোরে সুস্বাস্থ্যের মজবুত না হলে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে পরবর্তী জীবনে। অথচ এই বয়সে পড়াশোনার চাপ, ব্যস্ততা, অবহেলার কারণে অনেকেই নিজের দিকে খেয়াল করে না। কৈশোরে শারীরিক-মানসিক বৃদ্ধির চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে বলে এ সময় সুষম খাবারের পরিমাণ সুষম অনুপাতে না থাকলে বৃদ্ধি সঠিক হবে না। ইদানীং অনেক কিশোরী ফিগার-সচেতন হওয়ায় খাওয়াদাওয়া করে না বললেই চলে। এতে পরবর্তী সময়ে রক্তশূন্যতা, অস্টিওপোরেসিস ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে। ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়। এ ছাড়া বেশির ভাগ কিশোর-কিশোরী আজকাল সারাদিন বাইরের খাবার

খেয়েই ব্যস্ত। এতে তেল–চর্বি, ট্রান্সফ্যাট বেশি, কিন্তু প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান নেই। ফলে কৈশোরে স্থূলতা বাড়ছে, কিন্তু শরীর ফিট হচ্ছে না। মেয়েদের বেলায় আয়রনের ঘাটতি প্রায়ই হয়ে থাকে, যেহেতু তারা মাসিকের সঙ্গে আয়রন হারায়। কিশোরীদের নিয়মিত ডিম, মাংস, কলিজা, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি খেতে হবে। এ ছাড়া কিশোরীদের হাড়ে ক্যালসিয়ামের সমস্যাও হয়। ছোট মাছ, দুধ, দই, দুধের তৈরি খাবার খেতে হবে নিয়মিত। নানা ধরনের ভিটামিনের জন্য কচুশাক, পুঁইশাক, লালশাক, ধনে পাতাসহ বিভিন্ন দেশি ফল-যেমন আমড়া, কলা, পেয়ারা, আমলকী, লেবু, কমলা খেতে হবে। ভিটামিন এ এবং সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ যুগের অনেক কিশোর-কিশোরীই সকালের ক্লাস ধরার ব্যস্ততায় নাশতা না খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। এটি বদভ্যাস। সকালের নাশতা দেহের বিপাকক্রিয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রুটি, ডিম বা দুধ, কর্নফ্লেক্স, একট ফলের রস এগুলো হতে পারে চটজলদি নাশতা। টিফিনে ক্যানটিনের খাবার না খেয়ে বাড়ি থেকে আনা স্যান্ডউইচ, নুডলস বা ফলমূল খাওয়া যায়।

শিশু কে ঔষধ খাওয়ানো

শিশুকে ওষুধ খাওয়ানো সহজ নয়- এ কথা যেকোনো মা-বাবাই জানেন। শিশু যদি কোনো ওষুধ অপছন্দ করে, অন্য কোম্পানির তৈরি একই গ্রুপের ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে পারেন। কেননা, ওষুধে একেক কোম্পানি একেক রকম স্বাদ ও গন্ধ ব্যবহার করে। সম্ভব হলে মুখে খাওয়ার ওষুধ প্রয়োগের চেষ্টাই করা উচিত। প্রয়োজন না পড়লে শিশুর শিরায়, মাংসে, ত্বকের নিচে ওষুধ না দেয়াই ভালো। তাই খেতে চায় না বলে সব সময় বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করতে জোর দেবেন না। শিশুকে ওষুধ খাওয়ানোর নানা পদ্ধতি আছে। ওষুধ পরিমাপক কাপ ও চামচ, মুখে ব্যবহার সিরিঞ্জ, ওরাল ড্রপারস প্রভৃতি ব্যবহার করতে পারেন। তবে তার আগে ওষুধের মাত্রা নিরূপণের দাগগুলো অভিভাবকদের ভালো করে বুঝে নিতে হবে। সাধারণত পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের তরল ওষুধ বা সিরাপ দেয়া হয়। এর চেয়ে বেশি বয়স হলে চুষে খাওয়ার ওষুধ দেয়া যায়। ছোট্ট শিশুকে ওষুধ খাওয়ানোর সময় একটু একটু করে ঠোঁটের কোণার দিকে দিলে ভালো, কেননা এতে করে জিভের পেছনের দিকে তেতো স্বাদ অনুভূত হওয়ার যে সংবেদী কোষ আছে, তার সংস্পর্শ এড়ানো যায়। শিশুকে ওষুধ খাওয়ানোর জন্য কখনো রান্নাঘরের বা সাধারণ চামচ ব্যবহার করবেন না। এসব চামচে দাগ না থাকায় পরিমাণ কম বেশি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সাধারণত শিশুর ওজনের ভিত্তিতে তার জন্য ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। একই বয়সের শিশুদের একে জনের ওজন একেক রকম হতে পারে। সুতরাং, বয়স এক হলে শিশুর ওষুধের মাত্রা একই হবে, এমন ভাববেন না।

নবজাতকের জন্ডিস

জন্মের পর অনেক শিশুরই জন্ডিস হয়ে থাকে। নবজাতকের রক্তে উচ্চ বিলিরুবিন মাত্রার কারণে এ জন্ডিস হয়। ৬০ শতাংশ পূর্ণ গর্ভকাল (টার্ম) নবজাতকের এবং ৮০ শতাংশ প্রি-টার্ম অর্থাৎ অকালজাত নবজাতকের মধ্যে প্রথম সপ্তাহে জন্ডিস দেখা যায়। তবে এর বেশির ভাগই নির্দোষ জন্ডিস, যাকে ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস বলে।

ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিসের বৈশিষ্ট্য হলো

* ভূমিষ্ঠ হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর শুরু হয়।
* টার্ম নবজাতকের ৫-৩ দিন বয়সে এবং প্রি-টার্ম নবজাতকের ৭-৫ দিনের মধ্যে বেশি বাড়ে।
* সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে এমনিই সেরে যায়।
* রক্তে বিলিরুবিন মাত্রা ১৫ মি গ্রাম/ডেসিলি নিচে থাকে।
* এটা সাময়িক জন্ডিস, কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।
* যদি বিলিরুবিন মাত্রা ০.৫ মি গ্রাম/ডেসি/প্রতি ঘণ্টায় বাড়তে থাকে বা ২৫ মি/ডেসির বেশি হয় তবে তা বিপজ্জনক বলে গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিরোধ

* গর্ভাবস্থায় অবশ্যই মায়ের এবিও, আরএইচ রক্ত গ্রুপ পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।
* সকল নবজাতকের জন্ডিসের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ৫-৩ দিন বয়সে বিলিরুবিন পরীক্ষা করা উচিত।
* বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর শিশুকে হলদেটে মনে হলে বাবা-মা যেন অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
* শিশুকে যথাযথভাবে মাতৃদুগ্ধ পান চালিয়ে যেতে হবে।
* যেসব নবজাতক উচ্চমাত্রার জন্ডিসে আক্রান্ত ছিল, পরে তাদের শ্রবণশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঠিকভাবে হচ্ছে কি না, তা ফলোআপ করতে হবে।

নবজাতকের খিঁচুনি

নবজাতক বা ছোট্ট শিশুদের নানা কারণে খিঁচুনি হতে পারে। তবে এটা বড়দের খিঁচুনির তুলনায় অন্য রকম। তাই নিবিড়ভাবে লক্ষ্য না করলে শিশুদের খিঁচুনি অনেক সময় বোঝা যায় না। শিশু কোনো একদিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকলে বা কোনো একটা হাত বা পা অবিরত নাড়লে থাকলে সেটাও খিঁচুনির লক্ষণ হতে পারে। স্বাভাবিক জন্ম-ওজনের শিশুদের মধ্যে প্রতি হাজারে প্রায় তিনজনের খিঁচুনি হতে পারে। তবে স্বল্প জন্ম-ওজনের

(এক কেজির কম) নবজাতকের খিঁচুনির ঝুঁকি বেশি। প্রতি হাজারে প্রায় ৬০টি শিশুর এমন সমস্যা দেখা যায়।

নবজাতকের খিঁচুনির কারণ

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম মিনিটে কান্না ও পরবর্তী সময়ে মস্তিষ্কের জটিলতা; মস্তিষ্কের ভেতরে রক্তক্ষরণ; রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস; রক্তে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়ামের মাত্রা কম; মস্তিষ্কে জীবাণ সংক্রমণ (যেমন ব্যাকটেরিয়া, টক্সো, হারপিস সিমপ্লেক্স, রুবেলা, সাইটোমেগালো সংক্রমণ); মস্তিষ্কের আকার-আকৃতির জন্মগত ত্রুটি- বিচ্যুতি ইত্যাদি। নবজাতকের খিঁচুনির বৈশিষ্ট্য বড়দের মতো নয়। শিশুদের এই সমস্যার স্থায়িত্ব এত কম যে সেটা টের পেতে বেশ বেগ পেতে হয়। চোখের পাতার কাঁপুনি, ঠোঁট-মুখের অস্বাভাবিক

সঞ্চালন, হাত ও পায়ের সাইকেল চালনার মতো নড়াচড়া, শ্বাসরোধ অবস্থা, ঠোঁট-জিভের নীল বর্ণ ধারণ-এ রকম উপসর্গ খিঁচুনির নির্দেশক হতে পারে। খিঁচুনি হলে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে। জন্মের পরপর খিঁচুনি হচ্ছে কি না বুঝতে এবং এ সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা কেবল তখনই সম্ভব, যদি শিশুর জন্ম হাসপাতালে হয়। পরবর্তী সসময়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরও এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। জন্মের পর জন্ডিস, সংক্রমণ বা জ্বর থেকে খিঁচুনি হতে পারে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মায়েদের প্রসবের পর সন্তানের খিঁচুনি প্রতিরোধ করতে শিশুর জন্মের পরপরই রক্তে শর্করা পরিমাণ দেখতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

খাদ্য নালি

পেটব্যথা মানেই গ্যাস্ট্রিক নয়

পেট ব্যথা, অস্বস্তি হলেই আমাদের প্রথম মনে হয়, নিশ্চয়ই পেটে গ্যাস হয়েছে। বেশির ভাগ সময় গ্যাস্ট্রিক আলসার ধরে নিয়ে অ্যান্টাসিড বা ওমিপ্রাজলের মতো ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে খেয়েও ফেলি। দুটো বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। প্রথমত, পেটব্যথা মানেই গ্যাসের ব্যথা নয়। দ্বিতীয়ত, দিনের পর দিন না বুঝে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ মুড়ি-মুড়কির মতো খাওয়াটা ঠিক নয়। পেটের ওপরের দিকে ব্যথা হলে তা পেপটিক বা গ্যস্ট্রিক আলসার ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে। যেমন: নন-আলসার ডিসপেপশিয়া হলো পেটে অস্বস্তি, পেট ভার, বুকজ্বালা, বমি ভাব হতে পারে। পিওথলিতে পাথর থাকলেও এ ধরনের উপসর্গ হতে পারে। এমনকি কখনো কখনো হৃদ্‌রোগও বুকে ব্যথা না হয়ে পেটের ওপরের দিকে ব্যথা হয় এবং রোগীকে ভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। যকৃৎ বা অগ্ন্যাশয়ের কোনো রোগে পেটের উপরিভাগে ব্যথা হতে পারে। মানসিক টানাপোড়েনেও কিন্তু পেটব্যথা বা জ্বালা করে।

আইবিএস বা ইরিটেবল বাউয়েল সিনড্রোমে পেটের যেকোনো ব্যথার সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য বা বেশি বেশি পায়খানা হয়। দিনের প্রথমার্ধে বা সকালেই ব্যথা বেশি থাকে, বারবার টয়লেটে যেতে হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। পেপটিক আলসার পাকস্থলীতে হলে খাওয়ার পরে বাড়ে। পিত্তথলির ব্যথাও খাওয়ার পরে, বিশেষ করে ভারী খাবার খেলে বাড়ে। কিন্তু অন্ত্রের আলসার বা ডিওডেনাল আলসার খালি পেটেই বেশি হয়। পেটব্যথার সঙ্গে অরুচি এবং ওজন কমে গেলে পাকস্থলী বা অন্ত্রে ক্যানসার আছে কি না সন্দেহ করা উচিত। হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি নামের রোগজীবাণ পাকস্থলীতে প্রদাহ সৃষ্টি করলে পেটব্যথা হয়। এ ধরনের ব্যথায় এন্ডোসকপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি সংক্রমণে ওষুধের কোর্স শেষ করতে হয়। পেঠব্যথার কারণ না জেনে-বুঝে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেতে থাকলে পাকস্থলীর পিএইচ বা রাসায়নিক পরিবেশ বিনষ্ট হতে পারে। নানা ধরনের ভিটামিন খনিজ শোষণে সমস্যা হতে পারে এবং সে কোরণে ভিটামিনশূন্যতা ও রক্তশূন্যতা হতে পারে। গবেষণায় দেখা যায়, এসব ওষুধ দীর্ঘ মেয়াদে খেলে অস্টিওপোরোসিস, কিডনির ক্ষতি ইত্যাদি হতে পারে। গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দিনের পর দিন খেলে অনেক সময় উপসর্গ রহিত হয় এবং জটিল কোনো রোগ, যেমন ক্যানসার বা অগ্ন্যাশয়ের সমস্যা সহজে ধরা পড়ে না। তাই মাঝেমধ্যেই পেটব্যথা, অস্বস্তি হলে চট করে ওষুধ না খেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। অরুচি, ওজন হ্রাস, রক্তশূন্যতা, মলত্যাগ অভ্যাসের আকস্মিক পরিবর্তন থাকলে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

বিব্রতকর পেটের সমস্যা

পেটে গ্যাস জমে। নানা রকম আওয়াজ হয়। কখনো কখনো পায়ুপথ দিয়ে বাতাস বেরোয়। এগুলো খুবই বিব্রতকর সমস্যা। ইংরেজিতে এ সমস্যার নাম ফ্ল্যাটুলেন্স। অত্যধিক গ্যাস জমার ফলেই এমন হয়। অনেকেই এ সমস্যায় ভোগেন। আর এ জন্য তাদের প্রায়ই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়।

- পরিপাক হয় না, এমন কিছু শর্করা ও আঁশজাতীয় খাবার ঠিকমতো হজম না হওয়ার কারণেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ রকম সমস্যা হয়। একেকজনের একেক খাবার সহ্য হয় না। তাই সেগুলো এড়িয়ে চলুন। যেমন: প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফলমূলের খোসা, সবজির খোসা ইত্যাদি। কৃত্রিম চিনি, চিনিযুক্ত চুইংগাম ও মিষ্টি পানীয় অবশ্যই এড়িয়ে চলবেন। কারণ, এগুলো আপনার পেটের সমস্যা বাড়বে। সহজে হজমের উপযোগী শর্করা বেছে নিন। যেমন: ভাত, আলু, পেঁপে ইত্যাদি।
- ধূমপান বাদ দিন, কারণ এটা পেটের সমস্যা বাড়ায়। অতিরিক্ত কফিও বর্জন করুন। তবে লক্ষ্য রাখবেন, একেকজনের শরীর একেক খাবারে একেক প্রতিক্রিয়া দেখায়। এটা আপনাকেই খেয়াল করতে হবে, কোন খাবারটা

আপনার সমস্যা বাড়াচ্ছে। অনেকে এ জন্য শাক-সবজি ও দুধ একেবারেই বাদ দিয়ে দেন। আগে দেখে নিন এগুলো সমস্যা বাড়াচ্ছে কি না।

- একবারে বেশি খাবার না খেয়ে সারা দিনের খাবারটাকে ছয় ভাগে ভাগ করুন। নিয়মিত খাবার ও শারীরিক পরিশ্রম হজমে সহায়তা করে, গ্যাস জমা কমায়। তাই নিয়মিত ব্যায়াম করুন। শরীরের ওজন কমান। আদা বা পুদিনা দেয়া চা বা পানীয় এ ধরনের সমস্যা কমাতে সহায়ক।
- আজকাল প্রোবায়োটিকের কথা বলা হচ্ছে। প্রোবায়োটিক উপাদানসমৃদ্ধ দুধও বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এগুলো পেটের জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়াযুক্ত খাবার। তবে প্রোবায়োটিক উপাদান আপনি দইয়ের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। তাই খাবারের পর একটুখানি টক দই খাওয়ার অভ্যাস করুন।
- প্রোবায়োটিক আইবিএসে উপকার করে।

শ্বাসনালি, ফুসফুস

শ্বাসকষ্ট মানেই হাঁপানি নয়?

শ্বাসকষ্ট বা শ্বাস টানা রোগীমাত্রই হাঁপানিতে আক্রান্ত, তা নয়। শ্বাসকষ্টের একটি বড় কারণ ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ বা সংক্ষেপে সিওপিডি। এটি ফুসফুসের একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ। এতে আক্রান্ত হলে শ্বাসনালির দেয়াল পুরু হয়ে যায় এবং ভেতরে প্রচুর শ্লেষ্মা জমে। ফলে শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসের ভেতর ঠিকমতো বাতাস ঢুকতে পারে না। ফুসফুসের ভেতরকার ক্ষুদ্র বায়ুথলিতে বাতাস আটকে থাকে। এতে শ্বাসকষ্ট ছাড়াও রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, কার্বন ডাই-অক্সাইড বা বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা বেড়ে যায়। অনেক সময় এই রোগকে ক্রনিক ব্রংকাইটিসও বলা হয়। কীভাবে বুঝবেন আপনার এই রোগ হয়েছে? দীর্ঘস্থায়ী কাশি, শ্বাসকষ্ট, কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা এই রোগের লক্ষণ। পর পর ২ বছরে কমপক্ষে তিন মাস কাশি ও শ্বাসকষ্ট হলে তাদের ব্রংকাইটিস বলে। বেশির ভাগ রোগীর বয়স ৪০ বছর বা তার কাছাকাছি। ধূমপায়ীদের এই রোগ হয় বেশি। তবে কারখানার নির্গত ধোঁয়া বা রান্নার চুলার ধোঁয়া থেকেও এ সমস্যা হতে পারে। ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ ফুসফুসের একটি মারাত্মক রোগ। এ থেকে রোগীর ওজন হ্রাস, হার্ট ফেইলিউর, রেসপিরেটরি ফেইলিউর, এমনিক মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু এই রোগ প্রতিরোধযোগ্য। এ থেকে বাঁচতে: ধূমপান চিরতরে ত্যাগ করুন পুষ্টিকর সবুজ শাক-সবজি ও ফলমূল খান নিয়মিত ব্যায়াম করুন শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম শিখে নিন।

ফুসফুস ভালো রাখার ব্যায়াম

নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম ফুসফুসকে সুস্থ রাখে। ব্যায়াম হাঁপানি বা ক্রনিক ব্রংকাইটিসের রোগীদের ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়াতে উপকারী। এ ছাড়া এতে মানসিক চাপ কমে। এ রকম কয়েকটি ব্যায়াম সম্পর্কে জেনে নিন:

৮-৭-৪ রিলাক্সি ব্রিদিং : পিঠ সোজা রেখে আরাম করে বসুন। 'হুস' আওয়াজ করে মুখ দিয়ে ফুসফুসের সবটুকু বাতাস বের করে দিন। এবার চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে নাক দিয়ে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত গুনতে গুনতে গভীর শ্বাস নিন। সেটা ভেতরে আটকে রাখুন, মনে মনে ৭ পর্যন্ত গুনুন। এবার ঠোঁট গোল করে আবার 'হুস' করে পুরোটা বাতাস বের করে দিন ৮ পর্যন্ত গুনতে গুনতে। কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে পর পর চারবার এভাবে শ্বাস নিন। এই ব্যায়াম দিনে দুবার করা ভালো।

শ্বাস গোনার ব্যায়াম : এই ব্যায়ামে ক্রমান্বয়ে প্রশ্বাসের সময় ধীর করে আনতে হয়। মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। চোখ বন্ধ করে পর পর কয়েকবার গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। ধীরে ধীরে এর গতি কমে আসবে। প্রথমে প্রশ্বাস ছাড়ার সময় এক গুনবেন, তার পরের বার দুই, এভাবে পাঁচ পর্যন্ত। তারপর আবার নতুন করে এক দিয়ে শুরু করুন। এই ব্যায়ামটি দিনে ১০ মিনিট করবেন। এটি এক ধরনের মেডিটেশন বা ধ্যান। এটি মস্তিষ্ককে সজাগ করে ও মনোসংযোগ বাড়ায়। মানসিক চাপ কমায়।

বেলো ব্রিদিং: মুখ বন্ধ করে চটপট নাক দিয়ে ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার ব্যায়াম এটি। প্রতি সেকেন্ডে তিনবার শ্বাস নেয়া ও ছাড়ার চেষ্টা করুন। শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার সময়টি সমান থাকবে। এতে বুকের ও বক্ষচ্ছাতার মাংসপেশির দ্রুত ব্যায়াম হবে। তারপর কিছুক্ষণ স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। ১৫ সেকেন্ডের বেশি নয়।

নিউমোনিয়া নয়, ব্রঙ্কিওলাইটিস?

শিশু কাশিতে ভুগছে, মা-বাবাও উদ্বিগ্ন হয়ে নিউমোনিয়া ভেবে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াচ্ছেন। অথচ এসব কাশির বেশির ভাগই ভাইরাসজনিত, তাই অ্যান্টিবায়োটিকের দরকারই নেই। ভাইরাসজনিত এই অসুখের নাম ব্রঙ্কিওলাইটিস। গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের শিশুদের নিউমোনিয়ার (১১ শতাংশ) চেয়ে ব্রঙ্কিওলাইটিস বেশি। নিউমোনিয়ায় ও ব্রাঙ্কিওলাইটিস শ্বাসতন্ত্রের দুটি সম্পূর্ণ পৃথক স্থান আক্রান্ত হয়। ফুসফুসের ক্ষুদ্র নালি ব্রংকিউলে ভাইরাসের কারণে প্রদাহ হলে তাকে বলে ব্রঙ্কিওলাইটিস এবং আরও গভীরে এলভিওলাইতে প্রদাহ হলে বলে নিউমোনিয়া। ব্রঙ্কিওলাইটিস দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের বেশি আক্রমণ করে। এ রোগে নাক দিয়ে পানি পড়ার পাশাপাশি কাশি ও শ্বাস কষ্ট হতে পারে। আক্রান্ত শিশুর জ্বরের মাত্রা কম থাকে, বুকে বাঁশির মতো আওয়াজ হয়। পক্ষান্তরের নিউমোনিয়া যেকোনো বয়সে হতে পারে। শিশুর খুব জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়। বুকের এক্স-রে ও রক্ত পরীক্ষায় অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। ব্রঙ্কিওলাইটিস জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল আর নাক বন্ধ হয়ে গেলে নরমাল স্যালাইন দেয়া যেতে পারে।

কোনো অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। শ্বাসকষ্ট খুব বেশি হলে শিশুকে হাসপাতালে নিতে হবে। সেখানে পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পুষ্টি নিশ্চিত করা গেলে ও ৩ শতাংশ সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে নেবুলাইজ করলে বেশির ভাগ শিশুই সেরে ওঠে। এ ক্ষেত্রে সালবিউটামল বা স্টেরয়েড দিলে খুব একটা উপকার পাওয়া যায় না। সুস্থ শিশুদের ব্রঙ্কিওলাইটিসে আক্রান্ত শিশু থেকে দূরে রাখুন। সিগারেট, মশার কয়েল ও রান্নাঘরের ধোঁয়ার কাছে তাদের যেতে দেবেন না। শিশুকে কোলে নেয়ার আগে ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিলে এবং সেই সঙ্গে দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জন্য মায়ের দুধ নিশ্চিত করা গেলে এ রোগ অনেকাংশ প্রতিরোধ করা সম্ভব। শিশুকালে ব্রঙ্কিওলাইটিস হলে ভবিষ্যতে এ্যাজমা বা অন্য সমস্যা হবে না বলে মাতা-পিতাকে অবশ্যই আশ্বস্ত করতে হবে।

সর্দি-কাশি রুখতে কী খাবেন?

শীতে সর্দি-কাশির প্রকোপ বেশি হয়ে থাকে। এ সমস্যা থেকে রেহাই পেতে কিছু বিশেষ খাবার বেশ সহায়ক। এগুলো আপনার সুরক্ষা দিতে পারে। হালকা গরম পানিতে মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে ঠাণ্ডা-সর্দি দূর হয়। লেবুর ভিটামিন সি ও মধুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মিলে এই সুরক্ষা দেয়। ধূলাবালি ও ঠাণ্ডায় শ্বাসনালি সংকুচিত হয়। ফলে শ্বাসকষ্ট হয়। গরম আদা-চা এই কষ্ট দূরে করে এবং জমে থাকা কফকেও তরল করে। চায়ের সঙ্গে তুলসীপাতা জ্বাল দিয়ো খাওয়া যায়। আবার প্রতিদিন দু-তিনটা পাতা এমনি ধুয়েও চিবিয়ে খাওয়া যায়। এতে বিটা ক্যারোটিন ও ইউনিজল আছে, যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ব্যাকটেরিয়ারোধী। গলা খুস খুস করলেও তুলসীপাতা উপকারী। সরিষার তেল, পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচের ভর্তা কফ তরল করে। এ ছাড়া সরিষাভর্তা, সরিষাশাক ও কালিজিরার ভর্তা, সর্দি-কাশি কমায়। যারা শীতে কষ্ট পান ও যাদের সহজে ঠাণ্ডা লেগে যায়, পানিতে দু-তিন কোয়া রসুন মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে পান করুন। এটি শরীরকে গরম রাখে এবং ঠাণ্ডা থেকে সুরক্ষা দেয়। শীতে গরম স্যুপ, গরম চা ঠাণ্ডা দূর করতে সাহায্য করে। তবে প্রচুর পানিও পান করতে হবে। কেননা সর্দি-কাশি ও জ্বরে শরীর দ্রুত পানিশূন্য হয়ে পড়ে।

ইনহেলার ব্যবহার করবেন কীভাবে?

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় হাঁপানি রোগীর সমস্যা। এ সময় তাদের নিয়মিত ইনহেলার ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু অনেকেই ইনহেলার ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানেন না। ব্যবহারের ভুলের কারণে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ ওষুধ ফুসফুসে না-ও পৌঁছাতে পারে। এতে কাঙ্ক্ষিত ফলও মিলবে না। ইনহেলার ব্যবহারের পদ্ধতি:

১. মাউথপিস থেকে কভারটি সরান। মুখটি পরিষ্কার কি না, লক্ষ্য করুন।

২. তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের মধ্যে ইনহেলারটি ধরুন। এবার ভালোভাবে ঝাঁকান।

৩. মাউথপিস মুখের ভেতর এমনভাবে স্থাপন করুন যেন দুই ঠোঁটের মধ্যে ফাঁক

না থাকে। কামড়ানো যাবে না। এবার মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস বের করুন, যতক্ষণ না ফুসফুস খালি হয়।

৪. মাথা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে গভীর শ্বাস নিন ও ক্যানিস্টারটি চাপ দিয়ে এক মাত্রা ওষুধ নিন।

৫. ইনহেলারটি মুখ থেকে সুরিয়ে ফেলুন। ১০ সেকেন্ডে বা যতক্ষণ সম্ভব শ্বাস ধরে রাখুন। এবার ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন।

৬. দ্বিতীয় চাপ বা আরেক মাত্রা ওষুধ নিতে হলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার একই পদ্ধতিতে নিন।

৭. মাউথপিসের ঢাকনা লাগিয়ে রাখুন।

বড়দের নিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া ফুসফুসের প্রদাহজনিত একটি রোগ। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক সংক্রমণের ফলে এই অসুখ হয়ে থাকে। নিউমোনিয়ার তীব্রতা মৃদু হতে পারে, আবার প্রাণসংহারীও হতে পারে। আমাদের ধারণা, কেবল শিশুদেরই নিউমোনিয়া হয়, আসলে তা নয় বয়স্ক ব্যক্তি, যারা দীর্ঘদিন রোগে ভুগছেন এবং যাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম, তারা জটিল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন। কী ধরনের রোগ-জীবাণুর মাধ্যমে শারীরিক অবস্থা কেমন, তার ওপর নিউমোনিয়ার তীব্রতা নির্ভর করে। এমনিতে জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, কাঁপুনি ইত্যাদি নিউমোনিয়ার লক্ষণ। খুব বেশি জ্বর, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরি। বৃদ্ধ ব্যক্তি, ধূপমায়ী ফুসফুসের কোনো আঘাত পাওয়ার ইতিহাস, যারা কেমোথেরাপি নেন বা এমন কোনো ওষুধ সেবন করেন যেটা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমায়-তাদের ক্ষেত্রে রোগটি জটিল হয়ে উঠতে পারে। নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের সংক্রমণে বিশ্রাম নিন, প্রচুর পানি পান করুন এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় ও মেয়াদে ওষুধ সেবন করুন। ব্যয়স্ক ব্যক্তি, ডায়াবেটিস বা হাঁপানির রোগীদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম থাকে। নিউমোনিয়ার আক্রমণ ঠেকাতে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। ধূমপান বর্জন কুরন। হাঁচি-কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করবেন। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিরা ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়ার টিকা নিয়ে নিন।

ফুসফুসের ক্যানসার

ধূমপানের কারণে ফুসফুসের ক্যানসার হয়। মূলত পুরুষেরা এই রোগের শিকার হন বেশি-এমন ধারাণার প্রচলন আছে। তবে নারী ও অধূমপায়ীদের ফুসফুসের ক্যানসার হতে পারে। পরিবেশ থেকে নানা মন্দ উপাদান শ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসের ভেতর ঢুকে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি করে। যারা অ্যাসবেসটস ও নানা ধরনের রাসায়নিক কারখানায় ও প্রচুর ধূলাবালিতে কাজ করেন, তাদেরও এই অসুখ বেশি হয়। বংশগত প্রভাবও আছে। শিল্পকারখানা ও যানবাহনের নির্গত ধোঁয়া, বিভিন্ন রাসায়নিক (যেমন: ক্রোমিয়াম,

ক্যাডমিয়াম, অ্যাসবেসটস) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কারও ফুসফুসের ক্যানসারে ঝুঁকি বাড়ায়। নারী ও অধূমপায়ীদের ফুসফুসে ভিন্ন ধরনের ক্যানসার বেশি হতে দেখা যায়। মানবদেহের অন্য কোনো অংশে ক্যানসার হলে সেটা সহজেই ফুসফুসে ছড়াতে পারে। ফুসফুসের প্রদাহ, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া হওয়ার পর আক্রান্ত স্থানে পরবর্তী সময়ে ক্যানসার দেখা দিতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী কাশি, কফের সঙ্গে রক্ত আসা, অরুচি, ওজন হ্রাস, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি ফুসফুসের ক্যানসারের লক্ষণ। নারী বা পুরুষ যে কারও এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। ধূমপান একেবারেই বর্জনীয়। পরোক্ষ ধূমপান (অন্য কারও ধূমপানের ধোঁয়া শ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গেলে) নারী ও শিশুদের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। তাই পরিবারে যে কেউ ধূমপান করলেই সমস্যা হতে পারে। নারীরা অনেক সময় ধূমপান করেন না। কিন্তু অন্য উপায়ে তামাক সেবন করেন (যেমন: জর্দা, গুল) এগুলোও খারাপ।

ইনহেলার নিতে স্পেসার

গরমে ঘেমে ও বৃষ্টিতে ভিজেও হাঁপানি রোগীদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে। শ্বাসকষ্টের জন্য হাঁপানি রোগীদের মূলত ইনহেলার ব্যবহারের চিকিৎসা নিতে হয়। নানা ধরনের ওষুধ এই ইনহেলারের মধ্যে থাকে। তবে ইনহেলারের ওষুধের কার্যকারিতা পুরোপরি পেতে এর সঙ্গে একটা স্পেসার ব্যবহার খুব সহজ এই প্রযুক্তি ওষুধের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। স্পেসার আসলে একটি নল বা চেম্বার, যা একদিকে ইনহেলার ও অন্যদিকে রোগীর মুখের মাঝে সংযোগ রক্ষা করে। যেদিকে মুখ লাগানো হবে, সেখানে একটি মাউথপিস মাস্ক আছে, যা একটি ভালভ বা সুইচের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই ভালভ শ্বাস নেয়ার সময় খোলে ও বের করে দেয়ার সময় বন্ধ হয়ে যায়। ইনহেলার মাউথপিসের সঙ্গে যক্ত করতে হয়।

* সরাসরি ইনহেলার না নিয়ে স্পেসারের মাধ্যমে নিলে ওষুধ শ্বাসতন্ত্রে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে প্রবেশ করে। ফলে ওষুধের কার্যকারিতা বাড়ে। শুধু ইনহেলারের মাধ্যমে নিতে অনেকটা ওষুধ নষ্ট হয়।
* শিশু ও বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে ইনহেলার থেকে শ্বাস নেয়া একট জটিল ব্যাপার। স্পেসার ব্যবহার করলে তাদের জন্য বিষয়টা সহজসাধ্য হয়।
* ইনহেলারের তুলনায় স্পেসারের ভেতর স্প্রে করা ওষুধ বেশি সময় ধরে বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে ও বেশি সময় ধরে টানা যায়। ফলে ওষুধ ঠিকমতো শ্বাসতন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে।
* ইনহেলারের মাধ্যমে নেয়া স্টেরয়েড ওষুধ থেকে মুখে ছত্রাকজনিত ঘা বা স্বর মোটা হয়ে যাওয়ার সমস্যা হতে পারে। শ্বাসতন্ত্রে না গিয়ে মুখ দিয়ে পেটে ওষুধ চলে যাওয়ার ঝুঁকিও থাকে। স্পেসার ব্যবহার করলে এই সমস্যাগুলো অনেকটাই কমে।

স্পেসার ব্যবহারের নিয়ম : ইনহেলার ঝাঁকিয়ে নিয়ে এর মুখ স্পেসারের ছিদ্রের সঙ্গে লাগান। অন্য দিকটি মুখের ভেতর নিন। ইনহেলার ওষুধ স্পেসারের ভেতর চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিন। এবার ধীরে ধীরে স্পেসার থেকে শ্বাস নিতে থাকুন। ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড সময় পাওয়া যায় স্পেসারের কারণে। তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী আবার ইনহেলার চাপ দিন।

কাশি থেকে নিস্তার চান?

কাশির সমস্যা কখনো কখনো সারতেই চায় না। কথা বলা দায়, রাতের ঘুমও নষ্ট। কারও কাশতে কাশতে বমি হয়ে যাচ্ছে, কখনো হচ্ছে পেটব্যথা। চিকিৎসা গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, কাশির অসুখে আক্রান্ত অর্ধেক রোগীর কোনো অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের প্রয়োজন নেই। সমস্যাটা দীর্ঘমেয়াদি হলে চিন্তার বিষয় ।

- কাশি মানেই রোগজীবাণুর সংক্রমণ নয়। তাই কাশি কমাতে সব সময় অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। অ্যালার্জি, সংবেনশীলতা, হাঁপানি, ধূমপান, নানা ধরনের রাসায়নিক ও ধোঁয়ার কারণে কাশি হয়। এমনকি নাকের পেছনে সর্দি জমা, গলনালিতে অ্যাসিড উঠে আসা বা কিছু ওষুধের জন্যও কাশি হতে পারে।
- কাশির সিরাপ আসলে কাশি কমাতে তেমন কাজে আসে না। কখনো বরং এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।
- কাশি প্রচণ্ড বা দীর্ঘমেয়াদি হলে বুকের এক্স-রে, কফ ও রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে তবেই অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হবে।
- কাশি কমাতে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি বেশ কার্যকর। প্রচুর পরিমাণে পানি ও তরল পান করুন। এতে জমে থাকা কাশি তরল হবে ও বেরিয়ে আসবে। গরম পানির ভাপ কাশি বের হতে সাহায্য করে। শুকনো কাশি বা গলা খুসখুস হলে গরম লবণপানি দিয়ে কুলকুচি বা গড়গড়া করুন। মুখে আদা, লবঙ্গ বা মিন্ট লজেন্স রাখতে পারেন।

কাশির সঙ্গে রক্তক্ষরণ, শ্বাসকষ্ট, প্রচণ্ড জ্বর, প্রলাপ, ধূমপায়ীর সাধারণ কাশির হঠাৎ পরিবর্তন ইত্যাদি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। দুই সপ্তাহের অধিক কাশি থাকলে যক্ষ্মার পরীক্ষা করা উচিত।

যক্ষ্মা : আরো সতর্ক হতে হবে

আমাদের দেশে যক্ষ্মা এখনো বড় স্বাস্থ্য সমস্যা। এতে শুধ গরিব লোকজনই যে আক্রান্ত হচ্ছে, তা নয়-বরং রোগটা যে কারোরই হতে পারে।

কারা বেশি ঝুঁকিতে : যক্ষ্মা রোগীর কাছাকাছি থাকে–এমন লোকজন, যেমন: পরিবারের সদস্য, ডাক্তার, নার্স বা সেবা-শুশ্রূষাকারীর আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। ধূমপান, অনিয়ন্ত্রিত

ডায়াবেটিস, মাদকাসক্তি, বার্ধক্য, অপুষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যক্ষ্মার ঝুঁকি থাকে। আবার যাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম, যেমন: এইডস রোগী, দীর্ঘ মেয়াদে স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধসেবী লোকজনের যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

যক্ষ্মা কেবল ফুসফুসে হয় না : ৮৫ শতাংশ যক্ষ্মা ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। তবে ফসফুসের আবরণী, লসিকাগ্রন্থি, মস্তিষ্কের আবরণী, অন্ত্র, হাড়, ত্বক ইত্যাদিতে যক্ষ্মা হতে পারে। তবে হৃৎপণ্ডি, নখ ও চুল এ রোগের আওতামুক্ত। জীবাণু প্রবেশ করলেই যক্ষ্মা হয় না। শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা যক্ষ্মার জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে। এ জীবাণ সাধারণত কাশির মাধ্যমেই ছড়ায়। অনেক সময় যক্ষ্মা সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে এবং পরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে গেলে প্রকাশ পেতে পারে। আবার অনেক সময় যক্ষ্মার জীবাণ দ্রুত শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় ও জটিল আকার নেয়।

কখন সতর্ক হবেন : ২ সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে কাশি, জ্বর, অরুচি, কাশির সঙ্গে রক্ত, ওজন হ্রাস, অবসাদ ইত্যাদি দেখা দিলে অবশ্যই যক্ষ্মা পরীক্ষা করা উচিত। এর বাইরে দীর্ঘক্ষণ ধরে লসিকাগ্রন্থির স্ফীতি, মলত্যাগের অভ্যাসে আকস্মিক পরিবর্তন, কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য কখনো ডায়রিয়া, বুকে বা পেটে পানি জমা ইত্যাদিও উপসর্গ হিসেবে বিবেচ্য।

যক্ষ্মা চিকিৎসা যোগ্য : যক্ষ্মা হলেও আতঙ্কিত হবেন না। এ রোগের সুচিকিৎসা আছে। তবে পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ সেবন করতে হবে। দুধরনের ক্যাটাগরিতে ওষুধ দেয়া হয়, ছয় মাস ও আট মাসের মেয়াদে। ওষুধ অনিয়মিত খেলে পরবর্তী সময়ে ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা হতে পারে, যা সারানো খুব জটিল। সারা দেশে ডটস সেন্টারে বিনা মূল্যে যক্ষ্মার ওষুধ দেয়া হয়। তাই সন্দেহযুক্ত লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শ্বাসকষ্টের রোগীরা কি ব্যায়াম করতে পারবেন?

যাদের হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট আছে, তারা কি ব্যায়াম বা কোনো ধরনের শরীরচর্চা করতে পারবেন? নাকি এ ধরনের শারীরিক পরিশ্রম করলে তাদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাবে।

- হাঁপানির রোগীদের ব্যায়াম করতে নিষেধ নেই। হালকা জগিং, হাঁটার মতো ব্যায়াম তারা অবশ্যই করতে পারবেন। তবে তার সীমা জানতে হবে। যে পর্যায়ে ব্যায়ামের পর আপনি আর কুলোতে পারেন না, তার আগেই থামবেন।
- অনেক সময় হৃদ্‌রোগের কারণেও শ্বাসকষ্ট হয়। সে ক্ষেত্রে ব্যায়াম করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়াই ভালো।
- মনে রাখবেন, হঠাৎ বেড়ে যাওয়া অ্যাকিউট অ্যাজমার সময় ব্যায়াম করা যাবে না।
- যাদের হাঁপানি আছে, তারা ব্যায়াম করতে যাওয়ার আগে পাফ সালবিউটামল ইপরাট্রোপিয়াম-সমৃদ্ধ ইনহেলার টেনে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়। এটা শ্বাসনালি প্রসারক হিসেবে কাজ করে। এতে পরবর্তী দুই থেকে চার ঘণ্টা শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্ত থাকা যায়।

হাঁপানী/হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হলে

- হাঁপানি রোগীদের আকস্মিক টান ওঠাটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, ধূলাবালি লাগলে, ঘর ঝাড়মোছ করলে বা ফুলের রেণুর সংস্পর্শে রোগীর হাঁপানির টান ওঠে। ভাইরাস সংক্রমণ, সর্দিকাশিও এই সমস্যার জন্য দায়ী। হঠাৎ এমন হলে কি করবেন।
- রোগীকে সোজা হয়ে বসতে বলুন ও আশ্বস্ত করুন যে, আতঙ্কের কিছু নেই। উপশমকারী সালবিউটামল বা ইপরাট্রোপিয়াম ইনহেলার স্পেসারের সাহায্য ধীরে ধীরে পাঁচটি চাপ দিতে বলুন। স্পেসার না থাকলে কাগজের ঠোঙা ব্যবহার করতে পারেন।
- স্পেসারের মধ্যে প্রতিবার এক চাপ দিয়ে তা থেকে পাঁচবার শ্বাস নিতে হবে। এভাবে পাঁচবার চাপ দিন। বয়স্ক ও শিশুদের ক্ষেত্রে খেয়াল করুন, শ্বাস বড় করে ঔষধ ঠিকমতো টেনে নেয়া হচ্ছে কি না, খেয়ে ফেললে কাজ হবে না।
- পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। বিশ্রাম নিন। তারপরও শ্বাস কষ্ট না কমলে পাঁচ চাপ নিন। এভাবে মোট পাঁচ বার (মোট ২৫ চাপ) নেয়া যেতে পারে।
- এরপরও শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির টান না কমলে রোগীকে কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে বা যন্ত্রের সাহায্য লাগবে। হাসপাতালে পৌঁছার আগ পর্যন্ত পাঁচ চাপ করে ইনহেলার নিতে থাকবেন।

মা, মেয়ে, মহিলা

মা হওয়ার পর যে ব্যায়াম জরুরি

সন্তানধারণ ও জন্মদানের পর মায়ের শরীরে ঘটে নানা পরিবর্তন। বয়সের সঙ্গেও বদলাতে থাকে অনেক কিছু। এসব কারণে পরবর্তী জীবনে কিছ অস্বস্তিকর সমস্যায় পড়তে পারেন মায়েরা। হাঁচি বা কাশির সময় হঠাৎ সামান্য একট প্রসাব বেরিয়ে যাওয়া এমনই এক সমস্যা। প্রস্রাবের চাপ লাগার সঙ্গে সঙ্গেই বাথরুমে না গেলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। অনেকের জরায় কিংবা জরায়ুমুখ ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে। এসব বিব্রতকর সমস্যা এড়াতে সন্তান জন্মদানের পর বিশেষ ব্যায়াম শুরু করা উচিত। প্রস্রাব আটকে রাখার চেষ্টা করার সময় একেবারে নিচের দিকে চাপ দিতে হয়। প্রস্রাব না লাগলেও ওই অংশের মংসপেশিগুলো চাপ দিয়ে ধরা এ ব্যায়ামকে পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ বলে। যেন জরায়ুমুখের মাংসপেশিগুলো আপনি নিজে নিজে চাপ দিয়ে সংকুচিত করছে। কিংবা পায়ুপথ দিয়ে বেরিয়ে আসা বাতাস আটকানোর চেষ্টা করছেন। শুরুতে তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্ত চাপ দিয়ে রাখুন মাংসপেশিগুলো। চাপ ছেড়ে দেওয়ার পর আরামদায়ক অবস্থায় থাকুন তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড। এভাবে পর্যায়ক্রমে ১০ বার পরপর করুন। প্রতিদিন অন্তত তিন-চারবার। প্রথমবার ব্যায়াম শুরু করবেন শোয়া অবস্থায়। পরে খানিকটা

অভ্যস্ত হয়ে গেলে বসে, এমনকি দাঁড়ানো অবস্থাতেও ব্যায়ামটি করা যায়। পেশি চাপ দিয়ে রাখার সময়ও বাড়ান ধীরে ধীরে। অভ্যস্ত হয়ে গেলে ১০ সেকেন্ড পর্যন্ত চাপ দিয়ে রাখতে পারবেন। এই ব্যায়ামের সময় অন্য কোনো পেশি টান টান করা যাবে না। অর্থাৎ, পেট, পা এবং শরীরের অন্য অংশগুলো স্বাভাবিক ও আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে, ব্যায়ামের সময় শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখবেন। অভ্যস্ত হয়ে গেলে এই ব্যায়ামের জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ না রাখলেও চলবে। দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় ব্যায়ামটি করা সম্ভব। বাজারে গেলে যেমন প্রস্রাব আটকিয়ে রাখেন সেভাবে অভ্যাস করলে চলবে।

মেয়েদের তলপেটে ব্যথা?

তলপেটে ব্যথা মেয়েদের একটি পরিচিত সমস্যা। তবে এটা যে সব সময়ই মেয়েলি সমস্যা, তা নয়। কেননা জরায়ু, ডিম্বাশয় ছাড়াও এখানে আছে মূত্রথলি, বৃহদন্ত্রের কিছু অংশ আছে অ্যাপেনডিক্স। তলপেটের ব্যথা কখনো কখনো মামুলি ব্যাপার, আবার কখনো গুরুতর।

PCOS কি?

PCOS হলো একটি হরমোনজনিত রোগ, যেখানে নারীর ডিম্বাশয়ে (ovary) একাধিক ছোট ছোট সিস্ট (ফোঁড়া/থলি) তৈরি হয় এবং এর ফলে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

- সাধারণত প্রজনন বয়সী (১৫ থেকে ৪০ বছর) নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

PCOS এর লক্ষণ (Symptoms)

১. অনিয়মিত মাসিক (মাসিক দেরিতে হওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া)
২. অতিরিক্ত লোম গজানো (মুখে, বুকে, পেটে - হরমোনজনিত কারণে)
৩. ব্রণ (Acne) ও তৈলাক্ত ত্বক
৪. ওজন বৃদ্ধি, বিশেষ করে পেটের চর্বি
৫. চুল পড়া (Male pattern baldness)
৬. গর্ভধারণে সমস্যা (Infertility)
৭. মানসিক সমস্যা - ডিপ্রেশন, দুশ্চিন্তা

PCOS এর কারণ (Causes)

- Hormonal imbalance → বিশেষ করে LH ↑, FSH ↓ → ডিম্বাণু পরিপক্ক হয় না
- Insulin resistance → রক্তে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে যায়, ফলে রক্তে শর্করা ও এন্ড্রোজেন হরমোন বেড়ে যায়
- বংশগত (Genetic) প্রভাব
- জীবনধারা - মোটা হওয়া, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব

PCOS এর জটিলতা (Complications)

- গর্ভধারণে সমস্যা (Infertility)
- টাইপ ২ ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি
- উচ্চ রক্তচাপ ও হার্টের রোগ
- হাড় ক্ষয় (Metabolic syndrome)
- জরায়ুর ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি (কারণ - অনিয়মিত মাসিক ও endometrial hyperplasia)

PCOS এর চিকিৎসা (Management)

● জীবনধারার পরিবর্তন

- ওজন কমানো (৫-১০% ওজন কমালেই মাসিক নিয়মিত হতে পারে)
- নিয়মিত ব্যায়াম (৩০ মিনিট brisk walking প্রতিদিন)
- স্বাস্থ্যকর খাবার (Low sugar diet, প্রচুর সবজি, High-fiber diet)

ঔষধ

- মাসিক নিয়মিত করার জন্য → Combined oral contraceptive pill (OCP)
- অতিরিক্ত লোম/ ব্রণ কমাতে → Anti-androgenic drug (spironolactone, finasteride - ডাক্তারি পরামর্শে)
- ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমাতে → Metformin
- গর্ভধারণ চাইলে → Ovulation induction drug (clomiphene citrate, letrozole)

মানসিক সমর্থন

- স্ট্রেস কমানো, কাউন্সেলিং
- Lifestyle support group

সারসংক্ষেপ টেবিল

বিষয়	বিবরণ
রোগের নাম	PCOS (Polycystic Ovarian Syndrome)
প্রধান লক্ষণ	অনিয়মিত মাসিক, লোম গজানো, ব্রণ, ওজন বৃদ্ধি, বন্ধ্যাত্ব
কারণ	Hormonal imbalance, Insulin resistance, Genetic
জটিলতা	Diabetes, Heart disease, Infertility, Endometrial cancer
চিকিৎসা	Lifestyle change, OCP, Metformin, Anti-androgen, Ovulation induction

● সহজ কথায়, PCOS একটি দীর্ঘস্থায়ী হরমোনজনিত সমস্যা, তবে সঠিক জীবনধারা পরিবর্তন + চিকিৎসা = সুস্থ জীবন।

মাসিক সম্পর্কিত : মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক, ১০ জনে ১ জন নারীর এটা তীব্র হতে পারে। জরায়ুতে টিউমার, ফাইব্রয়েড বা এন্ডোমেট্রোসিস হলে ব্যথা হবে। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নির্গত হওয়ার সময় কারও কারও ব্যথা অনুভূত হয়। মেয়েদের প্রস্রাবে সংক্রমণ খুবই বেশি। আর এতে তলপেটে ব্যথা হতে পারে।

ইনফেকশন : প্রস্রাবে জ্বালা, প্রস্রাবের সময় ব্যথা, জ্বর জ্বর ভাব থাকতে পারে। জরায়ু ও আশপাশে সংক্রমণ হলে তাকে পেলভিক ইনফ্লামাটরি ডিজিজ বলে । এতে তলপেটে বথ্যা, জ্বর, প্রস্রাব নির্গত হওয়া, মলত্যাগের সময় চাপ দিলে ব্যথা হয়।

অ্যাপেন্ডিসাইটিস : অ্যাপেনডিসাটিসের ব্যথা প্রথমে শুরু হয় নাভির চার দিকে, তারপর তা স্থায়ী হয় তলপেটের ডান দিকে। সঙ্গে বমিও হতে পারে।

এক্টোপিক প্রেগনেন্সি : অনেক সময় ভ্রূণ জরায়ুতে স্থাপিত না হয়ে ডিম্বনালিতে স্থাপিত হয় এবং ডিম্বনালি ফেটে যায়। এটি একটি জরুরি অবস্থা। পেটে প্রচণ্ড ব্যথার পাশাপাশি পুরো তলপেটে রক্তক্ষরণের কারণে রক্তচাপ কমে যেতে পারে, শকে যেতে পারে।

অন্যান্য : এ ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য, আইবিএস, মূত্রথলিতে পাথর ইত্যাদি নানা কারণে তলপেটে ব্যথা হতে পারে।

মাইগ্রেন

পুরুষের তুলনায় নারীদের মাইগ্রেনজনিত মাথাব্যথার সমস্যা প্রায় চারগুণ বেশি। বিশেষজ্ঞরা এর নানা কারণ পেয়েছেন। তবে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল সম্প্রতি একটি উদ্বেগজনক তথ্য দিয়েছে। সেটা হলো, যেসব নারী মাইগ্রেনে ভুগছেন, পরবর্তী সময় তাদের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় বেশি। মাসের বিভিন্ন সময়ে নারীদের রক্তে নানা হরমোনের ওঠানামা মাইগ্রেনের জন্য কিছুটা দায়ী। গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, মাসিক হওয়ার প্রথম দুই দিন মাইগ্রেনে ভোগার আশঙ্কা বেড়ে যায়। ৫০ শতাংশ মাইগ্রেন হয় মাসিকের সময় বা ঠিক আগে। তখন রক্তে ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন হরমোনের হঠাৎ নিম্নগামিতা এ জন্য দায়ী। জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে মাইগ্রেন বাড়ে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মেনোপজ বা রজঃনিবৃত্তির পর মাইগ্রেনের ব্যথা অনেকটাই চলে যায়। এ রকম ঘটে সাধারণত ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নারীদের। এ ছাড়া যেসব কারণকে দায়ী করা হয়, সেগুলো হলো: মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, কোনো একবেলার খাবার বাদ দেয়া, হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন, অতিরিক্ত কফি ইত্যাদি। কিছ খাবারও এর জন্য দায়ী, যেমন: ফাস্ট ফুড, কৃত্রিম চিনি, টাইরামিন সমৃদ্ধ খাবার ইত্যাদি। মাইগ্রেন প্রতিরোধ করতে আগে দায়ী কারণগুলো বের করুন। মাথাব্যথার দিনগুলো ক্যালেন্ডারে দাগ দিন, তার আগের ২৪ ঘণ্টায় কী খেয়েছেন, কী করছেন, ভেবে দেখুন, মাসিকের দিনগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। দিনের ঠিক কোন সময়টায়

ব্যথা শুরু হয়েছিল, মনে করে দেখুন। কারণগুলোকে এড়িয়ে চলতে শিখুন। ভালো ঘুম ও নিয়মিত খাদ্যাভ্যাস রপ্ত করুন। সচল থাকুন, নিয়মিত ব্যায়াম করুন। অ্যালকোহল, কফি, চকলেট, কলা, ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলুন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করুন।

জরায়ুমুখের ক্যানসার ও ভাইরাস?

বাংলাদেশে নারীদের স্তন ক্যানসারের পরই জরায়ুমুখের ক্যানসারে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। এই অসুখের অন্যতম কারণ একধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ, নাম হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা এইচপিভি।

১. এইচপিভির শতাধিক প্রজাতি আছে। এর মধ্যে ১৩টি জরায়ুমুখ ক্যানসারের জন্য দায়ী।

২. এই সংক্রমণ ছোঁয়াচে। পৃথিবীতে প্রতি ১০ জন নারী-পুরুষের মধ্যে নয়জনই জীবনে অন্তত একবার হলেও এইচপিভি সংক্রমিত হন।

৩. এই ভাইরাস সংক্রমিত হলেই যে ক্যানসার হবে, তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দিয়ে এইচপিভির মোকাবিলা করতে পারেন।

৪. অল্প বয়সে যৌনকাজ, নারী-পুরুষের বহুগামিতা এই সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

৫. এই ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে যৌনকাজের আগে এইচপিভির টিকা নিতে হবে।

৬. যৌন সংসর্গের সময় কনডম বা প্রতিরোধক ব্যবহার করেও ঝুঁকি অনেকটাই কমানো যায়।

৭. টিকা নেওয়ার পরও প্রত্যেক নারীর (যৌনক্রিয়া শুরু হওয়ার) ২১ বছর বয়স থেকে তিন বছর পর পর প্যাপ স্মিয়ার টেস্ট করে জরায়ুমুখের ক্যানসার হয়েছে কিনা জেনে নিতে হবে।

৮. প্রায় প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্ক্রিনিং পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এতে কোনো অস্বাভাবিকতা মিললে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

HPVvaccine

HPVvaccine

বাংলাদেশ সরকার ৫ম থেকে ৯ম শ্রেনীর (১৪-১০ বছর) ছাত্রীদের ফ্রী ভ্যাক্সিন দেবার প্রোগ্রাম চালু করেছে। vaxepi.gov.bd পোর্টাল রেজিস্ট্রী করে এ সুবিধা নিতে হবে।

গর্ভকালীন বুক জ্বালাপোড়া?

বুক জ্বালা করা এবং খাবার খাওয়ার পর তা উঠে আসছে বলে মনে হওয়া গর্ভকালীন একটি সাধারণ সমস্যা। এ সময় হরমোনের তারতম্যের কারণে বুকে-পেটে জ্বালাযন্ত্রণা অস্বস্তিকর অনুভূতি, হালকা পেটব্যথা, বমি ভাব কিংবা বমি হতে পারে। এসব সমস্যাকে সাধারণভাবে অ্যাসিডিটি বা গ্যাসের সমস্যা বলে চিকিৎসা করা হয়। হরমোনের তারতম্য ছাড়াও অনিয়মিত খাবার গ্রহণ অর্থাৎ দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকা, ভাজাপোড়া এবং অধিক তেল-মসলাসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, খাদ্যে ভেজাল বা ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি, দুশ্চিন্তা, চাপ প্রভৃতি কারণেও এমন সমস্যা হয়ে থাকে। গর্ভের সন্তান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য খাবার গ্রহণেও এসব সমস্যা বাড়ার প্রবণতা থাকে।

গর্ভাবস্থায় এসব সমস্যা থেকে বাঁচার উপায় : বার বার হালকা খাবার খাওয়া। অতিরিক্ত ঝাল, মসলাদার খাবার, তেলে ভাজা খাবার বাদ। একেবারে ভরপেট খাওয়া যাবে না। অল্প অল্প করে বারবার খেতে হবে। এ সময় শুধু ঘুমের সময়টা ছাড়া বাকি সময়ে কোনোভাবেই তিন ঘণ্টার বেশি সময় পেট খালি রাখা যাবে না। তাই শুধু তিন বেলায় নিয়মিত খাওয়া নয়, এর মাঝে স্যুপ, তাজার ফলমূল, দুধ, বিস্কুট, মুড়িসহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। বাইরের খোলা, অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়িয়ে চলুন। খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শোয়া যাবে না। মানসিক চাপ দূরে সরিয়ে রাখুন। অনাগত সন্তানের কথা ভেবে হাসিখুশি থাকুন। গর্ভকালীন এসব সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সাধারণত সন্তান জন্মের পর এসব সমস্যা পুরোপরিভাবে ভালো হয়ে যায়। এ সময় নিজে নিজে কোনো ওষুধ সেবন করা ঠিক নয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পছন্দসহ পদ্ধতি কোনটি?

কেউ সদ্য বিয়ে করেছেন, একট দেরিতে সন্তান নেবেন। কারও আবার একটি সন্তান আছে, পরের সন্তান আগে কয়েক বছরের বিরতি চান। কেউ হয়তো ইতোমধ্যে দুই সন্তানের বাবা-মা, তাই জন্মনিয়ন্ত্রণে স্থায়ী কোনো পদ্ধতিতে যেতে চান। কেউ চান প্রসব-পরবর্তী সময়ের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, কেউ আবার চান গর্ভপাত-পরবর্তী সময়ে। জন্মনিয়ন্ত্রণের নানা রকমের পদ্ধতি আছে। তবে একেক দম্পতির জন্য একেক রকম পদ্ধতি ভালো। সবার চাহিদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ পরামর্শ বা কাউন্সেলিং, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক পরিবার পরিকল্পনাসেবার দরকার হয়। সবার জন্য একই পদ্ধতি কখনো প্রযোজ্য হতে পারে না। (১) নবদম্পতি, অর্থাৎ অল্পবয়সী দম্পতির জন্য শারীরিক পরিবর্তণ, গর্ভধারণ, যৌনসংক্রমণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তিন বছর বা পাঁচ বছর মেয়াদি জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 'ইমপ্ল্যান্ট, উপযক্ত পদ্ধতি হিসেবে স্বীকত। এ ছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি, কনডম প্রভৃতি সহজলভ্য ও সমাদৃত। (২) পঁয়ত্রিশোর্ধ্ব নারীদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিশেষ চাহিদা রয়েছে; তাদের বেশির ভাগেরই অন্তত: দুটি সন্তান রয়েছে এবং আর সন্তান নিতে চান না। অনেকে মনে করেন,

আর পরিবার পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কিংবা এ বয়সে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি বা অন্য পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে চিন্তিত হন। আসলে একজন সুস্থ মধ্যবয়সী নারীর জন্য সব পদ্ধতিই নিরাপদ। তবে বয়স্ক নারীদের, যাদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি অথবা উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তাদের বড়ি ব্যবহার করা উচিত নয়। তাদের জন্য কপার-টি এবং স্থায়ী পদ্ধতিই বেশি উপযোগ। (৩) কমবয়সী নারী-পুরুষের স্থায়ী পদ্ধতি, অর্থাৎ নারীর ক্ষেত্রে লাইগেশন এবং পুরুষের ভ্যাসেকটমি পদ্ধতি গ্রহণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (৪) যাদের একটি সন্তান আছে কিন্তু পরবর্তী সন্তানের জন্মের আগে কিছুটা সময় চান (বার্থ স্পেসিং) তাদের জন্য তিন মাস মেয়াদি হরমোনাল ইনজেকশন, তিন বছর মেয়াদি ইমপ্ল্যান্ট, পাঁচ বছর মেয়াদি জেডেল কিংবা মুখে খাওয়ার বড়িও বেশ স্বীকৃত ও সহজলভ্য। একটি সন্তান জন্মের পর নন-হরমোনাল কপার-টিও হতে পারে জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি ভালো ব্যবস্থা। তাই যার যার অবস্থা বুঝে জুতসই একটি পদ্ধতি বেছে নিন।

অসহ্য দিনগুলোর কথা

মেজাজ খিটখিটে, মন খারাপ ভাব, বিরক্তি। হঠাৎ খিদে পাওয়া, ক্লান্তি, মাথা ব্যথা। পেটে অস্বস্তি। ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য। কখনো স্তনে সামান্য ব্যথা। মাসে বিশেষ কয়েকটি দিন কোনো কোনো নারীর এ রকম খারাপ যায়। আবার কয়েক দিন পরই ঠিকঠাক। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর আরেক নাম প্রি মেনস্ট্রুয়াল সিনড্রোম বা মাসিক পূর্ববর্তী উপসর্গসমূহ। ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়স্ক ৮৫ শতাংশ নারীই এই সমস্যা ভোগেন। অথচ প্রায়ই বিষয়টা তারা খেয়াল করেন না। মাসিক শুরু হওয়ার দিনটির ৫ থেকে ১০ দিন আগে থেকে শুরু হতে পারে এসব উপসর্গ। এর জন্য দায়ী করা হয়ে মাসিকের আগে-পরে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোনের ওঠানামা আর সেরোটোনিন নামের রাসায়নিকের নিঃসরণকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই হরমোনের ওঠানামা সাধারণ কিছু উপসর্গ তৈরি করা এবং কয়েকটা দিনকে অসহ্য মনে হওয়া ছাড়া তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না শরীর ও মনে। কিন্তু ২০ থেকে ৩২ শতাংশ নারীর উপসর্গের মাত্রা এত বেশি হতে পারে, যা তাঁকে শারীরিক-মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করে ফেলে। ৩ থেকে ৮ শতাংশ নারীর হতে পারে প্রি-মেনস্ট্রুয়াল ডিসফোরিক ডিজঅর্ডার, যাতে তিনি বিষণ্নতায় আক্রান্ত হতে পারেন। প্রি মেনস্ট্রুয়াল উপসর্গগুলোকে পুরোপুরি বিদায় করা যায় না। তবে চাইলে এবং সচেতন থাকলে অনেকখানি কমানো যায়। এ সময় প্রচুর পানি পান করতে হবে। খেতে হবে অনেক ফলমূল। যথেষ্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে তাজা ফলে, যা উপসর্গ কামায়। চা,কফি, অতিরিক্ত লবন সমস্যা বাড়াবে, কেননা এগুলো সেরোটোনিন জাতীয় রাসায়নিকের নিঃসরণ আরও বাড়ায়। এ সময় ক্লান্তি বা অবসাদ ঠেকানোর জন্য দুধ ও ভিটামিন ডি যক্ত খাবার খেতে হবে বেশি। ফলিক অ্যাসিড, বি ৬, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম খেতে বলা হয়। কয়েক দিনের জন্য ফলিক অ্যাসিড বড়িও খাওয়া যেতে পারে। স্ট্রেস, দুশ্চিন্তা কমাতে হবে। রাতে ভালো করে ঘুমাতে হবে। রাত জাগলে

উপসর্গ বাড়ে। বই পড়া বা গান শোনার মতো কাজ মনকে শান্ত করতে সাহায্য করে। অন্তত ৩০ মিনিট অ্যারোবিক ব্যায়াম বা ইয়োগা স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামও করা যায়।

মা-বাবা হওয়ার প্রস্তুতি?

পরিবারে আসবে নতুন সদস্য। যেকোনো মা-বাবার কাছে এটা বড় ঘটনা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জন্য আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ঘাটতিই বেশি দেখা যায়। সন্তান জন্মের প্রায় পুরোটা ধকল ও দায়িত্ব মাকেই নিতে হয়। আজকাল সবাই নির্ঝঞ্ঝাট প্রসব চান। তাই আগে থেকেই চেকআপ করিয়ে নিতে হবে হবু মায়ের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের সমস্যা আছে কি না। রক্তের গ্রুপটা কী? যদি নেগেটিভ হয়, তবে স্বামীরটাও দেখে নিন। কেননা পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে জটিলতা হতে পারে। অনেক পরিবারে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন ট্রেইট ও একটু দেখে নেয়া যায়। রক্তে হিমোগ্লোবিন কম থাকলে তা- ও একট দেখে নেয়া যায়। কারণ, স্বামীর পরিবারেও এ সমস্যা থাকলে অনাগত সন্তান বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। হেপাটাইটিস বি স্ক্রিনিং করে প্রয়োজনে টিকা দিয়ে নেয়া উচিত মায়ের। গর্ভবতী হয়ে পড়লে তখন আর নেয়া যাবে না। সন্তান নেয়ার পরিকল্পনার সময় থেকেই ফলিক অ্যাসিড ও জিঙ্ক খাওয়া শুরু করে দিতে পারেন। এতে জটিলতা অনেক কমে। অতিরিক্ত ওজন থাকলে তা আগেই ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুন, রক্তশূন্যতা থাকলে তা ঠিক করে নিন। একটি পরিকল্পিত সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে গর্ভধারণের অন্তত তিন মাস আগে থেকেই শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতি নেয়া চাই বাবা-মায়ের। একট একট করে সঞ্চয় করুন। প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী খরচের প্রস্তুতি নিন। রক্তদাতার নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর, হাসপাতালে যাতায়াত-ব্যবস্থা, অফিস থেকে ছুটি, স্বজনদের সহায়তা-সবই মাথায় রাখুন।

মেয়ের খেলাধুলা

বালিকা বা কিশোরী বয়সের মেয়েরা খেলাধুলা না করলেই নানা স্বাস্থ্য জটিলতায় আক্রান্ত হয়।

১. কৈশোরে অনেক মেয়ের হঠাৎ করে ওজন বাড়তে থাকে। মোটেও খেলাধুলা বা শারীরিক পরিশ্রম না করা এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এ জন্য দায়ী। তবে এই ওজন বৃদ্ধি নানা রকমের হরমোনজনিত সমস্যার সৃষ্টি করে। পরিণামে মাসিকের গোলমাল, গায়ে অবাঞ্ছিত লোম, ডিম্বাশয়ে সিস্ট, রক্তে শর্করা বৃদ্ধির সমস্যা ইত্যাদি দেখা দেয়।

২. কৈশোর-তারুণ্য পর্যন্ত শরীরের হাড়ের ঘনত্ব সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়। এই ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয় কতটুক হবে। আর এই ঘনত্ব তৈরিতে ব্যায়াম, খেলাধুলার যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি ভূমিকা আছে সূর্যালোকের।

৩. গবেষণায় দেখা যায়, শৈশব-কৈশোরে নিয়মিত খেলাধুলা করলে পরবর্তী জীবনে মেয়েদের স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি ৬০ শতাংশ কমে।

৪. অল্প বয়সে খেলাধুলার অভাবে ওজন বৃদ্ধি পরবর্তীকালের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ায়।

৫. খেলাধুলা ও ব্যায়াম কিশোরীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে-এটা প্রমাণিত। তাদের লেখাপড়ায় মনোযোগ ও দক্ষতা বাড়ে। ফিমেল ফরচুন পত্রিকা বিশ্বসেরা ৫০০ জন সফল নারী কর্মকর্তার ওপর জরিপ চালিয়ে দেখেছে, তাঁদের ৮০ শতাংশই কৈশোরে ছোটাছুটি করতেন খেলতেন।

অন্তঃসত্তা মায়ের হৃদ্‌রোগ?

নতুন মা হতে যাচ্ছেন, এমন নারীরা কি নিজের হৃদস্বাস্থ্য সম্পর্কে জানেন? গর্ভধারণকালীন বা সন্তান প্রসবের সময় অনেক নারীই কিন্তু হৃদ্‌রোগজনিত জটিলতায় আক্রান্ত হন। অনেকের করুণ মৃত্যুও ঘটে। গর্ভকালীন সময়ে এক নারীর হৃদ্‌যন্ত্রকে আগের তুলনায় মিনিটে ৪০ শতাংশ বেশি রক্ত পাম্প করতে হয়। রক্তের আয়তনও যায় বেড়ে। এমনকি রক্তচাপেও তারতম্য ঘটে। এসবই স্বাভাবিক। তা নারীর শরীরের সঙ্গে মানিয়ে যায়।

ভালব ত্রুটি : যাদের লুক্কায়িত কোনো হৃদ্‌রোগ আছে (যেমন জন্মগত ভালব ত্রুটি), বা ছোটবেলায় বাতজ্বরের ইতিহাস, কিংবা আগে থেকে উচ্চরক্তচাপ ছিল তাঁদের জন্য সন্তানধারণ বাড়তি ঝুঁকি ডেকে আনে বৈকি। তাদের জন্য চাই বাড়তি সচেতনতা। যাদের ছেলেবেলায় বাতজ্বর ছিল চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হবেন ঝুঁকি কতটুকু। কিছু জন্মগত হৃদ্‌রোগ বা ত্রুটির চিকিৎসা করে সারিয়ে নিয়ে বা শল্য চিকিৎসা করার পর গর্ভধারণের পরামর্শ দেয়া হয়। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসার পর নিরাপদ মাতৃত্ব সম্ভব।

উচ্চ রক্তচাপ : উচ্চ রক্তচাপ অনেকেরই থাকে। হয়তো ওষুধও খাচ্ছেন। কিন্তু সন্তান ধারণের আগে এই ওষুধ নিরাপদ কি না, ওষুধ পাল্টাতে হবে কি না বা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে কি না, সে বিষয়ে পরামর্শ নিন। আগে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন এমন নারীরও গর্ভধারণের পর নানা সমস্যা হতে পারে। ৮ শতাংশ নারীর ২৮ সপ্তাহের পর উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিতে পারে। খিঁচুনিসহ নানা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। এ সময় নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করা ও প্রয়োজন চিকিৎসা দেয়া দরকার।

কার্ডিওমায়োপ্যাথি : গর্ভকালীন শেষ তিন মাস ও প্রসবের পর পাঁচ মাস পর্যন্ত হৃদ্‌যন্ত্র বড় হয়ে হার্ট ফেইলিউর হতে পারে এতে শ্বাসকষ্ট, বিশেষ করে শ্বাসকষ্টের জন্য শুতে না পারা, পায়ে মুখে পানি আসা জাতীয় লক্ষণ দেখা দেয়। এ ধরনের সমস্যায় দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

এ্যারিথমিয়া : এ সময় অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। হরমোন সমস্যা, থাইয়রডের সমস্যা, ডায়াবেটিস রোগ থাকলে ঝুঁকি বেশি।

গর্ভাবস্থায় চিকুনগুনিয়া কি বিপজ্জনক?

চিকুনগুনিয়া একটি ভাইরাসজনিত রোগ, যা এডিস মশার কামড়ে ছড়ায়। আক্রান্ত ব্যক্তি জ্বরে, অস্থিসন্ধির ব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা এবং ফুলে যাওয়া, মাথাব্যথা, শরীরে র‍্যাশ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণত শরীরে ভাইরাস প্রবেশের ১২-২ দিনের মাঝে এসব উপসর্গ প্রকট হয়ে ওঠে। অন্তঃসত্ত্বা নারীরা এর ঝুঁকির মধ্যে পড়েন। বাড়ির অন্য সদস্যদের সঙ্গে তারাও চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হন। গর্ভাবস্থায় চিকুনগুনিয়া ঝুঁকিতে ফেলতে পারে মা ও শিশু দুজনকেই। তাদের সাধারণ উপসর্গগুলো ছাড়াও মুখের ভেতর ঘা, পাতলা পায়খানা, রক্ত জমে যাওয়া ও রক্তচাপ কমে যাওয়া আশঙ্কা তাকে। উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। খুব বিরলভাবে হলেও এই ভাইরাসজনিত রোগে মস্তিষ্ক বা এর পর্দার প্রদাহ, স্নায়ুতন্ত্রের রোগ, রক্তক্ষরণের মতো প্রাণঘাতী সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভের শিশুও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এমনকি গর্ভপাতও হয়ে যেতে পারে। তাই সতর্কতা জরুরি। গর্ভকালীন সময়ের শেষ দিকে (৩৬ সপ্তাহের পর) কিংবা সন্তা জন্মের সময় চিকুনগুনিয়া হলে শিশুর আক্রান্ত আশঙ্কা রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই বাড়িতে সন্তান প্রসব করানো উচিত নয়। তবে চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ শিশুকে খাওয়ানোতে কোনো বাধা নেই, বুকের দুধের মাধ্যমে চিকুনগুনিয়া ছড়ায় না। মশারি ও ত্বকে লাগানোর মশা তাড়ানোর ওষুধ ব্যবহার করুন। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি। চিকুনগুনিয়া হলে প্রচুর পানি পান করা এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেয়া চাই। প্যারাসিটামল সেবন করা যেতে পারে। অনেক সময় চিকুনগুনিয়ার সঙ্গে ডেঙ্গুকে আলাদা করা কঠিন। তাই রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

মেনোপজ

মহিলাদের বয়সের একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যখন মহিলা হরমোন কমে যায় তখন মোনোপজ হয়।একাদিক্রমে ১২ মাস পিরিয়ড বা স্পটিং না হলে সেটা মেনোপজ।

হট ফ্লাশ বা আকস্মিক উষ্ণতা মেনোপসের আসল উপসর্গ। হঠাৎ গরমের একটা অনুভূতি ঘাড় মুখ বুকের উপর দিয়ে বয়ে যায়। মুখমন্ডল লালাভ দেখায়। মাথার চাঁদি জ্বলে। কানদিয়ে তাপ বেরোয়।ঘেমে যায়। বিশেষ করে রাতে। হৃদস্পন্দন বাড়ে। প্রায় সবার মুড সুইং হয়। নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। মনে রাখতে পারেনা। মতিভ্রম ঘটে (ব্রেইন ফগ)। অগোছাল অসহনশীল হয়। শরীরে আকার আকৃতি বদলায় চামড়া শুকায়। যোনীপথ শুকায়, যৌনাকাঙ্ক্ষা কমে। উপসর্গগুলো বেশ কিছুদিন থাকে। মেনোপজ হবার আগেই উপসর্গ শুরু হয়।পিরিয়ড অস্বাভাবিক ও অনিয়মিত হতে থাকে। মেনোপজের কোন

চিকিৎসা নাই। জীবন যাত্রার পরিবর্তন অর্থাৎ প্রকৃতিকে গ্রহন আর পরিবর্তনকে জীবনের সাথে সমন্বয় করতে পারলেই ভাল।

অবশ্যই

Menopause (মেনোপজ) মানে হলো একজন নারীর জীবনে মাসিক ঋতুস্রাব স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া। সাধারণত ৪৫-৫৫ বছরের মধ্যে ঘটে।

- মেনোপজের বৈশিষ্ট্য (Features)
    - মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া (কমপক্ষে ১২ মাস ধারাবাহিকভাবে মাসিক না হওয়া)
    - বয়স সাধারণত ৫০ এর আশেপাশে হয়
    - মাসিক অনিয়মিত হয়ে আসা, হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া
    - রক্তে Estrogen হরমোনের পরিমাণ কমে যাওয়া
- মেনোপজের সাধারণ সমস্যা (Problems)

১. শারীরিক সমস্যা

- হট ফ্লাশ (হঠাৎ গরম লাগা, ঘাম হওয়া)
- রাতে ঘেমে যাওয়া (night sweats)
- যোনি শুষ্কতা → সহবাসে ব্যথা (Dyspareunia)
- প্রস্রাবের সমস্যা (বারবার প্রস্রাব, ইনফেকশন)
- হাড় ক্ষয় (Osteoporosis) → হাড় ভাঙার ঝুঁকি বাড়ে
- ওজন বৃদ্ধি ও পেটের চর্বি জমা
- চুল ও ত্বকের পরিবর্তন

২. মানসিক/আচরণগত সমস্যা

- মুড পরিবর্তন (ঝাঁজালো স্বভাব, বিরক্তি)
- হতাশা বা ডিপ্রেশন
- ঘুমের সমস্যা (Insomnia)
- মনোযোগ কমে যাওয়া

- সমাধান / প্রতিকার (Solutions)

১. জীবনধারা পরিবর্তন

- হালকা ব্যায়াম ও যোগব্যায়াম
- স্বাস্থ্যকর খাদ্য (ক্যালসিয়াম, ভিটামিন উ, শাক-সবজি, দুধ, মাছ)
- ধূমপান ও অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা
- পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক চাপ কমানো

২. ঔষধ ও চিকিৎসা

- HRT (Hormone Replacement Therapy) → Estrogen হরমোনের ঘাটতি পূরণ (শুধুমাত্র ডাক্তারের পরামর্শে)
- যোনি শুষ্কতায় → Lubricant বা Estrogen cream
- Osteoporosis প্রতিরোধে → ক্যালসিয়াম, ভিটামিন D, প্রয়োজনে bisphosphonate

৩. মানসিক সমর্থন

- পরিবার ও স্বামীর সমঝোতা
- কাউন্সেলিং
- Stress management techniques

● সহজ করে বললে, মেনোপজ জীবনের স্বাভাবিক অংশ, তবে এর প্রভাব কমানোর জন্য সঠিক খাবার, ব্যায়াম, মানসিক সমর্থন ও প্রয়োজনে চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Dyspareunia (ডাইস্প্যারিউনিয়া) মানে হলো সহবাসের সময় বা পরে যৌনাঙ্গে ব্যথা হওয়া

এটি পুরুষ ও নারী দু'জনের ক্ষেত্রেই হতে পারে, তবে নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

● কেন হয়? (সম্ভাব্য কারণসমূহ)

● নারীদের ক্ষেত্রে

- যোনিপথ শুষ্কতা (যেমন- menopause, estrogen কমে যাওয়া, দুধ খাওয়ানোর সময়)
- সংক্রমণ (যোনি বা মূত্রনালীতে সংক্রমণ, ফাঙ্গাল ইনফেকশন)
- যোনির প্রদাহ বা Vulvovaginitis
- Endometriosis, Pelvic inflammatory disease (PID)
- প্রসব-পরবর্তী বা অস্ত্রোপচারের পরে টিস্যুতে আঘাত/দাগ
- মানসিক কারণ (ভয়, উদ্বেগ, সম্পর্কের টানাপোড়েন)

● পুরুষদের ক্ষেত্রে

- Prostatitis, মূত্রনালী সংক্রমণ
- Phimosis বা tight foreskin
- ত্বকের সমস্যা বা ঘর্ষণ

● প্রতিকার ও করণীয়

১. প্রথমে কারণ খুঁজে বের করা দরকার – এজন্য গাইনোকলজিস্ট বা ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নিতে হবে।

২. যোনি শুষ্কতা থাকলে

- পর্যাপ্ত foreplay
- lubricating gel/cream (water-based lubricant) ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. সংক্রমণ থাকলে

- প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিফাঙ্গাল চিকিৎসা

৪. হরমোনাল ঘাটতি থাকলে

- প্রয়োজনে স্থানীয় estrogen cream/therapy (ডাক্তারের পরামর্শে)

৫. মানসিক কারণ থাকলে

- কাউন্সেলিং, দম্পতির মধ্যে খোলামেলা আলোচনা, উদ্বেগ কমানোর কৌশল

৬. ব্যথা যদি দীর্ঘদিন থাকে

- Pelvic floor physiotherapy বা বিশেষায়িত pain management প্রয়োজন হতে পারে।

● সোজা কথায়, Dyspareunia কোনো রোগ নয়, বরং উপসর্গ। এর পিছনের কারণ বের করে সঠিক চিকিৎসা করলেই উপশম সম্ভব।

মা ও করোনা/মাতৃত্ব ও ডেঙ্গু/ মাতৃত্ব ও চিকুনগুনিয়া

আপদকালীন সময়ে/মৌসুমে গর্ভধারন ঠেকাতে পারাই সর্বোত্তম। গর্ভবতী মা ঝুঁকিপূর্ন রোগী বিধায় প্রথম থেকে উত্তম সেবা নিশ্চত করতে হবে।

ডেঙ্গু : পিএক্লামশিয়া হলো কিনা পরীক্ষা করতে হবে। ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট কঠিনতর। মাতৃমৃত্যু হয়না,তবে ডেঙ্গুতে একটি মৃত্যুর খবর জানা গেছে এ পর্যন্ত। বাচ্চার বিকলাঙ্গ হবার আশংকা শূন্য নয়। ডেঙ্গুর জন্য ডেলিভারি/টারমিনেশন করার যুক্তি নেই। শুধুমাত্র ডেঙ্গুর কারণে অগ্রিম সিজার করার দরকারও পড়েনা। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় এবং ডেলিভারির সময় বাচ্চার ইনফেকশন হতে পারে। ডেলিভারির সময় গর্ভাবস্থায় মা আক্রান্ত হলে ভূমিষ্ঠ হবার পর বাচ্চার এন্টিবডি টেস্ট করতে হবে। বাচ্চার ডেঙ্গু হলে সেটা হবে হিমরেজিক (মারাত্মক) ডেঙ্গু।

করোনা : জটিল/মারাত্মক হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। মায়ের জীবন বাঁচানোই চিকিৎসার লক্ষ্য। বিকলাঙ্গ বাচ্চা হয় কিনা জানতে হবে ভবিষ্যত অনুসন্ধানে। শুধু করোনার ভয়ে/ কারণে টারমিনেট করা সিজার করার দরকার পড়ে না। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় এবং ডেলিভারীর সময় বাচ্চার ইনফেকশন হতে পারে।নবজাতকের পরীক্ষার জন্য নিশ্চিত নির্দেশনা নেই।

ব্রেস্টফিডিং-ডেঙ্গু : মশাবাহিত, মায়ের দুধ দিয়ে ছড়ায় না। করোনা: বাচ্চার জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই মাস্ক পরে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে হ্যান্ড হাইজিন মেনে ব্রেস্ট ফিড করাতে হবে।

কোভিড ১৯ (সার্স করোনা ২), ডেঙ্গু-ডেন, চিকুনগুনিয়া-চিক

তিন ভাইরাল ইনফেকশন আমাদের জীবনের সাথে মিশে গেছে। ইনফ্লুয়েন্জা ফ্লু, করোনা ফ্লু মূলত: প্রাণীদের রোগ। ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়া মানুষ ছাড়া কারো হয়না। করোনা ছড়ায় হাঁচি কাশি দিয়ে আর নাক মুখ চোখ স্পর্শ করলে। মশা না কামড়ালে ডেঙ্গু হবেনা। সবগুলো অসুখই মোটামুটি ধারাবাহিক ভাবে হচ্ছে। ১৯৫৫ সালে ফিলিপিনসে প্রথম ডেঙ্গু হিমরেজিক ফিভার শনাক্ত হয়। ১৯২০ সালে স্পানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা ফ্লুতে ৫০ মিলিয়ন লোক মারা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞান এগিয়েছে, ভাইরাসের পরিবর্তনের সাথে বহুমাত্রিক উপসর্গ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। প্রতিকার আর প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এখনও সনাতনি পদ্ধতিতেই থাকতে হচ্ছে।

উপসর্গ : প্রাথমিক ভাবে সব ভাইরাসের একই। তবে ব্যতিক্রম এদের আক্রমণের লক্ষবস্তু।

করোনা মূলত : শ্বাসনালীতে, ফুসফুসে ঢুকে। চিকুনগুনিয়া অস্থিসন্ধি, মাংস, লিগামেন্ট (মাসকুলো স্কেলিটালস -রিউমাটলজী)কে আক্রমন করে। আর ডেঙ্গুর জন্য প্ল্যাটিলেট রক্তকনিকা কমলেও আসলে সমস্যা রক্ত নালীর লিকেজ। সবগুলো রোগেরই মামুলি ঠান্ডা কাশি গা ম্যাজ ম্যাজ, গা ব্যাথা ,ক্ষুধা মন্দার মত প্রাথমিক উপসর্গ থাকে-জ্বরের সাথে।

মৃদু রোগ : ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস (আই এল আই): কোভিডের ৮০ শতাংশ এ ধরনের। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্দি-গর্মি। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সবারই নাক ঝরে, হাঁচি কাশি হয়। ৩০ শতাংশ হয় করোনা ভাইরাস দিয়ে, বাকিগুলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দিয়ে। ডেঙ্গুর মৃদু অবস্থা হল ক্লাসিকাল ডেঙ্গু। তিনটি রোগেই পর্যাপ্ত পানি পান করলে, বিশ্রাম নিলে ভাল থাকে সাথে। প্যারাসিটামল আর এন্টিহিস্টামিন খেলে চলে। লিভার সবচেয়ে বড় অরগান ভাইরাস বেশি ঢুকে প্রদাহ বেশি বিধায় এন এস আইডি খাওয়া যায়না।

বিপদজনক (মডারেট) : ডেঙ্গু হেমরেজিক ফিভার ঠিকমত কেয়ার না করে থাকলে ডেঙ্গু শক সিন্ড্রম হলে মারাত্মক হবে। স্যালাইন দিলে আর রক্তচাপ ,প্রস্রাব মনিটর করলে ভয় থাকেনা। ডেঙ্গুর বেলায় ৬-৫ দিনের দিকে এটা হয়; সে হিসেবে অসুখের ৯-৬ দিন পর্যন্ত বিশেষ সতর্ক থাকলে বিপদের আশংকা নেই। প্ল্যাটিলেট ও হিমাটক্রিট পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

করোনা ফুসফুসে ঢুকলে নিউমোনিয়া হয়,এটা বিপদজনক; কারন সময় বাড়তে থাকলে ফুসফুসে ব্যক্টেরিয়ার ইনফেকশন (সুপার ইনফেকশন) সেপটিসিমিয়া (রক্তে ছড়ানো ইনফেকশন) ফুসফুস ফেইলুর সব হতে পারে। ৬৫ বছর বয়সোর্ধদের সব নিউমোনিয়াই মারাত্মক। করোনার বেলায় ১০-৬ দিনে মারাত্মক হয়। SPO2 (অক্সিজেন স্যাচুরেশন) দেখে চিকিৎসার ধরন নির্ধারন করতে হয়।

যাদের বিপদ বেশি : সব অসুখেই একটা গ্রুপের মানুষের জন্য বিপদ বেশি। তারা হলেন পয়ষট্টোর্ধ ব্যাক্তিবর্গ,গর্ভবতী মহিলা এবং যাদের ডায়াবেটিস, ক্যানসার আছে; হার্ট কিডনী, লিভার বা শ্বাসের অসুখ আছে। পরিচর্যার ক্ষেত্রে এদের বিশেষ সেবা লাগবে।

মারাত্মক : (সিভেয়ার) মারাত্মক আকারে হলে মৃতের সংখ্যা বাড়ে কারন রোগটা সারা শরীরের অসুখে পরিণত হয়; হার্ট, কিডনী, লিভার আক্রান্ত হয়ে পরলে কিছ করার থাকেনা। ডেঙ্গুর বেলায় এটা শক সিন্ড্রম আর করোনায় রেসপিরেটরী ফেইলর যাদের ভেন্টিলেটর লাগে। মারাত্মক হলে সব রোগেরই জরুরী চিকিৎসা ও নিবিড় (আইসিইউ) পরিচর্যা লাগে। চিকুনগুনিয়া ব্যথা প্রদাহে মানুষ অচল হয়ে যেতে পারে (নগন্য সংখ্যক)।

এটিপিক্যাল ফরম : করোনায় স্ট্রোক করে মারা গেল বা প্যারালাইসিস হয়ে গেল এটা স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে। করোনায় রক্তনালীর মধ্যে রক্তজমাট বাঁধে যাকে বলে মাইক্রোথ্রম্বাস। মাইক্রোথ্রম্বাস ফুসফুসের রক্তনালীর মধ্যেও হয়। এখন বোঝা যাচ্ছে পঞ্চম/ষষ্ঠ দিনে হঠাৎ মরে যাবার এটা একটা কারন। একই কারনে অনেকের ভেন্টিলেটরে কাজ হয়না, ভেন্টিলেটরে ক্ষতি হয়! ডেঙ্গুতে যখন খিঁচুনি হয় (এনকেফালাইটিস), ইসিজি চেঞ্জ (কারডাইটিস, হৃদপিন্ডের প্রদাহ) হয় সেটা এটিপিক্যাল; এগুলো থাকলে এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিন্ড্রম। চিকুনগুনিয়ায় ও কারডাইটিস এনকেফালাইটিস হবার নজীর আছে;ভাইরাস তো কোন অংগকেই খাতির করেনা।

বিশেষত্ব : ডেঙ্গুতে আনুষঙ্গিক যাই লাগুক পানি/স্যালাইন/ফ্লুইড সময়মত পরিমিত দিতে পারলে খারাপ হবার সম্ভাবনা কম। শুধুমাত্র অক্সিজেন দিয়ে যদি SPO2 নব্বই শতাংশ রাখা যায় তাহলে কোভিড বিজয়ী হওয়া সম্ভব।

প্ল্যাটিলেট পরীক্ষা করে ডেঙ্গু মারাত্মক কিনা বলা যায় যেমন বলা যায় কোভিডের বেলায় ডি-ডাইমার পরীক্ষা করে।

মিল/অমিল : বর্ষা মৌসুমে হলে ডেঙ্গ অথবা চিকুনগুনিয়া হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। এগুলো এখন অবশ্য সাংবাৎসরিক। ফ্লু ঠান্ডার দেশের অসুখ হলেও এখন শীত/গরম/

মরুভূমি মানছে না। চিকুনগুনিয়া ডেঙ্গুতে র‍্যাশ থাকলেও কোভিডে নাই। জ্বরের সাথে হার না মানা কাশি, গলায় ব্যাথা থাকলে চিকুনগুনিয়া বা ডেঙ্গ নয়। অসুখের ৬-৫ দিনে উপসর্গ না কমলে তিনটি ভাইরাসের রোগীই খারাপ হচ্ছে মনে করতে হবে, হাসপাতালে ভর্তির হিসেব করতে হবে।

চিকিৎসা : অনেক ঔষধের নাম শোনা গেলেও শতবর্ষী এই অসুখগুলোর জন্য নাই কার্যকরী এন্টিভাইরাল ড্রাগ। যদিও ইদানীংকার নূতনতর ঔষধগুলো কিঞ্চিত হলেও আশা জাগাচ্ছে। সবগুলো অসুখেই প্রতিকার নয় প্রতিরোধই আসল ব্যাবস্থা।

ভ্যাক্সিন : ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য ভ্যাক্সিন আছে কিন্তু সবার জন্য নয়; একবার যাদের হয়েছে দ্বিতীয়বার ঠেকানোর জন্য ভ্যাক্সিন পাওয়া যায়।

করোনা ভ্যাক্সিন : এক বছরের মধ্যে ব্যবহারোপযোগী ভ্যাক্সিন বাজার জাত করা বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার। তবে এটা প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিরোধের জন্য একক ভাবে ভ্যাক্সিই সবকিছ নয়।

ডেঙ্গু/চিকুনগুনিয়ার জন্য মশা মারতে হবে। করোনার জন্য পড়তে হবে মাস্ক।

সবকটি অসুখের জন্য যার সুরক্ষা তার নিজের হাতে।

কালো ফাঙ্গাস এক নুতন আতংক!!

কালো ফাঙ্গাস বা black fungus কি?

এটা মিউকরমাইকোসিস নামক এক ধরনের ফাঙ্গাল রোগ। mucormycetes নামক এক ধরনের ফাঙ্গাস এ রোগের জীবাণু। আক্রান্ত স্থান একট গ্রে বা কাল হয় দেখে সম্ভবত এটার নাম কাল ফাঙ্গাস হয়েছে।

কাদের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

ডায়বেটিস, ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী এবং যাদের ইমিউনিটি কম তারা এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সম্প্রতি ভারতে কোভিড আক্রান্ত রোগীর মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হচ্ছে। এর কারণ মনে করা হচ্ছে কোভিড রোগীদের steroid বা অন্যান্য immuno suppressant ঔষধ এবং যাদের ডায়াবেটিস বা ক্যান্সার আছে তাদের এটা হচ্ছে। ভারতে হাসপাতালের সিট না পেয়ে বহু রোগী বাসা এমনকি যানবাহনের মধ্যে অক্সিজেন ব্যবহার করেছে যেগুলেতে অপরিষ্কার নেজাল ক্যানুলা এবং humidify না করে অক্সিজেন ব্যবহার হয়েছে।

কিভাবে এ রোগ ছড়ায়?

এ রোগের জীবাণু environment এর প্রায় সব জায়গায় থাকে। ফাঙ্গাল spore মাটির মধ্যে পঁচা পাতা, গরু মহিষের গোবর বা পচা খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে বেশি থাকে । শুস্ক সময়ে এগুলো বাতাসেও ভাসতে পারে । নাকে, মুখে, শ্বাসে বা চামড়ার ক্ষত স্থানের মাধ্যমে এ জীবানুর স্পোর ঢুকে পরলে যারা risk group তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । সুস্থ মানুষের মধ্যে এরোগ ছড়াতে পারে না।

শরীরের কোন কোন অঙ্গে বেশি হবে?

সাধারণত নাক, সাইনাস, চোখ, ব্রেইন, শ্বাস নালী, ফুসফুস, চামড়া, পরিপাকতন্ত্র সহ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এ রোগর Risk কি?

এ রোগে মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ এর বেশি।

কিভাবে নির্ণয় করতে হবে?

১) লক্ষণ দেখে

২) CT scan, MRI depending on organ involvement

৩) নাকের বা আক্রান্ত স্থানের swab বা টিস biopsy করে পরীক্ষা করে Mucormycetes Fungus দেখা।

চিকিৎসা কি?

Amphotericin B নামক antifungal ঔষধ যা খুবেই ব্যয় বহুল। posacanazole or isavucanazole ও দেয়া যেতে পারে। Fluconazole, Etraconazole বা Voriconazole এক্ষেত্রে কোন কাজ করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে সার্জারী করতে হয় জীবন বাঁচাতে। অনেকের দীর্ঘদিন ধরে নাক, সাইনাস পরিষ্কার (Curettage-কিউরেট) করতে হয়।

প্রতিরোধের উপায় কি?

Risk group কে কোভিডের মতই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, পরিস্কার ক্যানুলা দিয়ে humidify করে অক্সিজেন ব্যবহার করা, Diabetes নিয়ন্ত্রনে রাখা, অপ্রোয়জনে steroid ev immuno suppressant ঔষধ ব্যবহার না করা ।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস হরমোনজনিত রোগ। ডায়াবেটিসে রক্তে সুগার (গ্লুকোজ) বাড়ে। ডায়াবেটিস একটি বিপাকীয় বিপত্তি; সুগারের (কার্বোহাইড্রেট) সাথে আমিষ (প্রোটিন), চর্বি (ফ্যাট),পানি, খনিজ দ্রব্য সব কিছুরই বিপাকীয় বিড়াম্বনা ঘটে। শরীরের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই যেটার কার্যকারিতা নষ্ট হয় না। ডায়াবেটিস সর্বসংহা।

রক্তে গ্লুকোজ

স্বাভাবিক: নাস্তার আগে ৬ মি.মোল./লি. (১১০,মি গ্রা)। খাওয়ার পর ৭.৮ মিমোল/লি (১৪০ মি গ্রা)। ডায়াবেটিস হলে : নাস্তার আগে ৭ মিমোল/লি ও (১২৬ মিগ্রা) বেশি হলে। খাওয়ার পরে ১১.১ মি.মোল./লি. ও (২০০ মিগ্রা) বেশি। প্রিডায়াবেটিস: নাস্তার আগে ৬.১ থেকে ৬.৯ মি.মোল./লি.। খাওয়ার পরে: ৭.৯ থেকে ১১.০ মি.মোল./লি.। প্রিডায়াবেটিসদের পরবর্তিতে ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা কমপক্ষে তিনগুন। ২৫ শতাংশ ৫-৩ বছরের মধ্যে ডায়াবেটিস হয়। প্রিডায়াবেটিসদের নিয়মকানুন মানলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব। না মানলে ডায়াবেটিসদের জটিলতা গুলো যেমন হার্ট এটাক, ব্রেইন এটাক, গ্যাংগ্রিন (রক্ত নালীর অসুখ)একই রকম।

কি কারণে হয় ডায়াবেটিস / কিভাবে ঔষধ কাজ করে

ডায়াবেটিসের তিন কারন (শক্তিধর তিন জোট, triumvirate) : অনেকদিন থেকেই ধারনা ছিল ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, বিটা কোষের ব্যর্থতা, ইনসুলিন স্বল্পতার জন্য রক্তে গ্লুকোজ বাড়ে। বহুবিধ জানা-অজানা কারনে এগুলো হয়। এতদিন তাই চিকিৎসা ছিল ইনসুলিন এবং ট্যাবলেট।

ডায়াবেটিসের ট্যাবলেট ১। যেগুলো প্যাক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন নি:সরণ করে (সিক্রেটগগ -যেমন সালফোনিলুরিয়া)। ২। যেগুলো রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধ করে (সেনসিটাইজার-যেমন মেটফরমিন, গ্লিটাজন)।

ডায়াবেটিসের আট কারণ : ২০০৮ থেকে বিধ্বংসী (ominous octet) আট বিপর্যয়কে বলা হচ্ছে ডায়াবেটিসের কারন। ১। মাংস পেশী ও ২। লিভারে ইনসুলিন কার্যকারিতা হারায় (ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স) ৩। বিটা সেল ইনসুলিন দিতে পারেনা (ইনসুলিন স্বল্পতা) ৪। ইনসুলিন স্বল্পতায় ফ্যাট ভাঙে (লাইপলাইসিস) যেটা ইনসুলিন রেজিস্ট্যন্স বাড়ায় ৫। প্যানক্রিয়াসের আলফা কোষ গ্লুকাগন নি:সরন করে ৬। খাদ্যনালির ইনক্রেটিন কমে সুগার বাড়ে। (ডিপিপি-ফোর-ইনহিবিটর, ইনক্রেটিন মাইমেটিকস এগুলো প্রতিরোধ করে)। ৭। কিডনী রক্তে বেশি বেশি গ্লুকোজ ফিরিয়ে এনে সুগার বাড়ায় (এস জি এল টি২-ইনহিবিটর এটা প্রতিরোধ করে। ৮। ব্রেইন ইনসুলিন রেজিস্টান্স বাড়ায় (ক্যানাবিনয়েড এটা কমায়)। কম্বিনেশন ঔষধ- এক সাথে অনেক পয়েন্টে কাজ করে ইনসুলিনের প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছে।

ডায়াবেটিসের ১২ কারণ : আটের সাথে চার হরমোন মিলে ডারটি ডজন (১২) প্যানক্রিয়াসে বিটা সেলের কাজ কমায়। ১। ভিটামিন ডি স্বল্পতা ২। পুরুষ হরমোন টেষ্টস্টেরন স্বল্পতা ৩। RAAS ব্লকার ৪। কেটিকলামিন বিশেষ করে ডোপামিন। ভিটামিন ডি স্বল্পতা এখন চিকিৎসকদের বড় মাথা ব্যথা।

ডায়াবেটিসের ১৩ কারণ : বিশ্বাসঘাতক (১৩) ফেরিটিন ও আয়রন কোষের কার্যক্ষমের সাথে জড়িত- সুগারাধিক্যের সাথে অনেকের ফেরিটন বেশি থাকে।

বংশ ও ডায়াবেটিস : বিশেষ করে টাইপ২- ডায়াবেটিসে বংশের প্রভাব থাকে। তবে বংশে থাকলে অবধারিত হবে তা নয়। বাস্তবে দেখা যাবে বাবা বা মার ছিল অথবা দুজনারই ছিল ছেলেমেয়েদের তিনজনের একজনের হয়েছে আর দুজনের হয় নাই। অনেকে ভাবে মিষ্টি বেশি খেলে ডায়াবেটিস হবে। এটাও হয়না। আসলে ডায়াবেটিস মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল ব্যাপার; বংশের প্রভাব আছে তবে তার সাথে যুক্ত হয় পরিবেশ পরিস্থিতির উপর। বসে থাকা কাজ, ওজনাধিক্য ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস সবই রক্তে গ্লুকোজাধিক্য ঘটায়, আর ডায়াবেটিস হয়।

ডায়াবেটিস কত প্রকার

১। টাইপ- ১ ডায়াবেটিস : কম বয়সে (চল্লিশের আগে) হয়, ইনসুলিন কম থাকার কারনে হয় বলে এদের ইনসুলিন ছাড়া চলে না।

২। টাইপ- ২ ডায়াবেটিস : বেশি বয়সে হয়; ইনসুলিন শরীরে থাকলেও কাজ করেনা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারনে।

৩। আগে ছিলনা কিন্তু প্রেগনেন্সীতে হলে সেটা প্রেগনেন্সী ডায়াবেটিস।

৪। অন্য কোন জানা কারনে হয়ে থাকতে পারে সে ক্ষেত্রে শুধ ডায়াবেটিস নয় কারনের চিকিৎসা ও লাগে। এখন পর্যন্ত যেগুলো বলা হল সেটা সনাতনী টাইপ। চিকিৎসা করতে গিয়ে কালের পরিক্রমায় ডায়াবেটিসের আরও অনেক ধরনের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

টাইপ- ৩। কমবয়সে হলেও ইনসুলিন লাগেনা MODY (maturity onset diabetes of young); এদের সংখ্যা ৫ শতাংশ; বংশ পরম্পরায় হয়।

টাইপ৪-। শুরুতে ট্যাবলেটে কাজ করলে ও শীঘ্র ইনসুলিন দরকার পরে/টাইপ ১- এর মত ইনসুলিন ছাড়া কাজ হয়না। LADA (latent autoimmune diabetes of adult); এদের সংখ্যা কম নয়।

ডায়াবেটিসের ঔষধ : ট্যাবলেট ও ইনজেকশন। ট্যাবলেট দুই ধরনের। (ক) সিক্রেটগগ -প্যানক্রিয়াসের বিটা সেল থেকে ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়ায়। সালফনিলুরিয়া এ ধরনের ঔষধ। গ্লাইবেনক্লামাইড, গ্লিক্লাজাইড, গ্লিমিপ্রাইড এ জাতীয় ঔষধ। খাবার শরীরে থাকুক আর না থাকুক এরা রক্তে গ্লুকোজ কমায়; তাই হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবার সম্ভাবনা বেশি।

(খ) সেনসিটাইজার- ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়ায় না কিন্তু ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। খাবার খেলেই শুধু কাজ করে; খাওয়ার সাথে রক্তে গ্লুকোজ বাড়লেই (ফুড রিলেটেড) কাজ করে সুগার কমায়। হাপগ্লাইসেমিয়া করেনা। ইনজেকশন দুই ধরনে -ইনসুলিন এবং জিএলপি১-এগনিষ্ট। সবচেয়ে পাওয়ার ফুল ঔষধ হল ইনসুলিন। জিএলপি- ১ এগনিষ্ট-গ্লুকোজ কমানো ছাড়াও ওজন ও প্রেশার কমায়। সুদূর প্রসারী ব্যবহারে জি-এলপি ওয়ান এগনিষ্ট হার্ট ও কিডনীর জন্য উপকারী যেটা সুগার কমানোর উপর নির্ভরশীল নয়। আজকের দিনে চিকিৎসকরা শুধু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করেই বা HbA1C স্বাভাবিক রাখাতেই সন্তুষ্ট নয়; ঐ ধরনের ঔষধই এখন লক্ষ্য যেগুলো কিডনী ও হার্টকেও প্রটেক্ট করে। এসজিএলটি২- ইনহিবিটর ও জিএলপি১- এগনিষ্ট এ ধরনেরই ঔষধ।

চিকিৎসা: ১। জীবন ব্যাবস্থা পরিবর্তন ও মেটফরমিন। ২। জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তন ও মেটফরমিন ও অন্যান্য ঔষধ।

সুগার বেশি ধরা পরলেই চিকিৎসা দিতে হবে। ১। জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তন -জীবন যাত্রার পরিবর্তন আনতে হবে; ওজন স্বাভাবিক করতে হবে। সবারই উচ্চতা অনুসারে একটা স্বাভাবিক ওজন থাকে সেটা অর্জন করতে হবে। ১(ক) খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। কোন খাবারই নিষেধ নয় সুগার আর গ্লুকোজ ছাড়া। খাওয়া যাবে তবে হিসেব করে পরিমাণ ঠিক রেখে। আসল কথা হল সুগার কন্ট্রোল থাকলে সবকিছুই জায়েজ। প্রতিদিন একটা মিষ্টি ফল, এক কাপ দুধ, কুসুম সহ একটা ডিম খেতে হবে; সারা দিনে কিছ টক ফল খাওয়া ভাল অভ্যেস। ১(খ) ব্যায়াম অত্যাবশ্যক; জোরে হাঁটা সবচাইতে ভাল। ডায়াবেটিস হয়েছে হাঁটবেন না তা হয় না। প্রতিদিনই হাঁটতে পারলে ভাল। যত হাঁটা তত ভাল। প্রতিদিন কমপক্ষে ৪৫ মিনিট হাঁটতে হবে। এমন হাঁটতে হবে যেন গা ঘামে/হার্ট রেট বাড়ে; ক্ষুধা/পিপাসা লেগে যায়। তিন মাইল বা চার কিলোমিটার পার করতে হবে ৪৫ মিনিটে। প্রতিদিন হলে ভাল; কমপক্ষে ৫ দিন-কমপক্ষে ১৫০ ঘন্টা। পরপর ২ দিন বাদ দেয়া যাবে না। যে কোন ব্যায়ামই উপযোগী; টার্গেট হবে দিনে ৩০০ ক্যালরী খরচ। ব্যায়াম ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা বাড়ায়, গ্লুকোজ ব্যাবহার বাড়ায় আর তাতে রক্তে গ্লুকোজ কমে। প্রতিদিন যা খাচ্ছেন আর যা করছেন সেটার মধ্যেই সচেতন হোন। বিদেশী বা শহরবাসী হবার দরকার নাই। নিজের জন্য উপযোগী জীবন ব্যাবস্থা আর অভিষ্ট ক্যালরী ক্ষয় করাই লক্ষ্য। জীবন ব্যাবস্থা পরিবর্তনের সংগে সংগে মেটফরমিন দিয়ে শুরু করতে হবে চিকিৎসা; এমন নয় যে আগে হাটাহাটি করে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে দেখি তারপর ঔষধ শুরু করা যাবে। এ১সি বেশি থাকলে, মেটফরমিনে কাজ না হলে কম্বিনেশন (যৌগ) ব্যাবহার করতে হবে; মেটফরমিনের সাথে ইনসুলিন বা জিএল-পি ওয়ান ও ব্যাবহার শুরু করা যেতে পারে। মেটফরমিন সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে নিরাপদ ট্যাবলেট। সত্তর দশকের প্রথমে বাজারে আসলে ও এখনও এটা সবচেয়ে উপযোগী ঔষধ। মেটফরমিন ওজন স্বাভাবিক রাখে। অন্য যে কোন ঔষধের সাথে ব্যবহার যোগ্য; পার্শপ্রতিক্রিয়া খুব কম দাম ও কম। একবার গ্লুকোজ কমাতে থাকলে অন্য ঔষধে চিকিৎসা পরিবর্তন করে মেটফরমিন

বাদ দিয়ে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। মেটফরমিন কিডনীর ক্ষতি করেনা তবে কিডনীর মারাত্মক দূর্বলতা থাকলে এটা ব্যবহার করা ঠিক নয়। ওজনাধিক্য থাকলে ব্যবহার করলে মেটফরমিন শুধ সুগারই কমায় না হার্ট রক্তনালী অসুখও ঠেকায়, উপকার করে। দীর্ঘদিন মেটফরমিন ব্যবহারে রক্তে ভিটামিন বি১২ কমে যায়। প্রান্তিক স্নায়ুর সমস্যা হলে তাই সবার রক্তের বি১২ পরীক্ষা করা দরকার। খুব বেশি সুগার থাকলে বা গ্লুকোজাধিক্যের উপসর্গ (ক্ষুধা, বেশি বেশি খাওয়া, দূর্বলতা, দ্রুত ওজন কমা) থাকলে প্রথম থেকেই ইনসুলিন শুরু করতে হবে। রক্তে মাত্রাতিরিক্ত গ্লুকোজ মানেই পয়জন। গ্লুকোজ যত বেশি, যত দিন বেশি, তত বেশি ক্ষতি (গ্লুকটক্সিসিটী); লিভার, কিডনী ও প্যানক্রিয়াসের তত বিপর্যয়। দেখি দেখছি করে দেরী করলে ক্ষতি হবে। সালফোনিলুরিয়া সবচেয়ে শক্তিশালী ট্যাবলেট, ওজন বাড়ায় কমপক্ষে ২ কেজি। অনেক দিন ব্যবহৃত হলে সালফোনিলুরিয়া কাজ করে না (সেকেন্ডারি ফেইলুর)। ৬-৫ মাস বিরতি দিয়ে আবার শুরু করলে কাজ হয়। যারা দুবেলা ইনসুলিন নেয় তাদের সালফনিলুরিয়া দিয়ে চিকিৎসা করা উচিত নয়। সালফনিলুরিয়া অপেক্ষাকৃত কমদামি কার্যকরী ঔষধ। সব ট্যাবলেটেরই একটা সর্বাধিক ডোজ আছে যার বেশি দিলে অধিকতর কাজ মিলেনা।

চিকিৎসার লক্ষমাত্রা : নাস্তার আগে (before breakfast) ৬ মি.মোল./লি. (১১০ মিগ্রা), নাস্তার দুঘন্টা পর (2 hours after breakfast) ৮ মি.মোল./লি. (১৪৪ মিগ্রা), যে কোন সময় (random) ৭ মিমোল/লি (১২৬ মিগ্রা); হিমগবিন এ১সি (HbA1C) ৭ (সাত) শতাংশের কম। পয়ষট্টি উর্ধ রোগী, একবার দারুণ (severe) হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে, অন্যকোন বড় রোগ আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে এ মাত্রার শিথিলতা থাকতে পারে।

ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে না রাখলে কি হবে : বিশ্বে শতকরা ১০ শতাংশ (বাংলাদেশে ১২ শতাংশ) অর্থাৎ ৮ জনের একজন লোকের আছে ডায়াবেটিস, প্রি-ডায়াবেটিস ধরলে এ সংখ্যা অনেক (huge)। ডায়াবেটিস নির্মূল করা যাবেনা তাই কন্ট্রোল রাখাই লক্ষ্য; নিয়ন্ত্রণে রাখলে স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব। নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে হার্ট এটাক, ব্রেইন এটাক, গ্যাংগ্রিন, কিডনী অকেজো বো চোখ অকেজো হয়ে যাবে। গ্লুকোজ কন্ট্রোলের সাথে উচ্চ রক্ত চাপ, কোলেষ্টরেলাধিক্য কমাতে হবে, ধূমপান পরিহার করতে হবে। রক্ত চাপ ৮০/১৩০ তে রাখতে হবে। চল্লিশোর্ধ সব ডায়াবেটিস রোগীরই স্টাটিন (কোলেষ্টরেলের ঔষধ) খেতে হবে।

রক্ত পরীক্ষার নিয়ম : যারা ট্যাবলেটে আছেন তাদের জন্য ধরা বাধা নিয়ম নেই। সুযোগ সুবিধা অনুসারে পরীক্ষা করতে হবে। হাইপোগ্লাইসেমিয়ার উপসর্গ হলে সাথে সাথে পরীক্ষা করতে হবে ও ব্যাবস্থা নিতে হবে। সালফোনিলুরিয়া হাইপোগ্লাইসেমিয়া এবং মারাত্মক হাপোগ্লাইসেমিয়া করে, অন্য ট্যাবলেটগুলো করেনা। তবে কম্বিনেশনে খেলে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সম্ভাবনা বেশি, মারাত্মক নাও হতে পারে। ইনসুলিন হাইপোগ্লাইসেমিয়া করে তাই বারবার পরীক্ষা করতে হয়। কন্ট্রোল হয়ে গেলে ৪ দিন পর পর করলেও হয়; ডোজ ও তখন নির্ধারন করা যায়। তবে হাইপোগহলাইসেমিয়া

হবার উপসর্গ হলে তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করতে হবে। ইনসুলিনের রোগী দিনে তিনবার- নাস্তার আগে, শোবার আগে দিনে অন্য যে কোন সময় একবার করার নিয়ম করে পরীক্ষা করবে। বাস্তবতা হল রোগীর নিজের হিসেবই বড় হিসেব। রোগী যেভাবে সুবিধা করতে পারবে। গ্লুকোমিটার দিয়ে আঙ্গুলের মাথা থেকে নিয়ে যতবার সম্ভব পরীক্ষা করে দেখলে চলবে। তবে মাসে একবার ডায়াবেটিস সেন্টারে যেতে পারলে ভাল। সেন্টারে গিয়ে শিরা থেকে নিয়ে রক্ত পরীক্ষা করা উচিৎ।

ডায়াবেটিসের তাৎক্ষণিক (acute) জটিলতা : হাইপোগ্লাইসেমিয়া (হাইপো): রক্তের গ্লুকোজ স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে সেটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া। ডায়াবেটিস রোগী যদি ঔষধ নেয় তবেই হাইপো হয়, নচেৎ নয়। মনে রাখতে হবে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা পায় না এমন কারো হাইপো হয় না, হতে পারে না। হাইপোগ্লাইসেমিয়ার তিনটি লেভেল। লেভেল ১ রক্তে গ্লুকোজ ৩.৯ মিমোল বা ৭০মি গ্রাম। লেভেল। ৭০-৫৪ মি.গ্রাম (৩.৯-৩মিমোল) লেভেল ৩। গ্লুকোজ ৫৪ এর কম।

মৃদু হাইপোগ্লাইসেমিয়া : রোগী উপসর্গ হলে বুঝতে পারলে এবং অন্যের সহযোগিতা ছাড়া চিকিৎসা করতে পারলে সেটা মৃদু হাইপোগ্লাইসেমিয়া। যখন রোগী অন্যের সহযোগিতা ছাড়া চিকিৎসা করতে পারবেনা, অজ্ঞান হয়ে যাবে সেটা (severe) মারাত্মক হাইপোগাইসেমিয়া।

হাইপোর উপসর্গ : খুব ক্ষুধা লাগবে/দুনিয়া খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করবে, গা কাঁপবে, গা ঘামবে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসবে,মৃত্য আসন্ন মনে হবে। মিষ্টি কিছু খেতে হবে। হাইপোর চিকিৎসা : ডাক্তার খুঁজতে গেলে /আত্মীয় স্বজন খুঁজতে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি তাই কাজ একটাই মিষ্টি খেতে হবে। খেতে পারলে মুখে মিষ্টি দিতে হবে, ;ফাইন সুগার, চিনি /গ্লুকোজ বা চিনি যক্ত খাবার দিতে হবে। খেতে না পারলে শিরায় গ্লুকোজ ইনজেকশন দিতে হবে। ১৫ মিনিট পর পর পরীক্ষা করতে হবে; স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত গ্লুকোজ দিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। স্বাভাবিক হয়ে যাবার পর ভাত রুটি জাতীয় জটিল শর্করা দিতে হবে। সালফোনিলুরিয়া ও লং এক্টিং ইনসুলিনের ক্ষেত্রে ৪৮ ঘন্টা তদারকীতে রাখতে হবে। পুনর্বার হবার সম্ভাবনা থাকলে গ্লুকোজ স্যালাইন ইনফুশন দিয়ে তদারকিতে রাখতে হবে। সতর্কতা হিসেবে ঔষধ পরিবর্তন করতে হবে, ডোজ কমাতে হবে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া করেনা এমন ট্যাবলেট, লং এক্টিং এর জায়গায় শর্ট এক্টিং ইনসুলিন ও ২০ শতাংশ কম ইনসুলিন দিতে হবে। ঔষধ বন্ধ করা যাবেনা। দুধ বা এ জাতীয় খাবার দেয়া যাবেনা কারণ এগুলোতে প্রোটিন ও ফ্যাট থাকে বিধায় ইনসুলিন বাড়ে/গ্লুকোজ ব্যাবহার কমে, ফলে হিতে বিপরীত হবে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া বাড়বে, দীর্ঘতর হবে।

বিপজ্জনক গ্লুকোজাধিক্য : ইনসুলিন বা ট্যাবলেট মিস করলে, নিয়মনীতির ব্যত্যয় হলে ডায়াবেটিস অনেক বেড়ে যায়। টাইপ১- ডায়াবেটিস ও অপেক্ষাকৃত কমবয়সী টাইপ ২- ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে এটা -কিটোএসিডসিস (DKA) হয়। বেশি বয়স্কদের (৪০

৫০ বা বেশি বয়সের) এটা হাইপার-অসমোলার অবস্থা (HHS)। বেশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে সুগার ৪০ থেকে ৫০ মি. মোল. বা তার বেশি হতে পারে। দুটাই ইমার্জেন্সী, স্যালাইন ইনফুশন দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়; হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

ডায়াবেটিস ও হার্ট/রক্তনালী : ফ্রেমিংহামে প্রমাণিত ডায়াবেটিস রোগীদের লুক্কায়িত (সাবক্লিনিকাল) হার্ট ও রক্তনালীর অসূখ থাকে বিধায় ক্লিনিকাল হার্ট এটাকের সম্ভাবনা প্রায় চারগুন। মহিলা হরমোন ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্ট্রেন থাকায় মহিলারা হার্ট ডিজিজ থেকে প্রটেকশন পায় কিন্তু ডায়াবেটিস হলে এই নিরাপত্তা, থাকেনা, উল্টো হার্ট এটাকের প্রবণতা বাড়ে।

ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টরল : চিকিৎসা অন্য রোগীর মতই; কিন্তু ডায়াবেটিস থাকলে এআরবি বা এসিইনহিবিটর (RAAS Blocker) যোগ করতে হবে। প্রোটিনুরিয়া থাকলে এগুলো হবে অত্যাবশ্যকীয় সংযোজন। চল্লিশোর্ধ হলে সব ডায়াবেটিস রোগীরই স্টাটিন খাওয়া উচিৎ।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস (World Diabetes Day) : শুরু করেছিলেন আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস সংস্থা (IDF) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯১ সাল থেকে ডায়াবেটিসের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস জাতিসংঘের অফিসিয়াল দিন হিসেবে স্বীকৃত হয় ২২৫/৬১ রেজুলেশনের মাধ্যমে, ২০০৬ সালে। প্রত্যেক বছরই সচেতনার একটা প্রতিপাদ্য বিষয় (theme) নিয়ে দিবসটি পালিত হয়ে থাকে; ২০২১ সালের বিষয় হলো ডায়াবেটিস কেয়ারে প্রবেশাধিকার-এখন নয় তো কখন! (Access to Diabetes Care if not Now When?)। ডায়াবেটিস ধরা পড়লে তখন থেকেই চিকিৎসা পেতে হবে। বিশ্বডায়াবেটিস দিবস বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডায়াবেটিস সচেতনতার প্রোগ্রাম। বিশ্বের ১৬০ দেশের এক বিলিয়ন লোক এটা পালন করছে। ১৪ই নভেম্বর ইনসুলিনের কো আবিষ্কারক স্যার ফ্রেডরিক বেন্টিং এর জন্মদিবস।

ডায়াবেটিসের দীর্ঘসূত্রী জটিলতা :

মাইক্রোভাসকুলার জটিলতা: কিডনী রোগ, চোখের রোগ, নার্ভের সমস্যা ও ডায়াবেটিক ফুট।

ম্যাক্রোভাসকুলার : হার্ট ডিজিজ,স্ট্রোক, বড় রক্ত নালীর অসুখ (গ্যাংগ্রিন)।

সবই দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিস বিশেষ করে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের সমস্যা। ডায়াবেটিস রোগটির লক্ষণ, চিকিৎসা,জটিলতা সবই স্বতন্ত্র (ইনডিভিজুয়ালাইজড, সবার সব কিছু হয়না, সমান তালে হয়না)।

মাইক্রোভাসকুলার জটিলতা

ডায়াবেটিস রোগীর কিডনীর অসুখ :
প্রস্রাবে প্রোটিন (প্রোটিনুরিয়া) বা কিডনীর (অকার্যকারিতা) কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া বা দুটা একসাথে থাকলে সেটা ডায়াবেটিক কিডনী রোগ। অনিয়ন্ত্রিত সুগার, উচ্চ রক্তচাপ দুটাই এর জন্য দায়ী। সব ডায়াবেটিক রোগীর কিডনী রোগ হয় না। তাই বংশের (জিন) একটা প্রভাব আছে।

কখন বলবো অকার্যকারিতা (কিডনী রোগ) : প্রাথমিক উপসর্গ হল ক্ষুধামন্দা, বমিভাব, চুলকানি। প্রাথমিক নিদর্শন (চিহ্ন) হলো উচ্চ রক্তচাপ, পাফোলা; পা ফোলা মানেই কিডনী রোগ নয়, কারন কিডনী রোগে এটা অনেকদিন পরে হয়। অকার্যকারিতা মানে কিডনী নষ্ট (উধসধমব) হয়ে যাওয়া নয়। ডায়াবেটিসে অকার্যকারিতা অর্থ দুটো কিডনী দুর্বল হওয়া।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা : ই-জিএফআর ৬০ এর কম আর প্রস্রাবে প্রোটিন বেশি হলে (৩ মাসের ব্যবধানে পরীক্ষা করে নিশ্চিত করতে হবে) সেটা ডায়াবেটিক কিডনী রোগ।

রক্ষা পাবার উপায় : ডায়াবেটিস কন্ট্রোল, প্রেশার =/<৮০/১৩০, কোলেস্টেরল কন্ট্রোল, ধূমপান পরিহার। শতকরা ত্রিশ জন ডায়াবেটিক রোগীর মারাত্মক কিডনী রোগ হয়;এদের %১ ডায়ালাইসিস লাগে। কিডনীর রোগীর মৃত্যুর কারন হার্টের অসুখ কিডনী রোগ নয়।

ডায়াবেটিসে চোখের সমস্যা :
রেটিনপ্যাথী : এটা বিশ্বব্যাপী অন্ধত্বের অন্যতম কারন। সমস্যা হল এটা উপসর্গবিহীন, শেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত এটার কোন উপসর্গ বোঝা যায় না।

চোখের অন্য সমস্যা- যেমন ছানি পড়া, গ্লুকোমার ঝুঁকি ডায়াবেটিস রোগীদের বেশি।

রক্তে সুগার বেশি হলে লেন্সে সুগার ঢুকে। দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে। চশমা বদলানোর জন্য ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না করে এ অবস্থায় চশমা বদলানো ঠিক নয়।

ডায়াবেটিস, রক্তচাপ (ব্লাড প্রেশার) সুনিয়ন্ত্রিত রাখতে পারলে আর কোলেস্টরলের চিকিৎসা করলে রেটিনপ্যাথি বাড়বেনা। লেসার দিয়ে চিকিৎসা করলে, চোখের মধ্যে এ্যান্টি গ্রোথ ফ্যাক্টর ইনজেকশন দিতে পারলে দৃষ্টি শক্তি কমা ঠেকানো যেতে পারে- তবে পদক্ষেপগুলো সময়মত হতে হবে। লেসারের জন্য সুগার কন্ট্রোল লাগে না তবে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না করে ইনজেকশন দেয়া যায় না।

ডায়াবেটিস রোগীদের নার্ভের অসুখ
বিচিত্র ধরনের সব সমস্যা হয় নার্ভে। প্রকৃত রোগ ডায়াবেটিস শুরুর ১০ বছরের পরে হয়।

প্রান্তিক নার্ভে (হাত-পায়ের আঙ্গুল), সংবেদনশীল নার্ভে (সেন্সরী নিউরপ্যাথি) এবং স্বয়ংক্রিয় নার্ভে (অটনমিক নিউরপ্যাথি) বেশি হয় সমস্যা গুলো।

সংবেদনশীল নার্ভ : নার্ভে বোধ হারায় বলে শরীর প্রয়োজন অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রক্ষা করতে পারেনা; ফলশ্রুতিতে ঘা /ক্ষত, ইনফেকশন হয় (বিশেষ করে ডায়াবেটিক ফুট)। শরীরের বোধ কমে, স্পর্শানুভূতি বাড়ে কারো কারো ক্ষেত্রে। পা উঁচু করে ফেলে বা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফেলে এবং হাঁটে; পায়ের অবস্থার জন্য হাঁটতে ভয় পায়, পড়ে যায়। অযৌক্তিক উপসর্গ, ব্যাথা আরাম হারাম করা জ্বলা, খোঁচানো, অস্বস্তিকর সূচ ফোটানো অনুভূতি সবই হয়। এমন অসহ্য হয় যে রাতে বালতির পানিতে পা চুবিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করে কেউ কেউ।

স্বয়ংক্রিয় নার্ভ : ডায়াবেটিস কমে গেলে (হাইপগ্লাইসেমিয়া) হলে বুঝতে পারেনা ফলে অজ্ঞান হয়ে যায়। দাঁড়ালে রক্তচাপ কমে যায় (অর্থস্টাটিক হাইপটেনশন) মাথা ঘুরে, পরে যায়।

নার্ভের দূর্বলতার কারণে ভীষণ কনস্টিপেশন হয় পায়খানা কষা হবার একটা বড় কারন এটা,পাকস্থলীর মুখ ঢিলা হয়ে যায় খাদ্যদ্রব্য উপরের দিকে উঠে আসে (গ্যাস্ট্রপ্যারেসিস)। পাতলা পায়খানা বিশেষ করে রাতে ঢিলা বা লুস পায়খানা (নকটারনাল ডায়রিয়া) ডায়াবেটিসের বিশেষত্ব। কেউ কেউ পায়খানা ধরে রাখতে পারেনা(ইনকন্টিনেন্স)। যৌন প্রক্রিয়ায় বিপত্তি ঘটে, যদি ও এটার প্রকাশ/প্রচার কম বিশেষ করে মেয়েদের, অনেক ক্ষেত্রেই আবেদনটা সময়োপযোগী নয়, উদ্বিগ্নতার জন্য। প্রস্রাব ধরে রাতে পারেনা, মূত্রথলির দূর্বলতার কারনে ইনফেকশন হলে সারতে চায়না।

পরোল্লিখিত তিনটার দুটা জিনিষ থাকলে ডায়াবেটিসের নার্ভের সমস্যা আছে বলে ধরে নেয়া হয়-

১। সংবেদনশীল নার্ভের সমস্যা (অনুভূতির বিপর্যয়)
২। প্রান্তিকভাবে অনুভূতির অভাব
৩। এ্যাংকেল রিফ্লেকস নাই অথবা কমে গেছে।

ডায়াবেটিসে নার্ভের সমস্যা উপসর্গবিহীন হতে পারে। সবার সমস্যা, ক্ষত এক রকম নয়। এখানে সমস্যাটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, জিন প্রভাবিত। তবে ডায়াবেটিসের স্থিতিকাল, রোগীর বয়সের প্রভাব থাকে, দিন যাবে সমস্যা বাড়বে।

ডায়াবেটিসে নার্ভের (নিউরোপ্যাথি) অসুখের চিকিৎসা

ডায়াবেটিস ভালো কন্ট্রোলে রাখলে প্রতিরোধ প্রতিকার দুটাতেই উপকার হবে। নার্ভের ক্ষতি হলে সেটার চিকিৎসা নাই। তবে অনেক কিছুই আছে যা দিয়ে ব্যাথা কমানো যায় উপসর্গের সহায়ক উপশম হয়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঠেকানো সম্ভব হয়।

নার্ভের সমস্যা মনে হলে যেটা করতে হবে সেটা হল ডায়াবেটিস ছাড়া অন্য কোন কারনে হল কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। অনেকদিন মেটফরমিন খেলে ভিটামিন বি ১২ কমে যায়। ভিটামিন বি ১২ স্বল্পতা প্রান্তিক সংবেদনশীল (পেরিফেরাল নিউরপ্যাথি)

নার্ভের দূর্বলতার একটি বিশেষ কারণ; সেক্ষেত্রে সম্পূরক ভিটামিন বি১২ দিলে উপকার হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে হাইপোথাইরয়েডিজম, কিডনীর অকার্যকারিতা (রেনাল ফেইলর) আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে।

ডায়াবেটিসে নার্ভের সমস্যা

ক্রাম্প : পা টেনে ধরা, হঠাৎ করে আঙ্গুল বেঁকে যায় ভীষন ব্যথা হয়। অন্য কারণেও হতে পারে তবে ডায়াবিটকদের বেশি হয়।

রেস্টলেস লেগ : পা চাবায়, পা কামড়ায় ঘুমের মধ্যে পা নড়াচড়া করে। পা টিপে দিলে ভাল লাগে।

চিকিৎসা : ক্রাম্প হলে যে দিকে বেঁকে গেছে তার উল্টা দিকে টেনে দিয়ে ম্যাসাজ করতে হবে।যত চটজলদি করা যাবে তত ব্যাথা কম হবে। প্রশান্তি তত শীঘ্র।এন্টি কলভলসান্ট এন্টি-ডিপ্রেসান্ট দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

রেস্টলেস লেগ : পা নাড়া চাড়া করলে উপশম হয়। পারকিনসনের ঔষধ বিশেষ করে রোপিনিরল ভাল কাজ করে। লিভডোপা, এন্টিকনভালসান্ট প্রিগাবানিল ইত্যাদি কিন্তু উপকারী।

ম্যাক্রোভাসকুলার (মোটা রক্তনালীর) সমস্যা : হার্ট এটাক (করোনারী হার্ট ডিজিস), স্ট্রোক (ব্রেইন এটাক), প্রান্তিক রক্তনালীর অসুখ (ডায়াবেটিক ফুট, গাংগ্রিন) ডায়াবেটিক রোগীর জীবন বিপর্যস্ত করার বড় কারন। সমস্যাগুলো তিন ধরনের হলেও কারণ একই রক্ত নালীর ব্লক; হার্টের রক্ত নালীর ব্লক হলে হার্ট এটাক, ব্রেনের বেলায় স্ট্রোক আর প্রান্তিক (হাত), পা এটাক -ইশকেমিক লিম্ব বা গাংগ্রিন।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রন : রক্তচাপ ৮০/১৩০ ও তার নীচে রাখতে হবে। ৭০/১২০ এর নীচে কাম্য নয়। সব সময় ঔষধের পাশাপাশি জীবন যাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। ওজন কমাতে হবে। ব্যায়াম করতে হবে। পাতে লবন বাদ দিতে হবে। ধূমপান পরিহার করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিহারে ব্রতি হতে হবে। মাংস খেতে হবে চর্বি ছাড়িয়ে, তেল কম খেতে পারলে ভাল সেজন্য ভাজি পোড়া কম। দিনে এক কাপ দুধ, কুসুম সহ ডিম, একটা মিষ্টি ফল ভাল অভ্যাস। যে তেল জমে যায়(ঘি, মাখন) সেটা এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল ; মেন্যুতে পোলাও, বিরিয়ানী এগুলোর বিকল্প রাখার চেষ্টা করতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ নিশ্চিত হলেই ঔষধ শুরু করতে হবে। নীচের প্রেশার ১০০ থাকলে অবশ্যই দুটা ঔষধ একসাথে দিয়ে শুরু করতে হবে। যে কোন ঔষধ দিয়েই শুরু করা যেতে পারে । যত ঔষধ লাগে দিতে হবে কারন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণই আসল কথা। কে করল, কিভাবে হল সেটা বিষয় নয়। ডায়াবেটিস রোগীর বেলায় রাস (জঅঅঝ) ব্লকার (এসিই ইনহিবিটর ও এ আর বি) পছন্দের কারন প্রেশার কমানো ছাড়াও এরা প্রোটিনুরিয়া কমায়। গ্লোমারিউলার প্রেশার কমিয়ে ফিলট্রেশন কমায় আর হাইপারপারফিউশন কমায় বিধায় এগুলো পছন্দনীয়।

রক্ত নালীর ব্লক : ডায়াবেটিসের ঔষধ গ্লিফলোজেন অথবা গ্লুটাইডস রক্তচাপ কমায়। ব্যবহারের প্রথম দিকে অনেকের দাঁড়ালে প্রেশার কমে বলে মাথা ঘুরে (অর্থস্টাটিক হাপটেনশন)। দীর্ঘ সময় ধরে খেলে কিডনী, রক্তনালীর অসুখ স্ট্রোক (ব্রেইন এটাক),হার্ট এটাক, প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

স্টাটিন ও রক্ত নালীর ব্লক : রোগীর বয়স, রোগের বয়স যত বাড়বে রক্ত নালীর ব্লকের ঝুঁকি তত বাড়বে। বংশে স্ট্রোকের বা হার্ট এটাকের ঘটনা থাকলে, ওজনাধিক্য থাকলে, ধূমপায়ী হলে, দীর্ঘসূত্রী কিডনীর অসুখ থাকলে রক্ত নালীর ব্লকের ঝুঁকি বেশি।উচ্চ রক্ত চাপ, রক্তে কোলেস্টরেলাধিক্য,পূর্বে ঘটে যাওয়া স্ট্রোক ও স্ট্রোকের /রক্ত নালী ব্লকের ঝুঁকি বাড়ায়। স্ট্রোকের ও রক্তনালী ব্লকের ঝুঁকিতে থাকা এই সমস্ত রোগী নিয়মিত স্টাটিন খেলে উপকার হবে।

রক্ত নালীর ব্লক ও রক্ত পাতলা করার ঔষধ (এন্টিপ্ল্যাটিলেট ড্রাগ) : যাদের একবার রক্তনালী ব্লকের (ম্যাক্রোভাসকুলার) অসুখ হয়েছে তাদেরকে পরবর্তী এটাক প্রতিরোধ করার জন্যই কেবল এ ঔষধ দেয়া যাবে; প্রাইমারী প্রিভেনশনের জন্য অর্থাৎ আগে যাদের হয় নাই ডায়াবেটিস থাকলেও তাদেরকে এগুলো দেবার বিধান নাই। প্রতিদিন ভরাপেটে ১০০-৭৫ মিগ্রাম এসপিরিন দিতে হবে যদি বড় ধরনের রক্ত ক্ষরণের ইতিহাস বা ঝুঁকি না থাকে।

ডায়াবেটিক ফুট

ফুটের ঘা এবং ফুটের ইনফেকশন দুটা মিলে ডায়াবেটিসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল, সবচেয়ে মারাত্মক আর সবচেয়ে দুর্ভোগের জটিলতা। ডায়াবেটিসের নার্ভ ও রক্তনালীর জটিলতাও এ দুর্দশার জন্য দায়ী। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ও ধূমপান এ সমস্যাকে আরও বাড়ায়। নার্ভ প্রটেকশন/পরিবর্তনের কারনে পা ও আঙুলের আকার/আকৃতি প্রবর্তন হয় জুতা ফিট করেনা খোঁচা বা আঘাত লাগলে বোঝা যায়না। ঘষায় ঘষায় কড়া পড়ে সব মিলে ঘা ইনফেকশন হয়। রক্ত সাপ্লাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়,ফলশ্রুতিতে ইনফেকশন সারতে চায়না ঘা শুকায়না। ৫০ শতাংশ ডায়াবেটিক ফুটের পায়ের রক্তনালীর ব্লক থাকে। পা একদম শুকিয়ে কালো হয়ে যায়।

ব্যথা বোধ বেশি/কম হওয়া, বিবর্তিত বোধ, জ্বলা, সূচ ফোঁটা, ঠাণ্ডা-গরম ঠাহর করতে না পারা সবই হয়; পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরা, ক্রাম্প খুব হয়। পায়ের আঙুলের আকার আকৃতি বদলানো, খসখসে চামড়া, ফাটা চামড়া, চামড়া কালো হওয়া, মোটা চামড়া সবই হয়।

নখ মোটা, হলুদাভ নখ, আঙুলের মাঝে, নখের চারদিকে ফাঙ্গাল ইনফেকশন (প্যারোনাইকিয়া-Paronychia) খুব বেশি।

পায়ে ফোস্কা পড়া, জ্বলে যাওয়া, ভীষণ অস্বস্তিকর অনুভূতি ফলশ্রুতি ঘুম কেড়ে নেয়া সবই ডায়াবেটিক ফুটের লক্ষণ।

রক্তনালী পরীক্ষা করতে হবে পা উন্মুক্ত করে। নার্ভ পরীক্ষা করতে হবে মনোফিলামেন্টের প্রেশার, টাচ সেন্স ও ভাইব্রেশন সেন্স পরীক্ষা করে। রোগী ডাক্তারকে বলবে, ডাক্তার পরীক্ষা করে ঝুঁকি উপলব্ধি করবে দরকারে উন্নত সেন্টারে রেফার করবে। নার্ভের সমস্যা হতে মোটামুটি দশ বছর লাগে। তবে বয়স্ক রোগীর ডায়াবেটিস ধরাও পড়ে অনেক পরে।

চিকিৎসা : নার্ভের বোধ না থাকলে/কমে গেলে বোধ আনা যায়না। বোধ বেশি হলে বিরক্তির হলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালে চিকিৎসা করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের এন্টিকনভালস্যান্ট, এন্টিডিপ্রেশান্ট, বি ভিটামিন ব্যবহৃত হয় এ কাজে। নার্ভের সমস্যা যাদের থাকে তাদের চোখ ও কিডনীর সমস্যা থাকে বিধায় রুটিন চোখ ও কিডনী চেক করা দরকার। পায়ের রক্তনালীর ব্লক থাকলে শরীরের অন্য রক্তনালীর ও ব্লক থাকার কথা তাই বিশেষ করে হার্টের চেক আপ দরকার। নার্ভ এবং রক্তনালীর অসুখ মানে ঘা, গ্যাংগ্রিন, ইনফেকশন, এ্যাম্পুটেশনের ঝুঁকি বেশি। এটা মনে রেখেই ডায়াবেটিসের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। এখানে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই আসল। তাই খেয়াল করতে হবে কাটা, ফোলা, ঘা, ফোস্কা আছে কিনা দেখা। দরকারে পায়ের তাল দেখার জন্য ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস ব্যবহার করতে হবে। গোসলের সময়, ধোয়ার সময়, পরিস্কার করার সময় গরম পানি পরিহার করতে হবে।

আঙুলের মাঝে না দিয়ে পায়ের অন্য জায়গায় ময়েশ্চারাইজার দেয়া যাবে। নখ সোজা কাটতে হবে, কোনা মেরে নয়। কর্ন, কেলাসে চাকু/সূচ লাগানো যাবেনা, মেডিকেটেড পেস্ট লাগান যাবেনা। জুতা পরার আগে ঝাঁকুনি দেবার সাথে জুতার ভিতরে দেখে আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। সাইজ মিলিয়ে জুতা মোজা পড়ার অভ্যাস করতে হবে; টাইট নয় ঢিলাও নয় এমনটাই গ্রহনযোগ্য। খালি পায়ে নয় এমনকি নিজের শোবার/বসার ঘরে ও নয়।

ডায়াবেটিস কন্ট্রোল রাখার বিকল্প নাই, ধূমপান হারাম

ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভার ডিজিজ : B আর C ভাইরাসের চিকিৎসা সহজলভ্য হবার পর ফ্যাটি লিভার ডিজিজ লিভারের অসুখের অন্যতম কারন।

স্টিয়াটসিস (NAFLD)

লিভারে শুধ মাত্র চর্বি জমা কে বলে NAFLD. চর্বি যদি রিএ্যাকশন করে তবে সেটা ন্যাশ (NASH). বয়স্ক লোকের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ NAFLD এবং ২ থেকে ৫ শতাংশ NASH. যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের মধ্যে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ NAFLD. NAFLD (advance) করলে NASH তারপর ফাইব্রসিস। এখন লিভার ফ্যাট সিরসিস লিভারের অন্যতম কারন। লিভার ক্যান্সারের ও এটা কারন। ডায়াবেটিস থাকলে অসুখের প্রখরতা বাড়ে দিনে দিনে। কালে কালে খারাপ থেকে খারাপের পর্যায়ে যায়। এই অসুখটা উপসর্গবিহীন।

রুটিন পরীক্ষা পেটের আলট্রা সনোগ্রাফী আর এসজিপিটি করলে ফ্যাটি লিভার ধরা পরে। ওজন কমানো আর ব্যায়ামই অদ্যাবধি লিভার ফ্যাটের চিকিৎসা। লিভার শরীরে ফ্যাটের কারখানা; ফ্যাট উৎপাদন করে, ফ্যাট সাপ্লাই করে এবং ফ্যাট জমা রাখে। ডায়াবেটিস রোগীর ইনসুলিন কাজ করেনা সেজন্য ফ্যাটি লিভার- বেশি বেশি ফ্যাট লিভারে জমে; ওজন কমালে, ব্যায়াম করলে ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ে লিভারের চর্বি কমায়।

মনে রাখা ভালো ফ্যাটি লিভার লিভারের অসুখ নয় চর্বি বা ফ্যাটের অসুখও নয়। এটা ডায়াবেটিসের অসুখ। রিসার্চ পর্যায়ে থাকা অবিটকলিক এসিড এখনও ব্যাবহার হয় এটাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছে FDA। বাজারে পাওয়া যাচ্ছে দ্বৈত PPAR agonists ভাল কাজ করে। এরা রক্ত চর্বি কমায় (বিশেষ করে ট্রাইগ্লিসারাইড)। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও সুগার কমায় এবং ন্যাশ/ফ্যাটি লিভার কমায়। নুতন ঔষধ রেসমিটিরম (রেজডিফ্রা) FDA 2024 মার্চে অনুমোদন দিয়েছে ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসার জন্য।

ডায়াবেটিস একক অসুখ নয়:

ডায়াবেটিস থাকলে উচ্চরক্তচাপ থাকতে পারে। কোলেস্টেরলাধিক্য থাকে।ওজন বেশি দের (স্থুলকায়দের) টাইপ- ২ ডায়াবেটিস বেশি। মোটা যুবতীদের পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রম (PCOS) থাকে। স্থুলকায়দের ঘুমের ব্যাঘাত (OSA) ও তার জটিলতা থাকে। যৌনকর্ম হীনতা(ED),হাড়ের ভঙ্গুরতা(osteoporosis) তুলনামূলক ভাবে ডায়াবেটস রোগীর বেশি হয়।

এক-তৃতীয়াংশের হার্টের অসুখ। ৩০ % কিডনী দূর্বল (CKD) হয়। হার্ট এটাক না হয়ে ও হার্ট ফেইলর (কার্ডিও মায়োপ্যাথি) হয়।

ডায়াবেটিস চিকিৎসার লক্ষ্য : ডায়াবেটিস ভাল কন্ট্রোল করলে এগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিউর করা না গেলেও বিজ্ঞান বলে ভাল কন্ট্রোল করলে সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল বাড়ানো সম্ভব ১০-৩ বছর।

ডায়াবেটস থেকে অব্যাহতি (Remission) : ব্লাড গ্লুকোজ স্বভাবকে আসার পর বিনা ঔষধে তিনমাসের বেশি রক্তে স্বাভাবিক গ্লুকোজ নিয়ে থাকা সম্ভব।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ : প্রিডায়াবেটিস থেকে পুরাপুরি ডায়াবেটিস হওয়া ঠেকানো সম্ভব অনেকদিন।

আরোগ্য লাভ : ডায়াবেটিস নিরাময় অদ্যাবধি সম্ভব না হলেও রাখার বিকল্প নাই; ইনসুলিনের যেখানে জন্ম সে বাড়ীর আঙিনায় অগ্নিশীখা জ্বলছে-লেখা আছে যে মুহূর্তে ডায়াবেটিসের কিউর (আরোগ্য) উদ্ভব হবে তখন এটা নিভে যাবে/নিভানো হবে।আশাকরতে দোষ কি?

হাই কোলেস্টেরল / ডিসলিপিডেমিয়া

রক্তে চর্বি (লিপিড) জাতীয় জিনিষ বেশি/কম (অস্বাভাবিক) থাকাকে ডিসলিপিডেমিয়া বলে। সাধারন অর্থে এটা কোলেস্টরল ভাবলে ও (লিপিড/চর্বি) বলতে কোলেস্টরল, ট্রাইগ্লিসারাইড ও এদের যৌগ এলডিএল, এইচডিএল সবগুলোকেই বোঝায়।

এর মধ্যে এইচ ডি এল ভাল কোলেস্টরল, তাই এটা কমে যাওয়া খারাপ। পুরুষ মানুষের জন্য ৪০ বা তার বেশি থাকা ভাল; মহিলাদের ৫০ থাকা দরকার।

এলডিএল : এলডিএল খারাপ কোলেস্টেরল কারণ রক্তনালীতে জমে ব্রেইন হার্টের রক্ত সাপাই কমিয়ে দেয় বিধায় যথাক্রমে স্ট্রোক (ব্রেইন এটাক) হার্ট এটাক হতে পারে। সুস্থ মানুষের জন্য ১৩৫ এর নীচে, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ১০০ এর কম আর হার্ট এটাক হলে ৭০ এর নীচে থাকা চাই।

ডায়াবেটিস রোগীর ৪০ বছর বয়স হলে স্বাভাবিক এলডিএল থাকলে ও রুটিন স্টাটিন খেতে হবে। বয়স ২০ বছর হলে রুটিন হিসেবে সবার টেষ্ট করা দরকার এবং এলডিএল ১৯০ হলে ঔষধ (স্টাটিন) দিয়ে চিকিৎসা দিতেহবে। স্বাভাবিক থাকলে তিন বছর পর এবং চিকিৎসা লাগলে তিনমাস পর পর পরীক্ষা করতে হবে। স্বাস্থ্য কর খাবার খেলে, কায়িক পরিশ্রম বাড়াতে পারলে কিছুটা কোলেস্টরেল কমানো সম্ভব।

ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি থাকলে এইচডিএল কমে যায় তাই হার্ট এটাক হতে পারে; ট্রাইগ্লিসারাইড সরাসরি হার্ট বা ব্রেইন এটাকের জন্য দায়ী নয়। ট্রাইগ্লিসারাইড ১৫০ পর্যন্ত স্বাভাবিক, ৫০০ র বেশি হলে প্যাক্রিয়াটাইটিস করতে পারে তাই ঔষধ (ফেনোফিব্রেট, গেমফিব্রোজিল) খেতে হবে; কিডনীর দূর্বলতা থাকলে ফেনোফিব্রেটের পরিবর্তে গেমফিব্রজেল দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

চিকিৎসা : জীবনযাত্রা পরিবর্তন করতে হবে : খাওয়া-দাওয়া, ওজন কমানো, বিশ্রাম, শারিরীক পরিশ্রম পরিমিত করতেই হবে। ধূমপান হারাম করতে হবে।

রক্তচাপ/উচ্চরক্তচাপ

রক্তচাপ ৮০/১৩০ স্বাভাবিক। এর চেয়ে বেশি হলে সেটা বেশি। ৯০/১৪০ র বেশি হলে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করা দরকার।

তাহলে কারো যদি ৮৫/১৩৫ হয় সেটা বেশি কিন্তু ঔষধ লাগবে না। তার সতর্কতা হিসেবে পাতে লবন বাদ দিতে হবে। ওজন বেশি থাকলে কমাতে হবে। স্ট্রেস কমাতে হবে। ৪৫ বৎসরোর্ধ হলে সবার ডায়াবেটিস, কোলেস্টরল পরীক্ষা করতে হবে। অন্যদের বেলায় বিশোর্ধ হলে, স্থুলকায় হলে, বংশে স্ট্রোক, হার্ট এটাকের ইতিহাস থাকলে, ব্লাড প্রেশার বেশি থাকলে এগুলো পরীক্ষা করতে হবে।

এসেন্সিয়াল হাইপার টেনশন : উচ্চ রক্ত চাপের ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে কারণ পাওয়া যায়না। এজন্য এগুলোকে বলে এসেন্সিয়াল হাইপারটেনশন।

সেকেন্ডারী হাইপারটেনশন : ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে কারন পাওয়া যায় তাদের বলে সেকেন্ডারী হাইপারটেনশন। ৩০ বছরের কম বয়সীদেরক্ষেত্রে বেশি প্রেশারের কারন খুঁজতে হবে কারন এদের অনেকেরই কারন পাওয়া যায় অর্থাৎ সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন হয়। কারনের চিকিৎসা করলে সম্পূর্ন ভালো হওয়া সম্ভব।

প্রথম বার পরীক্ষায় যদি বেশি পাওয়া যায় সাথে সাথে উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ দেওয়া উচিত না। তবে যদি ১১০/১৮০ এবং স্ট্রোককরে সেক্ষেত্রে দিতে হবে। চেম্বারে বা বাসায় ৩-২ বার ৪-১ সপ্তাহ পর পর মেপে যদি বেশি হয় তবেই সেটা চিকিৎসা করতে হবে।

রক্ত চাপ পরীক্ষা করার টেকনিক এবং পারিপার্শিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসতে হবে। হাত টেবিলের উপর সটান রেখে মাটিতে পা রেখে আরামে বসতে হবে, কথা বলা যাবেনা।

হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন : অনেকেরই ডাক্তারের ঘরে মাপলে প্রেশার বেশি পাওয়া যায়;চেম্বারের বাইরে মেপে নিশ্চত করতে হবে।

উচ্চরক্তচাপের চিকিৎসা : জীবনযাত্রা পরিবর্তন করতে হবে : খাওয়া-দাওয়া, ওজন কমানো, বিশ্রাম, শারিরীক পরিশ্রম পরিমিত করতেই হবে। ধূমপান হারাম করতে হবে। পাতে লবন বাদ দিতে হবে।

ঔষধ : নিয়ম হল ৯০/১৪০ হলেই ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে; ১০০/১৬০ হলেই দুটা ঔষধ দিয়ে শুরু করতে হবে। নীতি হবে প্রেশার নামাতে হবে অর্থাৎ ৮০/১৩০ বা তার নীচে আনতে হবে, যত ঔষধ লাগে লাগুক। তবে ৭০/১২০ এর নীচে রাখা যাবেনা। ঔষধ পরিবর্তন বা বাদ দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। এক ঔষধে set করে গেলে বদল করা খুবই কঠিন। অনেক ঔষধ বাজারে আছে, যেটায় কাজ হয় সেটাই ভালো। রাস ব্লকার (এসিই-ইনহিবিটর, এআরবি) ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভালো,পছন্দনীয়; কারণ প্রেশার কমানোর পাশাপাশি এরা প্রোটিনুরিয়া কমায়।

৫৫ বছর বয়সের বেশি রোগীদের এ দুটা ঔষধ এত কার্যকরী নয়। এ বয়সে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার (এন্টিসিসিবি-এমলডিপিন, সিলনিডিপি) এবং থায়াজাইড লাইকডাইউরেটিক- (ক্লোরথায়জাইড) শ্রেষ্টতর। উপরের (সিস্টলিক) প্রেশার বেশি হলে ও এন্টিসিসিবি এবং থাইয়াজাইড লাইক ডাইরেটিক উত্তম।

এসিই ইনহিবিটর (ACEI) খেলে অনেকের কাশি হয় (১০ শতাংশ)। ঔষধ বন্ধ করলে ৩ থেকে ৪ দিনে কাশি চলে যায়; কাশি বন্ধ করতে হলে (ACEI) বন্ধ করতে হবে; পরিবর্তন করে (ARB) এ আর বি দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। দুটা ঔষধই গ্লোমারিউলার ফিলট্রেশন কমায় ও রক্তে পটাশিয়াম বাড়ায়। কিডনী দূর্বল হতে থাকলে এ দুটা ঔষধ বাতিল করে কার্যকরী বিকল্প ঔষধ যোগ করতে হবে। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ব্যবহারে অনেকের (অধিকাংশেরই) পা ফুলে, কিডনী, লিভার, হার্টের অসুখের পা ফোলার মত প্রস্রাব হবার ঔষধ দিলে এ ফোলায় কাজ হয়না। সকালে উঠে দেখা যায় পা চিকন, গতিময় দিন শেষে ফোলা পা, আঙ্গুল বসে যায়। এফোলা খারাপকিছু নয় বরং রক্তনালীর প্রসারণ হয় বলে এ ফোলা উপকারী। সিসিবি আর রাস ব্লকার কম্বিনেশন প্রেশারের ঔষধ দিলে অনেকের উপকার হয়। ACEI ও ARB একই রোগীকে দেয়া যাবে না।

উচ্চ রক্ত চাপের রোগীদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস সাধারণ রোগীর চেয়ে দিগুন, কোলেস্টরল বেশি, কিডনী রোগ, হার্টের রোগ, স্ট্রোক বেশি। প্রেশার স্বাভাবিক রাখতে পারলে সমস্য কম; নিয়মিত ডাক্তারের ফলোআপে থাকতে হবে এবং পরামর্শানুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতে হবে।

ডায়াবেটিসের ঔষধ গ্লিফলোজেন অথবা গ্লুটাইডস দীর্ঘ সময় খেলে কিডনী , রক্তনালীর অসুখ স্ট্রোক (ব্রেইন এটাক), হার্ট এটাক প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। রোগীর বয়স, রোগের বয়স যত বাড়বে স্ট্রোক/ব্রেন এ্যাটাকের ঝুঁকি তত বাড়বে। বংশে স্ট্রোকের ঘটনা থাকলে,ওজনাধিক্য থাকলে, ধূমপায়ী হলে, দীর্ঘসূত্রী কিডনীর অসুখ থাকলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। উচ্চ রক্ত চাপ, রক্তে কোলেস্টরেলাধিক্য, পূর্বে ঘটে যাওয়া স্ট্রোক স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। স্ট্রোকের ঝুঁকিতে থাকা এই সমস্ত রোগী নিয়মিত স্টাটিন খেলে উপকার হবে।

হার্ট এ্যাটাক ও হৃদরোগ

হার্ট এ্যাটাক ও হৃদরোগ : হার্ট এ্যাটাক বা হৃদরোগ বলতে সাধারণ অর্থে আমরা ইশকেমিক হার্ট ডিজিজ বা আরও definite করে বললে মায়োকারডিয়াল ইফারকশন বা (এমআই) বুঝে থাকি। আসলে হার্টের রোগ সমূহ হলো ১। হৃদপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালন সমস্যা বা ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ ২। হৃদপিন্ড কর্তৃক অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ সমস্য বা হার্ট ফেইলুর বা দুর্বল হার্ট ৩। হার্টের ভালভে সমস্যা বা সেপ্টাম বা পার্টিশনে ফুটো হওয়া। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অধিকাংশই জন্মগত ত্রুটি। হার্ট ফেইলুর হঠাৎ করে হয়না অন্য অসুখ থাকলে ক্রমাগত হার্ট দূর্বল হতে থাকে। এক সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহে ব্যত্যয় হয় ফলে রোগীর শ্বাস কষ্ট হয়, পায়ে শরীরে পানি জমে বা ইডিমা হয়।

হার্ট এ্যাটাক বা এমআই হল ২৫ শতাংশ রোগী ডাক্তার দেখানো আগেই মারা যায় তাই প্রথম এক ঘণ্টা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বেচে থাকার জন্য। সব বুকের ব্যথাই হার্ট এ্যাটাক নয়, তব বুকের ব্যাথা হলে সিরিয়াস হবার বিকল্প নেই। হার্টের ব্যথা বুকের ঠিক সেন্ট্রাল বা মধ্যখানে হয়; হার্ট বুকের বামপাশে থাকলেও ব্যথা কিন্তু বাম বা ডানপাশে নয় বুকের মধ্য জায়গায় হয়। ব্যথাটা উপরে নিচের চোয়াল পর্যন্ত এবং নিচে নাভি পর্যন্ত যেতে পারে। ব্যথার সাথে শ্বাসকষ্ট হয়, গলা আটকিয়ে আসতে পারে। শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে যেতে পারে। দাঁড়ালে প্রেশার কমে ঘুরে পরে যেতে পারে; রোগী পায়খানা প্রস্রাব করে দিতে পারে। মৃত্যু আসন্ন অনুভূতি নিয়ে রোগী ভয়ে কুঁকড়ে যেতে পারে। রোগী/রোগীর লোকজন/ ডাক্তারের প্রথম কাজ হবে নিকটবর্তী হাসপাতালে যাওয়া। যাওয়ার আগে একটা স্যালাইন লাগিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো। আরো দরকার হলো তৎক্ষণাৎ এসপ্রিন তিন বড়ি (3x75) বা ৩০০মি গ্রাম, ক্লোপিডেগ্রল তিনটা বড়ি (3x75), নাইট্রগ্লিসারিন, ব্যথার বড়ি পেথিড্রিন/কিটরোলাক সাথে ওমিপ্রাজল খাইয়ে দেয়া। ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়স হার্ট এ্যাটাকের জন্য মারাত্মক। যাদের ডায়াবেটিস আছে, যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন ঝুঁকি তাদের অনেক; সেই সাথে যদি ধূমপায়ী হন কোলেস্টেরল বেশি থাকে তাহলে তো আরো ঝুকি। সবগুলো সমস্যা যার/যাদের আছে সতর্ক তাদের হতেই হবে। বসে থাকা চাকুরী/ কাজ যাদের তাদের বেশি হয়। ভীষন দুশ্চিন্তা (মেয়ের বিয়ের ঝামেলা, লোন পরিশোধে অপারগতা, বাড়ি বানাতে গিয়ে অর্থ/আধিপত্যের ঝামেলা) অধিকাংশ সময়ই হার্ট এ্যাটাক ত্বরান্বিত করে, তাই সাবধান।

হৃদরোগ ও রক্তচাপ

হৃদ্‌রোগে সহজ সাত (সিম্পল সেভেন) বিষয়

দৈনন্দিন জীবনে শুধু সাতটি সহজ বিষয় রপ্ত করতে পারলেই হৃদ্‌রোগজনিত মৃত্যু ২০ শতাংশ কমে যাবে। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন এ কথা বলেছে। ১. শরীরের বাড়তি ওজন ঝেড়ে ফেলুন। সঠিক ওজন রাখুন। ২. ধূমপানকে না বলুন। ৩. সুস্থতার জন্য আপনাকে সচল বা সক্রিয় থাকতে হবে। দৈনন্দিন কাজকর্মের বাইরে প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটুন, সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিটি। ৪. দিনে কমপক্ষে পাঁচ রকমের তাজা ফল ও শাক-সবজি খেতে হবে, পাঁচবার। ৫. রক্তে ক্ষতিকর চর্বির মাত্রা কমাতে হবে। সে জন্য লাল মাংস, ভাজা-পোড়া খাবার, ঘি-মাখন, ফাস্ট ফুড ও বেশি চর্বিযুক্ত খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই ভালো। ৬. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আর তার জন্য লবণ খাওয়া কামানোটা খুবই জরুরি। ৭. রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করুন। চিনি, মিষ্টি, সহজ শর্করা কমিয়ে প্রোটিন ও সবজি খান বেশি করে।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে আট ভুল ধারণা

১। **রক্তচাপ বাড়লে ঘাড়ব্যথা হয়:** ঘাড়ে ব্যথা হলে কেউ কেউ মনে করেন, নিশ্চয়ই রক্তচাপ বেড়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রক্তচাপ বৃদ্ধির কোনো উপসর্গ বোঝা যায় না। সাধারণত হাড়ের জোড়া বা সন্ধির সমস্যায় ঘাড়ব্যথা হয়ে থাকে।

২। **রক্তচাপ বেশি থাকলে দুধ-ডিম নিষেধ:** দুধ-ডিম-মাংস খেলে রক্তচাপ বাড়ে-এ ধারণা ভুল। রক্তচাপ বাড়তি দেখলে কেউ কেউ দুধ-ডিম খাওয়া ছেড়ে দেন। আসলে ঝুঁকি এড়াতে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তেল-চর্বিযুক্ত খাবার (দুধের সর, চর্বিযুক্ত মাংস ইত্যাদি) ও লবন খেতে নিষেধ করা হয়।

৩। **টক খেলে রক্তচাপ কমে:** এই ধারণাও ভূল। রক্তচাপের পরিমাণ বেশি দেখলে কেউ কেউ তেঁতুলের পানি বা টক খান। লবণ মিশিয়ে এসব খেলে রক্তচাপ আরও বাড়তে পারে।

৪। **লবণ ভেজে খাওযা যাবে:** উচ্চ রক্তচাপের জন্য কাঁচা লবণ খেতে নিষেধ করায় অনেকে লবন হালকা ভেজে খান বা রান্নায় লবণের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। লবণ যেভাবেই খান না কেন, তা রক্তচাপ বাড়িয়ে দেবে।

৫। **রক্তচাপ কমে গেলে ওষুধ নয়:** উচ্চ রক্তচাপের অনেক রোগী রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলে ওষুধ সেবন বন্ধ করে দেন, যা একেবারেই ঠিক নয়। উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ হাঠাৎ বন্ধ করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এমনকি জীবনের ঝুঁকিও থাকে।

৬। সমস্যা নেই ওষুধ নেই: রক্তচাপ বাড়তি থাকলেও শরীরে কোনো সমস্যা হচ্ছে না, এমন অজুহাতে কেউ কেউ ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে চান। আসলে উচ্চ রক্তচাপে তেমন কোনো উপসর্গ না থাকলেও এটি ধীরে ধীরে হৃদ্‌রোগ, পক্ষাঘাত, দৃষ্টিহীনতা ও কিডনি অকার্যকারিতার ঝুঁকি বাড়াবে। দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা এড়াতেই আপনাকে ওষুধ দেয়া হয়। অনেকে বলেন, এই ওষুধ শুরু করলে সারা জীবন খেতে হবে, তাই শুরু না করাই ভালো। এটাও বিপজ্জনক চিন্তা।

৭। রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণ টেনশন: মানসিক চাপ, উদ্বেগ ইত্যাদি কিছুটা দায়ী বটে। তবে কেবল মানসিক উৎকণ্ঠা উচ্চ রক্তচাপের একমাত্র কারণ নয়। অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন, ওজনাধিক্য, ধূমপান, মদ্যপান, তেল-চর্বিজাতীয় খাবার, অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ প্রভৃতি উচ্চ রক্তচাপের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। জীবনাচরণ পরিবর্তণ করে রক্তচাপ বাড়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমাতে পারবেন।

৮। অন্যের ওষুধে ভালো কাজ হয়: উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে আপনার বয়স, উচ্চ রক্তচাপের তীব্রতা, আনুষঙ্গিক অন্য রোগ (যেমন ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস, হাঁপানি, প্রোস্টেটের সমস্যা, গর্ভাবস্থা ইত্যাদি) অনেক বিষয় বিবেচনা করেই রক্তচাপ কমানোর ওষুধ দেয়া হয়। কোনো ওষুধ কারও জন্য প্রয়োজনীয়, আবার একই ওষুধ অন্য কারও জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তাই যে ওষুধে অন্যের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এসেছে, সেটা আপনি চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া খাওয়ার চিন্তা করা ঠিক নয়।

কফি ও হৃদরোগ

উত্তর: যাদের হৃদস্পন্দন অনিয়মিত ক্যাফেইন কখনো কখনো তাঁদের স্বাস্থ্যের ওপর মন্দ প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এমনিতে হৃদরোগীদের কফি খেতে নিষেধ নেই।

হৃদ্‌রোগ ছাড়াও বুকে ব্যথা হয়

বুকে ব্যথা হলে প্রথমে হৃদ্‌রোগের কথাই মনে পড়ে। এই ভয় অমূলক নয়। প্রাপ্তবয়স্ক যেকোনো ব্যক্তির বুকে ব্যথা হলে হৃদ্‌রোগ আছে কি না, নিশ্চিত হওয়া উচিত। তবে বিশ্বজুড়ে যত মানুষ হৃদ্‌রোগজনিত বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে আসেন, তার চার গুণ আসেন অন্যান্য কারণে বুকে ব্যথার চিকিৎসা নিতে। হৃদ্‌রোগের আশঙ্কা বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বুকে ব্যথার অন্যান্য কারণ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। মাংসপেশি বা হাড়ের সমস্যার কারণে অনেক সময় বুকে ব্যথা হয়। ফুসফুস বা ফুসফুসের চারপাশের পর্দায় সংক্রমণ বা নানা রোগেও বুকে ব্যথা হয়। খাদ্যনালির সমস্যা, পেপটিক আলসার বা পাকস্থলীর অ্যাসিড ওপরে উঠে আসার কারণে প্রায় বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। এ ধরনের ব্যথা সাধারণ পাঁজরের নিচে দেখা দেয়। খাবারের কারণে অনেক সময়

বুক জ্বালা করে। ভয় বা আতঙ্ক থেকেও বুক চেপে আসে বা ব্যথা করতে থাকে। এর পাশাপাশি ঘাম, বুক ধড়ফড় ও ঘন ঘন নি:শ্বাস হতে পারে, যা হৃদ্‌রোগের মতোই লাগে। কিছু ওষুধের প্রতিক্রিয়ায়ও বুকে ব্যথা হয়। খাবার গেলার সময় খাদ্যনালির মাংসপেশির সমন্বয়হীনতার কারণেও বুকে তীব্র ব্যথা হতে পারে। তবে যেকোনো রকমের বুকে ব্যথারই সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া জরুরি।

হৃদ্‌রোগীদের ব্যায়ামে যত সতর্কতা?

যাঁদের আগে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বা হার্টে বাইপাস সার্জারি কিংবা রিং বসানো হয়েছে, তারাও কি ব্যায়াম করতে পারবেন নিশ্চিন্তে? হ্যাঁ, হৃদ্‌রোগীরা যে ব্যায়াম করতে পারবেন শুধ তো-ই নয়, ব্যায়াম করাটা তাদের চিকিৎসার অংশ হিসেবে বিবেচিত।

- হার্ট অ্যাটাকের সাত দিন পর থেকেই স্বাভাবিক কাজকর্মের মতো টুকটাক কয়েক মিনিট করে হাঁটাহাঁটি শুরু করা যায়। প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ মিনিট করে বাড়িয়ে এক মাস পর আধ ঘণ্টায় পৌঁছাবেন। রক্তনালিতে রিং পরানো বা বাইপাস সার্জারির পরও একই পরামর্শ। তবে গাড়ি চালানোর আগে ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।
- কিছু ক্ষেত্রে ব্যায়াম নিষেধ। যেমন অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, হার্টের ভালভের অধিক সরুত্ব, জন্মগত ত্রুটি এবং রক্তচাপ যখন খুবই অনিয়ন্ত্রিত থাকে।
- অনেক হার্ট ফেইলিউরের রোগী সামান্য পরিশ্রমে হাঁপিয়ে যান। তারা ততটুক হাঁটবেন যতটুকুতে শাস্বকষ্ট শুরু না হয়, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা নিস্তেজ না হয়ে পড়েন, বুকে চাপ বা ব্যথা না হয়।

এক. ব্যায়ামের আগে পাঁচ মিনিট ওয়ার্ম আপ এবং শেষে পাঁচ মিনিট কুল ডাউন করবেন।

দুই. হৃদরোগীদের জন্য ভারী ব্যায়ামের চেয়ে হাঁটাহাঁটি বা জগিংই ভালো।

তিন. প্রতিদিন একই সময়ে হাঁটা ভালো। সকাল-বিকেল কোনো পার্থক্য নেই, তবে ভরা পেটে হাঁটবেন না। খুব ঠাণ্ডা বা গরম আবহাওয়ায় হাঁটবেন না। কোনো কারণে শরীর খারাপ লাগলেও না।

চার. একসঙ্গে কষ্ট হলো ভাগ করে হাঁটতে পারেন।

পাঁচ. বাড়ির কাছাকাছি বা সঙ্গীসহ হাঁটা ভালো। যাতে হঠাৎ শরীর খারাপ লাগলে সাহায্য নিতে পারেন।

ছয়. বুকে চাপ বা ব্যথা লাগলে সঙ্গে রাখা নাইট্রোগ্লিসারিন স্প্রে জিভের নিচে দিন।

সাত. ব্যায়ামের পর গোসল করার আগে ১৫-১০ মিনিট সময় নিন। বাড়ি ফেরে বিশ্রাম নিন এবং পানি পান করুন।

স্ট্রোক

স্ট্রোক সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারনা আছে। হার্ট এটাককে স্ট্রোক বলে কিছু লোক। আসলে স্ট্রোক ব্রেনের অসুখ। স্ট্রোকে ব্রেইনে রক্ত সরবরাহ কমে গিয়ে ব্রেইন কোষ (cell)মরে যায়। আর হার্ট এটাকে হার্টের রক্ত সরবরাহ কমে যায়।

কি হয় স্ট্রোকে?

হঠাৎ করে মুখের এক অংশ বিবশ হয়, দূর্বল হয়ে যায় একই পাশের হাত পা। চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে শরীরের অর্ধেক অংশ। হঠাৎই বিহ্বল হয়ে পরে, কথা বলতে পারেনা, কষ্ট করে বলে বা বললে বোঝা যায় না। হঠাৎ করেই দৃষ্টি ঝাপসা হয় বা দেখতে সমস্যা হয় এক বা অন্য চোখে। হঠাৎ করে হাঁটতে পারেনা, কষ্ট হয় হাটতে, উঠে দাঁড়াতে, ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে। কোন পূর্বাভাস ছাড়া তীব্র মাথা ব্যাথা ও স্ট্রোকের লক্ষণ হঠাৎ করে ঘটে যাওয়াটাই স্ট্রোকের বৈশিষ্ট্য।

সতর্কীকরণ উপসর্গ সমূহ :

১। হাঁসতে বলেন বা দাঁত দেখাতে বলেন- মুখের এক কোনা এক দিকে ঝুলে যাবে।

২। দুই হাত উপরে তুলতে বলেন- এক হাত পরে যাবে

৩। কিছু একটা বাক্য বলতে বলেন- ভাঙ্গা কথা আসবে বা অস্পষ্ট/অদ্ভুত কথা শোনা যাবে যে কোন একটা হলে স্ট্রোক মনে করে হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে যাবেন বা সাথে সাথে ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন।

কেন হয়?

দুইভাবে রক্ত সরবরাহ কমে ব্রেইনে। রক্তনালী বন্ধ হয়ে যেটাকে বলে ইশকিমিক স্ট্রোক। ব্রেইনের কোন অংশে রক্ত ক্ষরণ হয়ে স্ট্রোক হলে সেটা হল হেমরেজিক স্ট্রোক। ট্রানসিয়েন্ট ইশকিমিক এটাকে একই রকম সবকিছু হয় তবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সবকিছু পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে যায়।

স্ট্রোকের কারণ

স্ট্রোকের প্রধান কারন উচ্চ রক্তচাপ তবে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, ধূমপান ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয় । একবার স্ট্রোক হলে দ্বিতীয়বার হবার সম্ভাবনা ৩-২ গুন বাড়ে। সব কিছুর সাথে /যে কোন একটির সাথে স্ট্রেস বা টেনশন যোগ হলে স্ট্রোক করার সমূহ সম্ভাবনা।

স্ট্রোকের পরিণতি

রোগী সাথে সাথে মৃত্যুবরন করতে পারে। শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হতে পারে বহুদিন/ আজীবন। এক পাশ দূর্বল নিয়ে কাজ কর্ম করে খেতে পারে। জীবন ভর উন্নতি হতে থাকে অনেকের। তবে বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত আংশিক দূর্বলতা থাকে।

ডায়াগনোসিস

ইমেজিং-সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করে নিশ্চিত ডায়াগনোসিস করা সম্ভব। হেমোরেজ হলে সাথে সাথে ধরা পরে। ইশকেমিক স্ট্রোকের ইমেজ আসতে অনেক সময় ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত সময় লেগে যায়। উপসর্গ থাকলে সিটি স্ক্যান স্বাভাবিক থাকলে ও তাই ইশকেমিক স্ট্রোক বলে চিকিৎসা দিতে হয়। ব্রেনের মধ্যে খুব ছোট ক্ষত হলে বা ব্রেনের নীচের অংশে কিছু হলে এম আর আই দরকার হয়।

প্রতিরোধ

স্ট্রোক যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ঝুঁকিগুলো কমাতে হবে। স্ট্রেস বা মানসিক চাপ এড়িয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনের অভ্যাস রপ্ত করতে হবে। প্রয়োজন মত স্টাটিন খেতে হবে। স্ট্রোক না হলে এস্পিরিন নয়।

কিডনি রোগ-পা ফোলা, ইডিমা

পা ফোলা বা ইডিমা : পা ফোলা বা ইডিমা হলেই সাধারণের ধারনা কিডনী রোগ হয়েছে। হার্ট ফেইল করলে, লিভার সিরসিস হলে পা ফুলতে পারে। বেশী মোটা মানুষের ও পা ফোলা থাকে। হরমোনের অসুখ হাইপথাইরয়েডিজম হলে পা ফুলে যায়। প্রেশারের ঔষধ এমলোডিপিন বা সমগোত্রীয় ঔষধ,ব্যাথার ঔষধ (এনএসআইড, করটিকস্টেরয়েড) সেবনেও পা ফুলে। ফুললেই প্রস্রাবের ঔষধ খাওয়ার প্রবণতা আছে অনেকের এতে কিডনীর ক্ষতি হয়। অসুখ না থাকলে তাই ফোলার ঔষধ নয়;ক্ষতিকারক এ ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া সেবন অন্যায়।

কিডনীর রোগ : কিডনীর ইনফেকশন আর পাথর ছাড়া অন্য দুটি সমস্যা হল গ্লোমেরুলনেফ্রাইটিস ও কিডনী ফেইলুর। শেষোক্ত দুটাতে পা ফুললে ও প্রথমোক্ত দুটায় হয়না। ইনফেকশন হলে জ্বর আসবে অন্য গুলোতে নয়। কিডনীর ইনফেকশন (পাইলনেফ্রাইটিস), প্রস্রাবের রাস্তায় ইনফেকশন (সিস্টাইটিস-প্রস্রাবের থলের ইনফেকশন ও ইরেথ্রাইটিস-রাস্তার ইনফেকশন) এ এ্যান্টিবায়টিক লাগে অন্যগুলোতে নয়। বাচ্চাদের গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস চিকিৎসায় সেরে যায়; বড়দের বেলায় এটা জটিল। কিডনীর বায়োপসী করা লাগে।

রেনাল (কিডনী) ফেইলর : চিকৎসাযোগ্য কারনে ফেইলুর (একুট কিডনী ফেইলুর) নিরাময় যোগ্য;অন্যথায় ক্রনিক কিডনী ফেইলুর চিকিৎসা চলে অনেকদিন যাবৎ। ফেইলর অর্থ সবকিছ শেষ নয়। কিডনী অকেজো হবার ৫টি স্তর (স্টেজ) আছে। স্টেজ৪- হলে ঔষধ, খাদ্য খাওয়া সবই পরিমিত/অভিশ্রুত (modify) করতে হবে। এক পর্যায়ে ডাল দুধ না খাওয়া ভালো, সবজি সিদ্ধ করার পর পানি ফেলে দিয়ে রান্না করতে হবে। ২৪ ঘন্টার পানি হিসেব করে পান করতে হবে। ডায়াবেটিস হলে সুগার খেতে না করে আর কিডনীর অসুখ হলে প্রোটিন খেতে না করে। তাই প্রোটিন না খেয়ে ক্যালরির জন্য ভাত খাওয়া যেতে পারে। ৫ম স্তরকে বলে শেষ স্তর তখন কিডনী কাজ করেনা বলে ডায়ালাইসিস লাগে। কিডনী ফেইলর মানেই ডায়ালাইসিস লাগবে তা নয়। ডায়ালাইসিস হল মেশিনে কিডনীর কাজ করা। ডায়ালাইসিস সাময়িক চিকিৎসা মাত্র: কিডনী প্রতিস্থাপনই (কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট) আসল চিকিৎসা। প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ডায়ালাইসিস চালিয়ে যাওয়া যায়। রক্তের ক্রিয়াটিনিন ও ইজিএফআর দেখে কিডনী দূর্বলতার স্তর বোঝা যায় ক্রিয়াটিনিন ৬ এর বেশি হলে ইজিএফআর ২০এর নীচে যেতে থাকলে ডায়ালাইসিসের কথা ভাবতে হবে, প্রস্তুতি হিসেবে ফিস্টুলা করতে হবে। ফিস্টুলা রক্তনালীর একটা ছোট অপারেশন। এটা করা থাকলে যে কোন সময় /দরকারে জটিলতার ঝুঁকি ছাড়া ডায়ালাইসিস সম্ভব। কিডনীর দূর্বলতা অর্থ দুটা কিডনীই দূর্বল। প্রেশার,ডায়াবেটিস, ইলেক্ট্রলাইট, ক্যালসিয়াম, ফসফেট নিয়মিত পরীক্ষা করে স্বাভাবিক রাখতে হবে। ইনফেকশন, ডিহাইড্রেশন সতর্কতার সাথে চিকিৎসা করতে হবে; এগুলো কিডনীর দূর্বলতাকে বাড়ায়। এ রোগ হলে প্রেশারের ঔষধ বেশি লাগে। ঔষধ যতই লাগুক রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতেই হবে।

বয়স্কদের রোগ

আপনার বয়স যখন ৬৫ পেরুবে তখন আপনি বয়স্ক (Senior) গ্রুপে নাম লেখালেন। বয়স্কদের এই গ্রুপের কিছু অসুখও আপনার জন্য প্রবল হয়ে গেল।

মোটামুটি ১৫টা অসুখ বয়সের সাথে বাড়ে।

১। আর্থ্রাইটিস

সিডিসি (সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল) এর ধারণা ৪৯.৭ শতাংশ পয়ষট্টি উর্ধ্ব লোক গিরা ব্যথা এবং তজ্জন্য কম সচল জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। তবে অচল না হয়ে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ঔষধ নির্ভরতা কমিয়ে নিজের জীবন ব্যবস্থার সাথে কর্মতৎপরতা চাল রাখলে সক্রিয় ও সুস্থ্য থাকতে পারে।

২। হার্ট ডিজিজ

২০১৪ সালের পরিসংখ্যান হলো ৪৮৯৭২২ জন বয়স্ক লোক হার্ট ও রক্তনালির অসুখের কারণে মারা গেছেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টরেল বাড়তে থাকে এবং স্ট্রোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সচল থাকলে নিয়মিত ব্যায়াম করলে সুষম খাবার খেলে অবশ্যই ভাল থাকা সম্ভব। এর সাথে রাতের নিদ্রা, বিশ্রাম, সময়ও প্রয়োজন মাফিক হতে হবে। ওজন স্বাভাবিক রাখতে হবে; খাদ্যাভাস পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। প্রতিদিন একই সময় ঘুমাতে হবে ও জাগতে হবে; শোবার ৮ ঘণ্টার মধ্যে চা কপি পরিহার করতে হবে।

৩। ক্যানসার

ক্যানসারে ২০১৪ সালে মৃতের সংখ্যা ৪১৩৮৫৫ অর্থাৎ পরিসংখ্যানে দ্বিতীয়। ঠিকমত স্ক্রিনিং করলে অর্থাৎ মেমোগ্রাম, কলনোস্কপি ও ত্বক পরীক্ষা করলে ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা এবং প্রতিকার সম্ভব।

৪। ফুসফুসের অসুখ

ব্রংকাইটিস বা এ ধরনের অসুখ (সিওপিটি) পয়ষট্টি উর্ধ্বদের তৃতীয় বৃহত্তম অসুখ এবং ২০১৮ সালের মৃতের সংখ্যা ১২৪৬৯৩। উনাদের মধ্যে ১০ শতাংশ এবং ১৩ শতাংশ জনের মধ্য হাঁপানি। আমেরিকান পরিসংখ্যানে ১০ শতাংশ পুরুষ আর ১১ শতাংশ মহিলা ক্রনিক ব্রংকাইটিস বা এম্ফাইসিমাতে ভুগে। এ অসুখগুলো থাকলে নিউমোনিয়া ও অন্য ইনফেকশন বেশি হয়। তাই নিয়মিত ফুসফুসের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করলে দরকার মত নিয়ম মেনে কার্যকরী ঔষধ খেলে ও প্রোগ্রাম করে অক্সিজেন নিলে অনেক দিন ভাল থাকা যায়।

৫। আলঝাইমার

প্রায় প্রতি ১১ জনে একজন স্মরণশক্তির সমস্যায় ভোগেন। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখেনা এদের নিরাপত্তা, নিরাপদ জীবন আর পরিচর্যা সংসার, সমাজ রাষ্ট্রের হিসাবে অনেক ব্যায়বহুল ও কষ্টকর। ৪৫-৪০ বছর বয়সে যারা ব্রেইনের কাজ বেশি করে, স্মরণশক্তি কমার সমস্যা তাদের কম হয়।

৪। অস্টিওপরোসিস

৫৪ মিলিয়ন পঞ্চাশোর্ধ্ব আমেরিকান হাড্ডি ক্ষীণ হওয়ার এই রোগে ভোগে। ফল স্বরূপ চলাফেরার সীমাবদ্ধতা থাকে ভার্টিব্রা বসে যায় (কলাপ্স করে)। পরে যাওয়ার ভয় থাকে, পরে গেলে, হাড্ডি ভাঙ্গলে গিরা ছুটে গেলে বয়স্ক লোকের দুর্ভোগ বাড়ে - স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি পায়।

Osteoporosis কি?

● এটি হলো এক ধরনের হাড়ের রোগ, যেখানে হাড়ের ঘনত্ব (bone density) কমে যায়, হাড় ভঙ্গুর ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অল্প আঘাতেই হাড় ভেঙে যেতে পারে।

● **প্রকারভেদ (Types)**

১. Primary Osteoporosis

- Type I (Postmenopausal) → নারীদের মেনোপজের পর estrogen কমে যাওয়ায় হয়
- Type II (Senile) → বয়স বাড়ার কারণে (≥৭০ বছর বয়সী পুরুষ-নারী উভয়েই)

২. Secondary Osteoporosis

- অন্য কোনো রোগ বা ওষুধের কারণে (যেমন - steroids, chronic kidney disease, hyperthyroidism, diabetes, malabsorption ইত্যাদি)

● **কারণ (Causes)**

- বয়স বৃদ্ধি
- মেনোপজ → Estrogen হরমোন কমে যাওয়া
- পুরুষদের ক্ষেত্রে Testosterone হরমোন কমে যাওয়া
- Vitamin D ও Calcium-এর ঘাটতি
- দীর্ঘদিন corticosteroid ব্যবহার
- Chronic রোগ (CKD, hyperthyroidism, malabsorption, liver disease)
- ধূমপান, মদ্যপান, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব

চিকিৎসা (Treatment)

১. জীবনধারা পরিবর্তন

- নিয়মিত ব্যায়াম (weight-bearing exercise যেমন হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার)
- ধূমপান ও অ্যালকোহল ত্যাগ
- সূর্যের আলোতে নিয়মিত থাকা

২. খাদ্যাভ্যাস

- পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম (দুধ, দই, মাছ, শাকসবজি)
- Vitamin D (সূর্যের আলো, সাপ্লিমেন্ট)

৩. ঔষধ

- Bisphosphonates → যেমন alendronate, risedronate (সবচেয়ে প্রচলিত)
- Selective Estrogen Receptor Modulators (SERM) → যেমন raloxifene
- Hormone Replacement Therapy (HRT) → postmenopausal নারীদের ক্ষেত্রে
- Denosumab → mon – clonal antibodz, calcium metabolism এ প্রভাব ফেলে
- Teriparatide (PTH analogue) → severe osteoporosis-এ ব্যবহার হয়

• চিকিৎসায় সমস্যা / জটিলতা

- Bisphosphonate → গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, খাবারের সাথে জটিলতা, rare complication = osteonecrosis of jaw
- HRT → Breast cancer, DVT, stroke ঝুঁকি বাড়াতে পারে
- Denosumab → বন্ধ করলে দ্রুত হাড় ভাঙার ঝুঁকি বাড়তে পারে
- Teriparatide → দামের কারণে সীমিত ব্যবহার, দীর্ঘদিন দেওয়া যায় না (সর্বোচ্চ ২ বছর)
- রোগীরা অনেক সময় নিয়মিত ওষুধ বা সাপ্লিমেন্ট নিতে চান না → compliance problem

● সারসংক্ষেপ টেবিল

বিষয়	বিবরণ
প্রকার	Primary (Postmenopausal, Senile), Secondary (রোগ/ওষুধজনিত)
কারণ	বয়স, মেনোপজ, হরমোন ঘাটতি, Vitamin D/Calcium কম, steroid ব্যবহার
চিকিৎসা	Lifestyle, Calcium + Vit D, Bisphosphonate, SERM, HRT, Denosumab, Teriparatide
চিকিৎসায় সমস্যা	Side effects (GI upset, jaw necrosis, cancer risk), খরচ বেশি, compliance সমস্যা

সহজ কথায় : অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধই মূল কথা → নিয়মিত ব্যায়াম, সূর্যের আলো, সুষম খাবার, ধূমপান-মদ এড়িয়ে চলা, আর প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ।

৬। ডায়াবেটিস

পয়ষট্টি বা পয়ষট্টির বেশি বয়স্ক লোকদের ২৫ শতাংশ ডায়াবেটিস আছে; যদিও সমগ্র জনগণ ধরলে এটা ১০ শতাংশ। শুধুমাত্র রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করে রক্তের মাত্রাতিরিক্ত গ্লুকোজ শনাক্ত করা যায়। যত আগে করা যায়, আর ব্যবস্থা নেয়া যায়- বয়স্কদের স্বাস্থ্য তত সুন্দর, উন্নত ও দীর্ঘতর করা সম্ভব।

৭। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমার জন্য এই প্রদাহগুলো বেশি হয়। বয়স্ক লোক অসুস্থও হয় বেশি এবং তাড়াতাড়ি। এগুলো অসুস্থ হবার প্রথম আটটি কারণের একটি। বছরে একবার ফ্লু ভ্যাক্সিন আর রিকমান্ডেশন অনুযায়ী নিউমোনিয়া ভ্যাক্সিন নিলে এবং প্রাত্যহিক জীবনে সতর্ক থাকলে ভালো থাকা যায়।

৮। পড়ে যাওয়া / বার বার পড়ে যাওয়া

বয়স পঁয়ষট্টি পেরুলে পড়ে যাবার ঘটনা বাড়তে থাকে। বাড়িতেই বেশি পড়ে, তাই সতর্ক হতে হবে মেঝে, বাথরুম যেন স্লিপারী না হয়, এলোপাতাড়ি মেঝেতে কিছু পড়ে না থাকা। হিসেব হলো প্রতিবছর আড়াই মিলিয়ন আমেরিকান জরুরি চিকিৎসা নেয় পড়ে যাবার বিপত্তির জন্য, যারা যায় বার বার যেতে হয়। ৬৫তে যদি এটা হয় ৩০ শতাংশ, আশিতে গিয়ে ঠেকে ৪০ শতাংশে। ১৯-১৫ শতাংশের মারাত্মক জখম হয়।

৯। স্থুলতা

৬৫ থেকে ৭৫ বয়সের লোকদের বিএমএই ৩০ এর বেশি হলে স্থুলকায়। তার অর্থ হলো এরা অসাড়/কর্মক্ষম নয়। ফল হল হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস, ক্যানসার বেশি হয়। বয়স বাড়ার সাথে এসব রোগের ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

১০। ডিপ্রেশন

১১ থেকে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধ ডিপ্রেশনে ভোগে। মানুষ আনসোসাল, সংসারে বোঝা হয় পড়ে। চিকিৎসা, থেরাপি অচল জীবন সব মিলে ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে জীবন যাত্রা। বয়স বাড়ার সাথে জীবনভর ঘটে যাওয়া ঘটনা আর লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আত্মোপলব্ধি, আত্মনির্ভরতাও হারাতে থাকে। এক সময় এটা তলানিতে যেতে পারে। নিজেকে ধরে রাখার জন্য নিয়মানুবর্তী সময়ানুবর্তী হতে হবে। নিজের শক্তি সক্ষমতা এমনকি যৌন ক্ষমতাও ধরে রাখা সম্ভব।

১১। ওরাল হেলথ

২৫ শতাংশ বয়স্ক লোকের স্বাভাবিক দাঁত নেই; বয়স বাড়ার সাথে মুখ গহ্বর শুকিয়ে যায়, ক্রুটী প্রতিরোধ করা কঠিনতর হয়ে থাকে। বয়স্কদের মুখের পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত দাঁতের চিকিৎসায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

১২। দারিদ্র্য

বয়স্ক লোকের আয় কমার সম্ভাবনা বেশি। ৪৫ শতাংশ পুরুষের আয় দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে আসে ৮০ পর্যন্ত পৌঁছতে, এ অবস্থা আরো গুরুতর হয় ঔষধ, ডাক্তারের ফি সবকিছু মিলে কঠিনতর জীবন যাপন করতে হয়।

১৩। শিঙ্গলস (হারপিস জোস্টার)

ছোট বেলায় যার চিকেন পক্স হয়েছিল শেষ বয়সে তার শিঙ্গল হয়। ষাটের বেশি যাদের বয়স, তিনজনের একজনের হয় । এক পাশের নার্ভ বরাবর ভীষণ ব্যথার সাথে র‍্যাশ বেরোয়। এখন অনেক দেশেই এটার ভ্যাক্সিন পাওয়া যায়।

১৪। মাথা ঘোরা

৩০ শতাংশ লোক ৬৫ পেরুলে এ সমস্যায় পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রেই সমস্যা নয় শুধু পড়ে যাবার ঝুঁকি বাড়ে এতে।

জরুরি সমস্যা হতে পারে হার্টের রেট অনিয়মিত হলে, হার্ট এ্যাটাক হলে সেক্ষেত্রে ত্বরিত চিকিৎসার দরকার। মাথা ঘোরা নৈমিত্তিক হলেও সবসময় কঠিন অসুখ নয়। ঠাহর করতে হবে এটাই শুধুই মাথা হালকা লাগার মত কিছু নয়কি। দাঁড়ালে ক্ষণিকের জন্য এমন হতে পারে উচ্চরক্তচাপের ঔষধ খেলে বেশি হয়। ব্রেনে রক্ত সরবরাহের ব্যাঘাত হলে এটা হয়।

হার্ট থেকে রক্ত ব্রেনে কম গেলে যেমন বড় ধমনি চিকন হলে (এওরটিক স্টেনোসিস), হার্ট রেট ঠিক না থাকলে (এরিধমিয়া) এটা হতে পারে।

হার্টের সয়ংক্রিয় (অটোনমিক) নার্ভ সরবরাহের ব্যাত্যয় হলে ভেসভ্যাগাল এ্যাটাক হতে পারে।

ভার্টিগো : ভার্টিগো হলে ভক্তভোগীর অনুভূতিগুলো মাথার মধ্যে ঘোরে অথবা মাথার চারদিকের জিনিষ ঘুরতে থাকে। বিনাইন পজিশনাল ভার্টিগো (বিপিপি) খুব মারাত্মক সমস্যা নাহলেও বারবার হতে পারে, ব্রেন স্টেমের কোন উপসর্গ থাকলে এমআরআই করতে হবে। বয়সের সাথে শরীরে আচরণ বদলায় তাই দাঁড়ালে মাথা ঘুরে উঠে (পশ্চুরাল হাইপোটেনশন) হয়। লবনের তারতম্য, রক্তরসের পরিমাণের তারতম্য, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুর সংবেদনশীলতা কমার কারণে এগুলো হয়।

ডেলিরিয়াম : ৩০ শতাংশ বৃদ্ধ লোকের এটা হয় ক্ষণিকের জন্য, পরিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে তাল মিলাতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারণ পাওয়া যায় চিকিৎসায় ভালও হয়।

১৫। প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারা

নিজের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুযায়ী প্রস্রাব ধরে রাখতে পারেন না ১৫ শতাংশ মহিলা এবং ১০ শতাংশ পুরুষ, বয়স ৬৫র উপরে হলে এটা বেশি হয়। সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদিও বয়সের সাথে প্রস্রাবের রাস্তায় পরিবর্তনের জন্য এটা হয় তবে বয়স হলেই এটা হবে ধারণাটা সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। তাই কারণ খুঁজতে হবে প্রতিকারের জন্য।

(ক) আর্জ ইকন্টিনেন্স- অর্থাৎ প্রস্রাব ধরলে সবুর করতে পারে না, কাপড় বা শরীর ভিজে ফেলে সাধারণ অর্থে মূত্রথলির মাংস পেশীর সমস্যায় এটা হয়। এন্টি মাসকেরিনিকস, সলিফেনাসিন, টলটেরডিন জাতীয় ঔষধে কাজ হয়; সাথে মূত্রথলির ট্রেনিং / ব্যায়ামও করতে হবে।

(খ) স্টেস ইনকন্টিনেন্স : মহিলাদের বেশি হয়, কাশি দিলেই প্রস্রাব হয়ে যায়। পেলভিক মাসল বা তলপেটের মাংসপেশির ব্যায়াম করতে হবে অর্থাৎ বাজারে গিয়ে প্রস্রাব ধরলে আমরা যেমন আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করি এ রকম প্র্যাক্টিস করতে হবে। এস্ট্রোজন হরমোন কমে যাবার জন্য এট্রফিক ভেজাইনিটিস হয় এ বয়সে। হরমোন পেসারিজ দিয়ে ভ্যাজাইনাইটিসের চিকিৎসা করতে হয়।

(গ) ওভারফ্লোইনকন্টিন্সে : প্রস্টেট বড় হবার জন্য বয়স্ক পুরুষের এটা হয়, প্রস্রাবের রাস্তার প্রতিবন্ধকতা সরাতে পারলে সমস্যার সমাধান হয়। স্ট্রোক বা ডিমেনসিয়া বয়স্ক লোকের মূত্রথলির উপরে কন্ট্রোল হারায়। সময় ঠিক করে প্রস্রাব করাতে পারলে হবে।

ওভারফ্লোইনকন্টিনেন্স ছাড়া ক্যাথেটার প্রাথমিক চিকিৎসা নয়। তবে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে অবশ্যই লাগাতে হবে। তখন চামড়ার ক্ষতি হবে। ইনকন্টিনেন্সের জন্য জীবনের মান কমে যাবে।

বেশি ঔষধ (পলি ফার্মেসি) : বয়স বাড়ার সাথে অসুখের সংখ্যা ও ঔষধের সংখ্যা বাড়তে থাকে। চারটার বেশি লাগলে সেটা হল পলিফার্মেসি।

সংগত কারণেই নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে ঔষধ লাগবে কিনা, ডোজ পরিবর্তন করতে হবে কিনা। এটা করতে প্রেসক্রিপশন ঔষধ চাক্ষুস মিলিয়ে দেখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ঔষধ যেমন ৭০ এর পর রক্তনালির অসুখ ঠেকানোর (প্রোফাইল্যাক্টিক) জন্য স্টাটিন দেবার যুক্তি নেই, অশীতিপরদের বিসফসফনেট দিতে নাই। ননস্টেরয়ডাল এন্টিইনফ্লামেটরি ঔষধ বয়স্কদের বেলায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি করে। ঔষধ দরকার অথচ খাচ্ছে না অথবা নির্দেশ ছিল অথচ বন্ধ করেছে যার জন্য ইমার্জেন্সিতে এসেছে; ট্যাপারিং ডোজটা বোঝাতে হবে ভাল ভাবে। ঔষধ যে খায় যে দেয় দুজনাই বুঝলো কিনা নিশ্চিত হতে হবে।

ডাক্তারকে মনে রাখতে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ইনফেকশন, এনেমিয়া, অপুস্টির মত নৈমিত্তিক সমস্যার জন্য বয়স্কদের শারীরিক প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। গতানুগতিক নয় বয়সভিত্তিক আর ব্যক্তিভিত্তিক হতে হবে প্রেসক্রিপশন ও পরিচর্যা। বয়স যাই হোক ওজন স্বাভাবিক রেখে ধূমপান পরিহার করে সুস্থ্য থাকতে পারে। সচল থাকার অভ্যেস করলে স্বাস্থ্যকর খাবার প্র্যাক্টিস করলে বিশ্বের ৪১ শতাংশ সুস্থ গ্রুপের হয়ে যাওয়া সম্ভব। বয়সের সাথে সংগতি রেখে সতর্ক হলে যে কেউ মোটামুটি আরো ২০ বছর ভালো থাকার আশা করতে পারে।

বয়স্কদের ভ্যাক্সিন

ফ্লু : প্রতিবছর শীত শুরুর আগে ফ্লু ভ্যাক্সিন নিতে হবে।

নিউমোনিয়া : নিউমোনিয়ার দুই ধরনের ভ্যাক্সিন আছে। প্রিভেনার ১৩- এক ডোজ নিলে সারা জীবনের প্রোটেকশন হবার কথা। আরেকটা নিউমোনিয়া ভ্যাক্সিন ৫ বছর পর পর নিতে হবে।

হেপাটাইটিস বি : ষাটোর্ধদের ঝুঁকিতে থাকলেই শুধু হেপাটাইটিস বি ভ্যাক্সিন নিতে হয়।

জোস্টার (শিংগল) ভ্যাক্সিন : পঁয়ষট্টি উর্ধদের এক হার্পিস জোস্টার ভাইরাসে ৭ বছর পর্যন্ত প্রোটেকশন দিবে।

- **Adult Vaccines (প্রাপ্তবয়স্কদের টিকা)**

১. Influenza vaccine
   - প্রতি বছর একবার দেওয়া উচিত
   - বিশেষ করে ≥৫০ বছর বয়সী, গর্ভবতী, ডায়াবেটিস/হার্ট/লাংস/কিডনি রোগী, স্বাস্থ্যকর্মী

২. Tetanus, Diphtheria, Pertussis (Tdap / Td)
   - প্রতি ১০ বছরে একবার Td booster
   - গর্ভবতী নারীদের গর্ভকালেও দেওয়া হয় (নবজাতককে সুরক্ষার জন্য)

৩. Pneumococcal vaccine (PCV13, PPSV23)
   - বয়স ≥৬৫ বছর
   - কম বয়সী হলেও যদি CKD, Diabetes, COPD, Heart disease, Immunocompromised থাকে

৪. Hepatitis B vaccine
   - যারা শৈশবে পাননি, বা high-risk group (ডায়াবেটিস, Dialysis, স্বাস্থ্যকর্মী, একাধিক sexual partner)

৫. Hepatitis A vaccine
   - যারা ভ্রমণ করেন এমন এলাকায় যেখানে Hep A সাধারণ
   - Chronic liver disease রোগীরা

৬. HPV vaccine (Human Papilloma Virus)
   - নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য
   - সাধারণত ৯-২৬ বছর বয়সে, তবে ৪৫ বছর পর্যন্ত দেওয়া যায়
   - Cervical cancer, genital wart প্রতিরোধ করে

৭. Varicella (Chickenpox) vaccine
   - যারা আগে Chickenpox হয়নি বা ভ্যাকসিন পাননি

৮. Herpes Zoster (Shingles) vaccine
   - বয়স ≥৫০ বছর হলে একবার দেওয়া যায়
   - Shingles (দরদরানি) প্রতিরোধে কার্যকর

৯. MMR (Measles, Mumps, Rubella)
   - শৈশবে না পাওয়া থাকলে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় ১-২ ডোজ

১০. COVID19- vaccine

- বর্তমান সময়ে সব প্রাপ্তবয়স্কের জন্য
- বিশেষ করে elderly, comorbid patient

● বিশেষ পরিস্থিতিতে ভ্যাকসিন

- CKD / Dialysis রোগী → Influenza, Hep B, Pneumococcal
- Diabetes → Flu, Pneumococcal, Hep B
- Immunocompromised / Transplant patient → Live vaccine এড়িয়ে চলতে হয়
- Travelers → Yellow fever, Typhoid, Rabies, Hep A/B

● সারসংক্ষেপ চার্ট

ভ্যাকসিন	কাদের জন্য	কবে দিতে হবে
Influenza	সব প্রাপ্তবয়স্ক	প্রতি বছর
Tdap/Td	সব প্রাপ্তবয়স্ক	প্রতি ১০ বছরে একবার
Pneumococcal	≥৬৫ বছর বা ঝুঁকিপূর্ণ রোগী	এক বা একাধিক ডোজ
Hepatitis B	High risk group	৩ ডোজ
Hepatitis A	Travelers, liver disease	২ ডোজ
HPV	৯-২৬ (কখনো ৪৫ পর্যন্ত)	২-৩ ডোজ
Varicella	যারা আগে পাননি	২ ডোজ
Herpes Zoster	≥৫০ বছর বয়সে	একবার
MMR	শৈশবে পাননি যারা	১-২ ডোজ
COVID 19	সবাই	প্রটোকল অনুযায়ী

● সহজভাবে:

প্রাপ্তবয়স্কদের টিকা শুধু শিশুদের মত নয়, বরং বার্ধক্য, দীর্ঘমেয়াদী রোগ, ভ্রমণ ও সংক্রমণের ঝুঁকির উপর নির্ভর করে দিতে হয়।

প্রেগনেন্সী/গর্ভাবস্থা

প্রেগনেন্সী মেয়েদের জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। অসুখ নয়। বাচ্চা ধারন নিমিত্ত পরিবর্তন, মূলত: হরমোনের প্রভাব।

এন্টিনেটাল কেয়ার/পেরিনেটাল কেয়ার : উদ্দেশ্য হল মায়ের জন্য ঝঞ্ঝাটবিহীন গর্ভাবস্থা আর স্বাভাবিক বাচ্চার ভূমিষ্ট হওয়া। গর্ভধারন করার শুরু থেকে বাচ্চা জন্ম হওয়া পর্যন্ত পুরা সময়টাকে এন্টিনেটাল পিরিয়ড বলে। উপযুক্ত তথ্য ও উপদেশ দেয়া যাতে করে নির্বিঘ্ন প্রেগনেন্সি আর সুস্থ বেবী জন্ম নেয়। শুধ তাই নয় বাচ্চার বা প্রেগনেন্সির জটিলতা ধরা পরে। এই সময় প্রসব, প্রসব পরবর্তী ব্যবস্থার বাস্তব ধারনা দেয়া যায়। ব্রেস্ট ফিডিং এবং শুধুমাত্র ব্রেস্ট ফিডিং এর উপকারিতাকে বোঝান যায়। পরবর্তী নিরাপদ প্রেগনেন্সি নিয়ে এখন আলোচনা করা যায়।

চিকিৎসা: উচ্চ রক্তচাপ থাকলে চিকিৎসা দিয়ে প্রি-এক্লামপশিয়া প্রতিরোধ করা যায়।

সাপ্লিমেন্টস : ফলিক এসিড, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, আয়রন, জিঙ্ক। গর্ভধারণের একমাস আগে থেকেই ফলিক এসিড খাওয়া ভাল।

ভ্যাক্সিন: টিটেনাস টক্সয়েড।

ইনভেস্টিগেশন: এনিমিয়া-হিমগ্লোবিন,আয়রন (ফেরিটিন),থ্যালাসেমিয়া। এইচ বিএস এজ (HBsAg) VDRL, HIV, Blood group (ABO &Rh)

ডায়াবেটিস: 2 sample OGTT, স্বাভাবিক হলে ২৪-২৮ সপ্তাহে পূনর্বার করতে হবে। সুগার বেশি থাকলেই চিকিৎসা দিতে হবে। প্রেগনেন্সীতে প্রিডায়াবেটিস বলে কিছ নাই।

স্ট্রিক্ট সুগার কন্ট্রোল টার্গেট।

হাইপোথাইরয়েড: TSH করতে হবে রুটিন হিসেবে।

প্রস্রাব পরীক্ষা: প্রোটিন বিশেষ করে ২৮ সপ্তাহের পর (প্রি-এক্লামপশিয়ার জন্য) **আলট্রাসনোগ্রাফি:** একবার করতেই হবে, লাগলে পূনর্বার।

ক্লিনিক ভিজিট: প্রথম আটাশ সপ্তাহে প্রতি মাসে একবার, ৩২ সপ্তাহ পর্যন্ত ২ সপ্তাহ পর পর; তারপর প্রতি সপ্তাহ একবার।

পোস্টন্যাটাল কেয়ার: ৪৫ দিন লাগে সবকিছু ঠিক হতে। এ সময় করা উচিত;

১। সুগার বেশি থাকলে এবং স্বাভাবিক হয়ে গেলে ও 2 sample OGTT

২। TSH- পোস্ট পারটাম থাইরোটক্সিকোসিস হতে পারে।

৩। শ্বাস কষ্ট হলে কারডিওমাইয়প্যাথি হতে পারে।

৪। এক্লাম্পশিয়াও হতে পারে এ সময়।

প্রেগনেন্সী ও ভ্যাক্সিনঃ
হেপাটাইটিস বি ভ্যাক্সিন নিরাপদ।আগে দেয়া না থাকলে শিডিউল অনুযায়ী তিনডোজ আরএক বা দুই ডোজ থাকলে তৃতীয় ডোজ। আগে ভ্যাক্সিনেটেড থাকলে প্রতি প্রেগনেন্সীতে দরকার নাই। টিটেনাস ডিপথেরিয়া ও পারটুসিস (টিডাপ) প্রতিরোধের জন্য এগুলো (টিডাপ) দিতে হবে। প্রতি প্রেগনেন্সীতেই দিতে হবে। কোভিড -১৯ ও ফ্লু ভ্যাক্সিন দেয়া য়ায়।

হেপাটাইটিস বি পজিটিভ মায়ের বেবী

স্বামী বা স্ত্রী হেপাটাইটিস বি পজিটিভ থাকলে সহবাসের আগে বি ভ্যাক্সিন নিশ্চিত করতে হবে।প্রটেকশন নিশ্চিত করতে ব্যারিয়ার ব্যাবহার্য।বিয়ের আগে জানা থাকা তাই জরুরী।

হেপাটাইটিস বি পজিটিভ মায়ের বাচ্চাঃ জন্মগ্রহনের সময় বা গর্ভে থাকা অবস্থায় বাচ্চা সংক্রমণ হতে পারে।বাচ্চা জন্মাবার ১২ ঘন্টার মধ্যে হেপাটাইটিস বি ইমিউনগ্লোবিন ও বি ভাইরাস ভ্যাক্সিন দিয়ে বাচ্চাকে বি সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

মানসিক রোগ

বর্তমানের ধারণা অনুযায়ী, বংশ ধারা (জিন) এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জটিল পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ ও কর্মক্ষমতার বিপর্যয় ঘটলে মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে।

তিন ধরনের রোগ আমরা দেখি। উদ্বিগ্নতা (anxiety neurosis), Depression (বিষণ্নতা) ও পাগলামি ও উন্মাদ অবস্থা (Schizophrenia)

Schizophrenia : একশত জনের এক জনের হয়। ১৫ বছরের কম বয়সে হয় না। ১৫-৩৫ বয়সে বেশি হয়। অদ্ভুত অনুভূতি ও উপলব্ধি হয়। রোগী শব্দ শুনে চোখে দেখে, স্পর্শ করে কিন্তু বাস্তবে তার ভিত্তি নাই। অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহ- উদ্যোম, মনসংযোগ, আত্মসচেতনতা -আত্মোপলব্ধি হারিয়ে ফেলে; জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

উদ্বিগ্নতা

চিন্তা বেশি হলে সেটা দুশ্চিন্তা তার চেয়ে বেশি হলে এবং শারিরীক বা মানসিক উপসর্গ হলে সেটা উদ্বেগ। উদ্বেগজনিত ব্যাধির বিভিন্ন ধরনের উপসর্গের মধ্যে আছে- ঘুমের সমস্যা, বুক ধড়ফড় করা, শ্বাসকষ্ট, অস্থিরতা, হাত-পা ঝিম ধরা বা কাঁপা, ঘাম হওয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, বমিভাব, মাথা ঘোরা এবং পেশি টান পড়া। পাঁচটি প্রধান ধরনের উদ্বেগজনিত ব্যাধি হলো- জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার, প্যানিক ডিজঅর্ডার, অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার এবং সোশ্যাল ফোবিয়া কিংবা সোশ্যাল অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার। হিস্টেরিয়ার রোগী নিজের স্বার্থে না জানা রোগের উপসর্গের সৃস্টি করে। দীর্ঘ দিন মানসিক সমস্যা ও চাপে থাকতে থাকতে অনেকের সত্যিই শারিরীক উপসর্গ (সাইকসোমাটিক ডিজঅর্ডার) হয়।

বিষণ্নতা

সাধারণভাবে মনে করা হয়, মন খারাপ মানেই বিষণ্নতা। কিন্তু বিষণ্নতা বলতে কেবল মন খারাপকে বোঝায় না, এটি মন খারাপের চেয়ে কিছু বেশি। কমপক্ষে দুই সপ্তাহজুড়ে দিনের বেশির ভাগ সময় বিষণ্নতা থাকলে সেটা ডিপ্রেশন। বাংলাদেশে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে পাঁচজনের বিষণ্নতাজনিত সমস্যা আছে। বিষণ্নতার কারণে মাদকাসক্তি থেকে শুরু করে আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটতে পারে।

মনোরোগের চিকিৎসা

সব মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যায়, যা অধিকাংশ মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। মানসিক রোগের ধরন অনুযায়ী ওষুধ, সাইকোথেরাপি ও কাউন্সেলিং ও অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। তীব্র বিষণ্নতার জন্য গুরুতর ক্ষেত্রে কখনও কখনও ইলেক্ট্রোকনভালসি থেরাপি (ইসিটি) ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মানসিক রোগের চিকিৎসা একটি দলগত প্রচেষ্টা বা টিমওয়ার্ক। ওষুধ কাজ করে রাসায়নিক পদার্থ বা নিউরোট্রান্সমিটারের ওপর, সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিং কাজ করে জ্ঞানীয় বিকাশ

(কগনিশন), আচরণ ও মনের গড়নের উপর। মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হতে পারেন (যেমন স্বাভাবিক জীবন যাপন করা, কাজ করা, লেখাপড়া করা, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা প্রভৃতি)। মানসিক রোগ অন্যান্য শারীরিক রোগের মতোই।

মানসিক ওষুধের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ আছে। Anxiolytics উদ্বেগ জনিত রোগ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যা যেমন অনিদ্রা জনিত রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। মুড স্টেবিলাইজার মূলত বাইপোলার ডিসঅর্ডারের জন্য ব্যবহৃত হয়। এন্টিসাইকোটিক্স সিজোফ্রেনিয়ার (Schizophrenia) ইতিবাচক উপসর্গের জন্য ব্যবহার করা হয়।

কিন্ত ওষুধ সেবনের পর যখন উপসর্গ কমে যায়, তখন রোগী বা তার আত্মীয়স্বজন চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ বন্ধ করে দেয়। ফলে চিকিৎসা সঠিক হয় না এবং কিছুদিন পর রোগ ফিরে আসে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ বদলানো যাবেনা, ডোজ পরিবর্তন করা যাবেনা, বন্ধ করা যাবেনা। এগুলো খেলে ব্রেনের ক্ষতি হয় না, ব্রেন নষ্ট হয়ে যায় না, মস্তিষ্ক ও স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে।

● মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক রোগ সম্পর্কিত চার্ট

মানসিক সমস্যা	শরীরে কীভাবে প্রভাব ফেলে	সাধারণ রোগ/ উপসর্গ	চিকিৎসা
Anxiety Disorder (উদ্বেগ)	শরীরে stress hormone (adrenaline, cortisol) ↑ → হৃদস্পন্দন বাড়ে, রক্তচাপ বাড়ে	বুক ধড়ফড়, ঘাম, কাঁপুনি, মাথা ঘোরা, Panic attack	CBT, Relaxation therapy, SSRI/ SNRI, অল্প সময়ের জন্য Benzodiazepine
Depression (বিষণ্নতা)	মস্তিষ্কে serotonin, dopamine ↓ → মানসিক + শারীরিক এনার্জি কমে যায়	অবসাদ, ক্ষুধা কমে যাওয়া, ঘুমের সমস্যা, ব্যথা, যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া	CBT, SSRI, Lifestyle change, Family support
Psychosomatic Disorder	মানসিক চাপ সরাসরি শারীরিক উপসর্গ তৈরি করে বা বাড়ায়	IBS, Peptic ulcer, Hypertension, Asthma, Migraine, Chronic pain	Psychoeducation, CBT, Stress management, Antidepressant, Relaxation techniques

সহজ কথায়

- উদ্বেগ → হার্ট/নার্ভাস সিস্টেমে প্রভাব
- বিষণ্ণতা → এনার্জি ও হরমোনে প্রভাব
- সাইকোসোম্যাটিক → মানসিক চাপ = শরীরের ব্যথা

- **Psychosomatic Disorders**
  - "**Psycho**" = মন/মানসিক
  - "**Somatic**" = দেহ/শারীরিক

Psychosomatic disorder হলো এমন রোগ, যেখানে মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা বা আবেগগত সমস্যা শরীরে প্রকৃত শারীরিক অসুস্থতার মতো উপসর্গ তৈরি করে বা বাড়িয়ে দেয়।

এখানে রোগীর শারীরিক উপসর্গ বাস্তব, কিন্তু এর উৎপত্তি বা তীব্রতা মানসিক কারণে।

- **সাধারণ উদাহরণ**
  - Irritable Bowel Syndrome (IBS) → দুশ্চিন্তায় ডায়রিয়া, পেট ব্যথা
  - Peptic Ulcer disease → মানসিক চাপ ulcer বাড়ায়
  - Hypertension → উদ্বেগে রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া
  - Asthma → মানসিক চাপ অ্যাজমার অ্যাটাক ট্রিগার করে
  - Psoriasis, Eczema → টেনশনে বাড়ে
  - Headache, Migraine, Tension-type headache
  - Chronic pain syndromes → যেমন fibromyalgia
  - Chest pain (কোনো cardiac cause ছাড়াই anxiety related)

- কারণ / Risk factors
  - দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ (stress)
  - Depression, Anxiety, Personality disorder
  - পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যা
  - পূর্বে মানসিক ট্রমা বা শোক
  - Stress-coping mechanism দুর্বল

● বৈশিষ্ট্য (Features)

- শরীরে ব্যথা বা অস্বস্তি (যেমন - বুক ব্যথা, মাথাব্যথা, পেট ব্যথা) কিন্তু টেস্টে তেমন কিছু ধরা পড়ে না
- উপসর্গ মানসিক চাপের সাথে বাড়ে/কমে
- দীর্ঘস্থায়ী ও পুনঃপুন দেখা দেয়
- রোগীরা অনেক সময় ডাক্তার থেকে ডাক্তার ঘোরেন কিন্তু নির্দিষ্ট শারীরিক রোগ পাওয়া যায় না

● চিকিৎসা (Management)

১. রোগীকে বোঝানো (Psychoeducation)

- উপসর্গ বাস্তব, কল্পনা নয়
- মানসিক চাপ কমালে উপসর্গ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব

২. মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা

- Cognitive Behavioral Therapy (CBT) → সবচেয়ে কার্যকর
- Relaxation therapy, Meditation, Yoga
- Stress management techniques

৩. ঔষধ চিকিৎসা

- Antidepressant (SSRI, SNRI, TCA) → depression I anxiety কমাতে
- Anxiolytics (benzodiazepines) → স্বল্পমেয়াদি ব্যবহার
- ব্যথা বা অন্যান্য উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে symptomatic treatment

৪. জীবনধারা পরিবর্তন

- নিয়মিত ব্যায়াম
- পর্যাপ্ত ঘুম
- স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস
- ধূমপান, অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা

● সারসংক্ষেপ টেবিল

বিষয়	বর্ণনা
সংজ্ঞা	মানসিক চাপ/আবেগ থেকে শারীরিক উপসর্গ তৈরি হওয়া
সাধারণ রোগ	IBS, Peptic ulcer, Hypertension, Asthma, Psoriasis, Migraine
বৈশিষ্ট্য	Stress অনুযায়ী উপসর্গ ওঠানামা করে, পরীক্ষায় তেমন কিছু না পাওয়া
চিকিৎসা	Psychoeducation, CBT, Antidepressant, Relaxation therapy, Lifestyle change

প্রকার	বৈশিষ্ট্য	চিকিৎসা
GAD	সব বিষয়ে অযথা উৎকণ্ঠা	CBT, SSRI
Panic Disorder	হঠাৎ আতঙ্ক, বুক ধড়ফড়	SSRI, Benzodiazepine (স্বল্পমেয়াদি)
Phobia	নির্দিষ্ট জিনিস/পরিস্থিতিতে ভয়	CBT, Exposure therapy
OCD	Obsession + Compulsion	SSRI (high dose), CBT
PTSD	ট্রমার পর ভয়/দুঃস্বপ্ন	CBT, SSRI
Mixed Anxiety-Depression	উদ্বেগ + বিষণ্ণতা	SSRI/SNRI, Psychotherapy

- ওরস্যালাইন ডায়ারিয়ার সবচেয়ে ভাল ঔষধ।
- মায়ের দুধের বিকল্প নাই।
- প্রথম ছয় মাস বুকের দুধ এবং শুধুমাত্র বুকের দুধ দিন।
- উচ্চ রক্ত চাপ, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল কন্ট্রোলে রাখুন।
- চল্লিশোর্ধ হলে নিয়মিত চেকআপে থাকুন।
- পরিমিত ভোজন, নিয়মিত হাঁটা, সময়মত ঘুম সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি।
- ভ্যাক্সিন নিন। মাস্ক পরুন।
- সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করুন।
- সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। করোনা প্রতিরোধ করুন।
- মশা ঠেকান। ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া প্রতিরোধ করুন।